নজরুল সাহিত্য সমালোচনার ধারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্যে
লেখা গবেষণা অভিসন্দর্ভ

মারজিয়া সরকার

Dhaka University Library
400105
400105

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
আগষ্ট, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

400105

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধীনে মারজিয়া সরকারের এম, ফিল ডিগ্রীর জন্যে লিখিত ও পরীক্ষার জন্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ ''নজরুল সাহিত্য সমালোচনার ধারা'' অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রকার ডিগ্রীর জন্যে উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভের কোনো অংশও কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

রফিকুল ইসলাম ১.৮.২০০১

ডঃ রফিকুল ইসলাম
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক,
বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচী পত্র

		পৃষ্ঠা নং
ভূমিকাঃ-		১
প্রথম অধ্যায়ঃ-	আবদুল কাদিরের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা।	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ-	কাজী আবদুল ওদুদ ও সৈয়দ আলী আহসানের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা।	১৭
তৃতীয় অধ্যায়ঃ-	আজহার উদ্দিন খানের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা।	২৬
চতুর্থ অধ্যায়ঃ-	সুশীল কুমার গুপ্তের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা।	৩৬
পঞ্চম অধ্যায়ঃ-	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা।	৪৪
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ-	আতাউর রহমানের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা।	৫৯
সপ্তম অধ্যায়ঃ-	শাহাবুদ্দিন আহমদের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা।	৭৯
অষ্টম অধ্যায়ঃ-	রফিকুল ইসলামের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা।	৮৫
নবম অধ্যায়ঃ-	আবদুল মান্নান সৈয়দের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা।	১২০
দশম অধ্যায়ঃ-	মোবাশ্বের আলীর নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা।	১৩২
একাদশ অধ্যায়ঃ-	মধুসূদন বসু, রাজিয়া সুলতানা, বাঁধন সেনগুপ্ত, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, আতোয়ার রহমান, ক্ষেত্রগুপ্ত ও মনোয়ারা হোসেনের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা।	১৫০

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যেব এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলা সাহিত্যের অংগনে তাঁর কণ্ঠ ছিল নতুন, স্বর ছিল কখনো মন্দ্র, কখনো বজ্রভীষণ, উচ্চারণের ভঙ্গি ছিল অভিনব আর বক্তব্য ছিল যুদ্ধোত্তর কালে গণবাঞ্ছিত তাই নজরুলের অবির্ভাবে শিক্ষিত বাংগালী চকিত চমকিত না হয়ে পারেনি। এ আবির্ভাব কারো কাছে ঝড়ের মতো, কারো কাছে বা ধুমকেতুর মতো। সামান্য, সাধারণ কিংবা স্বাভাবিক সে নয়, তা অবচেতনভাবে অনুভব ও সচেতনভাবে উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে নিভৃত পল্লীর স্বল্প শিক্ষিত পাঠক পর্যন্ত। এক হিসেবে নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের যুগস্রষ্টা। সাহিত্যকে সচেতনভাবে রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার, সংগ্রাম ও বিপ্লবের শিল্পসম্মত বাণী প্রচারের সার্থক বাহন করেন নজরুল ইসলাম। আর এক হিসেবে নজরুল ইসলাম ছিলেন যুগান্তর যুগনায়ক কবি। জনগণের মনের কথা, কাব্যবাণী, প্রত্যাশিত সংগ্রাম নজরুলের রচনাতেই বিঘোষিত।

কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থের সংখ্যা আটাশী খানারও বেশী। এগুলোর মধ্যে বিভিন্নজনের সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ সংকলনও রয়েছে। একক লেখকের গ্রন্থও অনেক সবগুলো অবশ্য স্বীকৃত মানের নয়। আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলোচনা গ্রন্থে পরিব্যক্ত মত, মন্তব্য এবং মূল্যায়নজাত সিদ্ধান্ত এখানে উপস্থাপিত করবো এবং প্রয়োজন মত আমাদের মতামত ব্যক্ত করবো। নজরুল সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থের পর্যালোচনায় প্রকাশনার কালানুক্রমিক ধারা আলোচনায় অনুসৃত হয়েছে।

নজরুল সাহিত্য সমালোচনা প্রকাশের কালানুক্রমিক ধারা নিম্নরূপঃ-

আব্দুল কাদির 'নজরুল প্রতিভার স্বরূপ' (১৩৯৫), কাজী আবদুল ওদুদ 'নজরুল প্রতিভা' (১৯৪৯), সৈয়দ আলী আহসান 'নজরুল ইসলাম' (১৩৬১), আজহার উদ্দীন খান 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' (১৩৬১), সুশীলকুমার গুপ্ত 'নজরুল-চরিত মানস' (১৩৬৭), মোঃ মাহফুজউল্লাহ 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৩৭০), আতাউর রহমান 'কবি নজরুল' (১৯৬৮), শাহাবুদীন আহমদ 'শব্দ ধানুকী নজরুল ইসলাম' (১৯৭০), 'নজরুল সাহিত্য বিচার' (১৯৭৬), 'ইসলাম ও নজরুল ইসলাম' (১৯৭৬), এবং নজরুল সাহিত্য দর্শন, রফিকুল ইসলাম 'কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা' (১৯৮৪), 'কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য' (১৯৯১), কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সৃষ্টি' (১৯৯৭), আবদুল মান্নান সৈয়দ 'নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতা' (১৯৭৭), মোবাশ্বের আলী 'নজরুল প্রতিভা' (১৯৬৯), মধুসূদন বসু 'নজরুল কাব্য পরিচয়' (১৯৭৫), রাজিয়া সুলতানা 'কথাশিল্পী নজরুল' (১৯৭৫), বাঁধন সেনগুপ্ত 'নজরুল কাব্যগীতিঃ বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ণ' (১৯৭৬), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন' (১৯৮৮), ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় 'নজরুল ইসলাম কবি মানস ও কবিতা' (১৯৯২), আতোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

রহমান 'নজরুল বর্ণালী' (১৯৯৪), ক্ষেত্রগুপ্ত 'নজরুলের কবিতাঃ অসংযমের শিল্প' (১৯৯৭), মনোয়ারা হোসেন 'নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্য' (২০০০)।

আমরা আলোচ্য অভিসন্ধর্ভে উল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে বিধৃত নজরুল সাহিত্য মূল্যায়ণের গতিপ্রকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং অনুধাবন করতে পেরেছি যে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশত বর্ষের মধ্যে তাঁর সৃষ্টিকর্ম কি ভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থাবলী ছাড়াও নজরুলের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটক সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ ১৯২১ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বর্তমান আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ যদিও একই লেখকের প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ আলোচনা থেকে বাদ দেয়া হয়নি। তবে বিভিন্ন লেখকের বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধ সংকলন বিবেচনা করা হয়নি।

আলোচ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থ গ্রন্থকারের প্রবন্ধ সংকলন, ব্যতিক্রম সুশীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল-চরিত মানস', রফিকুল ইসলামের 'কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সৃষ্টি', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন' মোবাশ্বের আলীর 'নজরুল প্রতিভা' এ সব গ্রন্থেই কেবলমাত্র নজরুল সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ রয়েছে। বস্তুত নজরুলের মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের অভাব বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সীমাবদ্ধতাকেই প্রকট করে তোলে। তবুও আবদুল কাদির, আতাউর রহমান, শাহাবুদ্দীন আহমদ, আবদুল মান্নান সৈয়দের গ্রন্থাবলী বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন হলেও সংকলিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্রে রয়েছে। যা হচ্ছে গ্রন্থকারের নজরুল সৃষ্টি সম্পর্কিত স্বকীয় ধারণা আর সে কারণেই নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়ণে ঐ সব গ্রন্থের গুরুত্ব।

নজরুলকে নিয়ে সুস্থাবস্থায় তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ণ বিশেষ হয়নি নজরুলের জীবদ্দশায়, অসুস্থ অবস্থায় নজরুলের স্মৃতিচারণ হয়েছে বেশী। বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় যা সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকে ক্রমশঃ পূর্নাঙ্গ রূপ লাভ করতে থাকে। বিশ শতকের অপরার্ধের নজরুল সাহিত্য সমালোচনার ধারা আমরা আলোচ্য অভিসন্ধর্ভে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আবদুল কাদিরের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা।

আবদুল কাদির তাঁর 'নজরুল প্রতিভার স্বরূপ' গ্রন্থে নজরুল ইসলামের রচনার প্রকাশকালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নজরুল রচনার পর্যালোচন করেননি। তিনি বিচ্ছিন্ন ভাবে নজরুলের রচনার আলোচনা করেছেন। লেখকের আলোচনা অনুযায়ী নিম্নে তাঁর নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনার পরিচয় প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য আবদুল কাদিরের প্রবন্ধগুলো বহুপূর্বে রচিত। ১৩৯৫ সালে 'নজরুল প্রতিভার স্বরূপ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

কবিতা আলোচনায় এই গ্রন্থে লেখকের আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে, 'একটি কবিতার পাঠ', 'নজরুলের কবিতায় দেশপ্রেম', 'নজরুল কাব্যে প্রেম', 'নব-মানবতার কবি নজরুল ইসলাম', 'নজরুল কাব্যে প্রেম ও সংগ্রাম', 'নজরুল ইসলামের ছন্দ', 'নজরুলের কবিতায় ছন্দ-পরিচয়' এবং 'বাংলা ছন্দ ও নজরুল ইসলাম'।

'একটি কবিতার পাঠ' (১৩৭৭) প্রবন্ধে লেখক নজরুল ইসলামের কবিতার প্রকাশে পাঠভেদের কথা লিখেছেন। প্রথমে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থবদ্ধ হবার সময় যৎকিঞ্চিত পরিবর্তিত হয়েছে-যার অনেক নজরুলের নিজের হাতেই করা। যেমন, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 'বিদ্রোহী' কবিতার দুটি চরণ,

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
হাসি, হা- হা, হা- হা, হি- হি, হি- হি
তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হাঁকে চি - হিঁ, চিঁ- হিঁ, চি- হিঁ, চিঁ- হিঁ।

কিন্তু 'অগ্নি বীনা'য় অন্তর্ভুক্ত কালে পাঠ,

ছুটি ঝাড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ- মর্ত্য করতলে
তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা- বাহন আমার
হিস্মত- ত্রেষা হেঁকে চলে।

নজরুলের কবিতায় দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে গিয়ে আবদুল কাদির 'নজরুলের কবিতায় দেশপ্রেম' প্রবন্ধে, 'উদ্বোধন', 'সেবক', 'বন্দী-বন্দনা', 'বিদ্রোহীর বাণী' (বিষের বাঁশি কাব্য), 'রণ-ভেরী'ঃ (অগ্নিবীণা), 'জাগরণী' (ভাঙ্গার গান), 'নব-ভারতের হলদিঘাট' (প্রলয় শিখা), 'আমি গাহি তারি গান (সন্ধ্যা)', 'সাবধানী ঘন্টা' (ফণি মনসা), 'সুবহ্-উম্মেদ' (জিঞ্জীর) 'শিখা' ও 'দুর্বার যৌবন'; (নতুন চাঁদ) ইত্যাদি কবিতার কথা উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল কাদিরের ভাষায়,

> সেই Storm and stress এর দিনে নজরুল হয়ে উঠলেন যুগ-প্রতিভূ, বাংলার প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি।

আবদুল কাদিরের আলোচনায় আমরা পাই, নজরুলের পূর্বে আর কোন কবি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দেশের সকল মন্ডলীর মানুষের প্রতিনিধি স্থানীয় বলে তাঁদের হৃদয়ের অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধার আসন অধিকার করতে পারেন নি। নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বে স্বাধীনতা কামনা করে বাঙলা ভাষায় অনেক গান ও কবিতা রচিত হয়েছিল, কিন্তু সে সব রচনা সমভাবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সানন্দ স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। যেমন, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে বিশাখা পয়ার ছন্দে 'ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য' কবিতা, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'ভারত- সঙ্গীত' এর কবিতাবলী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে 'শিবাজী-উৎসব' প্রভৃতি কবিতা। নজরুল শুধু কবিতায় নয়, তাঁর সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় তিনি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ভারতের জন্য পূর্ন স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে অপরিসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্মারণীয় যে কংগ্রেস স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করে ১৯২৯ সালে আর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে বিপ্লবীরা ১৯৩০ সালে।

আবদুল কাদির 'নজরুল কাব্যে প্রেম' (১৯৭৮) অধ্যায় পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, নজরুলের প্রথম দিকের কবিতা 'অবেলায়', 'কবির চাওয়া', 'অভিমানী', 'চিঠি' প্রভৃতিতে কবির বিরহী রূপ স্পষ্ট ও গভীর। তাছাড়া কবির সুবিখ্যাত 'অনামিকা', 'চির-জনমের প্রিয়া', 'আমার কবিতা তুমি', 'তুমি কি গিয়াছ ভুলে', 'আত্মগত' প্রভৃতি কবিতায় কবির অতৃপ্ত হৃদয়ের আর্ত হাহাকার ফুটে উঠেছে। কবির বুকে আছে পরম বিরহ; তারই জ্বালা-মুখে তাঁর লেখনীতে উৎসারিত হয়েছে অজস্র প্রেমের কবিতা ও গান। সেই কবিতা ও গান অগণ্য মানুষকে দিয়েছে অপরিসীম শান্তি ও তৃপ্তি, বাংলা সাহিত্য হয়েছে অপূর্ব সম্পদে সমৃদ্ধ।

'মানবতার কবি নজরুল ইসলাম' (১৩৮৫) অধ্যায়ে আবদুল কাদির নজরুলের মানবিকতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, বাংলার বহু উচ্চবিত্ত মানুষকে রিনেসাঁসের স্বাদ গ্রহন করতে আমরা দেখেছি। কিন্তু দেশের দুঃস্থ-দীন-মুমূর্ষু মানব শ্রেণীকে সকল প্রকার শোষণ ও পীড়ন থেকে ত্রাণ করে মনুষ্যত্বের মহিমা ও জীবনের আনন্দ লাভের সকল সুযোগ দানের কোনো প্রয়াশই প্রাক নজরুল যুগে আমরা দেখিনি। জাতির নবজাগরণের একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সুস্পষ্ট সংকল্প। নজরুলই প্রথম সেই অদম্য সংকল্পের রূপ দিলেন এই বলে,

> আমরা জানি সোজা কথা,
> পূর্ন স্বাধীন করব দেশ;
> এই দুলাদুম বিজয় নিশান,
> মরতে আছি - মরব শেষ।
>
> ('বিদ্রোহের বাণী', বিষের বাঁশী)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের আগে এই উপমহাদেশের আর কোনো লেখকই বিদেশী সাম্রাজ্যের কবল থেকে দেশের পূর্ণাঙ্গ মুক্তির দাবী ঘোষণা করেননি।

আবদুল কাদিরের ভাষায় নির্যাতিত মানুষের উদ্বোধনী গেয়েছেন নজরুল, তিনি 'সমাজতান্ত্রিক মানবিকতার উদগাতা কবি'। এ সম্পর্কে লেখক 'শোধ করো ঋণ' (শেষ সওগাত) এবং 'অভয় সুন্দর, (নতুন চাঁদ) কবিতা দুটি উল্লেখ করেছেন।

আবদুল কাদির 'নজরুল কাব্যে প্রেম ও সংগ্রাম' (১৩৭৭) এর পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন নজরুল-কাব্যে তাঁর দুটি মূর্তি প্রতিভাত; এক মূর্তিতে তিনি প্রেমিক এবং অন্য মূর্তিতে তিনি সংগ্রামী। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতার একস্থানে বলেছেন,

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার নিঃক্ষত্রীয় করিব বিশ্ব
আনিব শান্তি শান্ত উদার।

এবং অন্যস্থানে বলেছেন,

আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন্ কন্।

আবদুল কাদিরের কথায়, নজরুলকে তাঁর প্রথম জীবনেই এই যুগ্ম-মূর্তিতে আমাদের সামনে আর্বিভূত হতে দেখি। তিনি নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেন, 'মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর এক হাতে রণ-তূর্য'। তিনি একজন অসামান্য প্রতিভাধর সৃষ্টিধর্মী কবি ও গীতিকার হিসেবে আজীবন এই দুই ভূমিকা শিল্পসম্মত প্রণালীতে পরম দক্ষতা সহকারে পালন করে গেছেন।

নজরুলের প্রেমের কবিতায় মিলন অপেক্ষা বিরহের সুরই প্রাধান্য পেয়েছে, আর সেই বিরহ তাঁর অন্তরাকাশে জাগিয়েছে ঝড়ের আর্বত, তিনি হয়েছেন উদ্দাম।

আবদুল কাদিরের মতে নজরুল যৌবনে দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতা, অর্থনৈতিক পরবশ্যতা ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বিদ্রোহের তূর্যধ্বনি করেছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁর সেই বিপ্লবের আহবান হয় আরও তীব্র ও তীক্ষ্ম। তিনি বিশুদ্ধ রস চর্চা ছেড়ে পৃথিবীর শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কেন শরীক হলেন, তার জবাব রয়েছে 'কেন আপনারে হানি হেল (শেষ সওগাত) কবিতায়।

সর্বোপরি এই বিশ্বকে অন্যায়-অসাম্য ও অশান্তি বিরহিত এক ভূখন্ডে পরিণত করার জন্যেই নজরুলের কণ্ঠ হয়েছে সোচ্চার। এই ধূলির ধরায় বেহেশতের অমৃত ঝরাতেই নজরুল তাঁর বাঁশরীতে করেছেন প্রেমের সুরের সাধনা। সৈনিক ও প্রেমিক এই দুই রূপেই নজরুল বাংলা সাহিত্যে দিয়েছেন অসাধারণ সৃষ্টিশীলতার পরিচয়।

'নজরুল-কাব্যালোক' (১৩৫০) সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে আবদুল কাদির বলেছেন, নজরুলের কাব্যরচনার মূলে রয়েছে রাজনৈতিক মতাদর্শ। প্যান ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি রচনা করেছেন বহু কবিতা। তার মধ্যে রয়েছে সুবিখ্যাত 'সুবেহ-উম্মেদ' কবিতাটি। তিনি কাব্য রচনা করেছেন ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে। যেমন, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, খালেদ,

Dhaka University Institutional Repository

চিরঞ্জীব জগলুল ইত্যাদি কবিতা তাছাড়া আমাদের পঙ্গুতার নিরসনের জন্য অতিরিক্ত উদ্ব্যস্ততার ফলেই এসব বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করতে গিয়ে দূরকালের পাঠকদের রসতৃষ্ণা পুরোপুরি মিটাতে সমর্থ হননি। কিন্তু তিনি যুগপ্রয়োজন মিটাতে কার্পণ্য করেননি। তিনি নিজেকে বলেছেন 'বর্তমানের কবি', Posterity-র জন্য পরোয়া করেননি, সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছেন আমাদের অধঃপতিত জীবনের শ্রীবৃদ্ধি।'

আবদুল কাদিরের মতে, নজরুল দেশের মাটি ও মানুষের দিকে প্রথম চেয়েছেন সচেতন প্রেমের দৃষ্টিতে, পারিপার্শ্বিক মানুষের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্খা তাঁর বাণীতে করেছে রসমূর্তি লাভ। মোদ্দাকথা বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তাঁরই কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হয়েছে উদার স্বাজাত্যবোধের উদাত্ত সুর।

নজরুলের কাব্যলোকের পেছনে নারী একটি বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। নারী প্রেমের আকর্ষণেই জেগেছে তাঁর যৌবনোচ্ছ্বাস। প্রধানতঃ নারীপ্রেমের প্রেরণা হতেই তাঁর বিদ্রোহ-ভাবের জন্ম, তাই পরিণামে সেই দৈব-প্রতিভার প্রকাশ হয়েছে প্রেমের কবিতায়।

নজরুলের সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে দেখা গিয়েছিল যে 'লিরিক' উপাদান, তাই তাঁর পরবর্তীকালের রচনায় প্রবলতর হয়ে উঠে। আবদুল কাদির 'নজরুলের গীতি কবিতা' (১৩৪৮) পর্যালোচনায় বলেছেন, বাংলাদেশ গীতিকবিতার দেশ। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে আজও কম অনুভূত হয় না। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে নতুন করে গীতিকাব্যের মাধুরী বাংলা সাহিত্যে সিঞ্চিত হতে থাকে। নজরুল ইসলাম জীবনের প্রারম্ভেই সে ধারাকে অস্বীকার করেননি। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতাপুস্তক 'ছায়ানটে'ই এর প্রভাব লক্ষ্য করি। নজরুল চির বাউল; ঘরের বন্ধন তাঁকে কোনদিন বাঁধতে পারেনি, যার প্রমাণ রয়েছে 'দোলন-চাঁপা' কবিতায়।

লেখকের মতে, কোনো বিজয়িনীর চরণ প্রান্তেই তিনি বেশী দিন তাঁর তরবারি সমর্পণ করে ভক্তের মতো স্তিমিত নেত্র হতে পারেননি। পৃথিবীর প্রেয়সী তাঁকে বারবার উনমনা করেছে সত্য, কিছুদিনের জন্য তিনি বাণও তূণবদ্ধ করেছেন বটে; কিন্তু আবার এসেছে ঝড়ের বান। আবার তিনি জীবনোল্লাসে নৃত্য করে উঠেছেন।

নজরুলের কবি চিত্ত নিত্য জাগ্রত; তাঁর সাময়িক স্তব্ধতা হচ্ছে তপস্বীর ধ্যান-প্রতীক্ষা, - বৃহতের জন্য নূতন আয়োজন। এই অবন্ধন-প্রিয় কবি বারবার তাই নব নব রূপে জীবন মুক্তির গানই গেয়েছেন- সেই গানের তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে নবীন সৌন্দর্য, নূতন অনুভূতির মাধুর্য।

আব্দুল কাদির 'যুগ-কবি নজরুল' (১৩৭১) অধ্যায়ে নজরুল সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন এভাবে, যুদ্ধ -ফেরৎ নজরুল যখন কলকাতায়, সারা উপমহাদেশে তখন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের আগুন ছুটছে, নজরুল সেই অগ্নিসুরে বাঁধলেন বীণা। 'আনোয়ার', 'কামাল পাশা', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'রীফ-সর্দার', 'আমানুল্লাহ' প্রভৃতি আন্তর্জাতিক জগতের মুক্তিব্রতী বীরদের

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তিকলাপে তার দৃষ্টি পেয়েছে যেমন বিদ্যুৎদীপ্তি, তেমনি স্বদেশের স্বজাতির স্বধর্মের সেবাব্রতী বীরদের মহিমা-কীর্তনে তাঁর কণ্ঠ হয়েছে সোচ্চার। সমসাময়িক ইতিহাস তাঁর লেখনী স্পর্শে লাভ করেছে নূতন অর্থ, জাতির জীবনে দিয়েছে পথে চলার নূতন ইঙ্গিত। তাই নজরুল যুগ-প্রতিভূ। বাঙলা সাহিত্যে এরূপ যুগ-প্রতিনিধি আর আসেননি।

যুগ কবি সম্পর্কে লেখক বলেছেন,

> ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর, বাংলা বিভক্ত হলে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেছিলেন সেই বিভাগে অস্বীকারের সংকল্প জানাতে রাখী বন্ধন ক'রে। কিন্তু তাঁর রাখী-বন্ধনের গান হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক মিলনের প্রকৃত সূত্র কার্যতঃ সূচিত করে ভয়াবহ অনৈক্য। পক্ষান্তরে নজরুলের কণ্ঠে যে সংহতি-সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, তার মূল প্রেমের গভীরে, তাই তার প্রভাব হয়েছে এমন সর্বব্যাপী, এমন দুর্নিবার। তাঁর আহবানে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মন্ডলীর মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছে-মুক্তির পথে, মনুষ্যত্বের পথে অভিসারী হয়েছে। তাই নজরুল নিঃসন্দেহে এদেশের জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি।

লেখকের মতে,

> বাংলার অধঃপতিত মুসলমানদের আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনার জন্যে মীর মশরারফ হোসেন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, রেয়াজউদ্দীন মহশহাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ বহু সাধক ও প্রচারক অক্লান্ত প্রচেষ্টা করেছেন; কিন্তু নজরুলের কণ্ঠের যাদুমন্ত্রে দু'দিনেই এ-জাতির যোগনিদ্রা গেল ভেঙে নিজেদের বিশিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে হয়ে উঠলো উদ্দাম।

প্রতিভার একটি বড় লক্ষণ এই যে, সমকালীন মানুষ তাঁর সম্মোহন জালে আকৃষ্ট হয়। নজরুলের বয়োজ্যেষ্ঠ অনেক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন কবিকেই দেখা গেছে নজরুলের অনুবর্তন করতে। মোহিত লাল মজুমদারের ''স্বপন পশারী'' কাব্যের 'ক্ষ্যাপা' নজরুলের 'বাদল-প্রাতের শারাব' কবিতাটির ছন্দানুবর্তনে, শাহাদৎ হোসেনের ''মৃদঙ্গ'' কাবের 'শহীদে কারবালা' নজরুলের 'মোহররম' অনুসরণে এবং গোলাম মোস্তফার ''রক্তরাগ'' কাব্যের 'হযরত মোহাম্মদ (দঃ)' নজরুলের 'খেয়াপারের তরণী' অনুসরণে রচিত। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার ছন্দ-ভঙ্গী অনুসরণ করে মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৯৭৯-১৯৩১), শৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ বহু খ্যাতিমান কবি বহু উল্লেখযোগ্য কবিতা সংরচনা করেন। তাছাড়া বয়োজ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) ও নজরুলকে অনুসরণ করেছেন দু'একটি রচনায়। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৫) নজরুলের সমবয়সী ছিলেন, কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর অনুগামী।

আবদুল কাদিরে ভাষায়,

> রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য কাব্য কল্পনার সুনিপুন রূপায়ন, আর নজরুলের লক্ষ্য মানুষের প্রতি কবির কর্তব্য সাধন। ফলে রবীন্দ্রনাথ সুদক্ষ শিল্পী, আর নজরুল মানবতাবাদী চারণ-কবি।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু নজরুলের উদার মানবিকতা বাংলা কাব্যের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে; এজন্যই সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আসন চির-ভাস্বর হয়ে থাকবে।

'নজরুলের কবিতার ছন্দ-পরিচয়ে' আবদুল কাদির বলেছেন, বাংলা ছন্দোবিজ্ঞানে পাঁচটি মূল ছন্দ এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেঃ অক্ষরমাত্রিক, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, স্বরমাত্রিক ও সংস্কৃত-ভাঙা ধ্বনিমাত্রিক। অক্ষরবৃত্ত বা পয়ার-ছন্দের কবিতার সংখ্যা খুবই কম। মধ্যযুগের বাংলা পুঁথি কাব্যে সুপ্রচলিত ছন্দেরপ্রতি অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো নজরুল ইসলামেরও তেমন প্রবণতা দেখা যায়নি। তবে আধুনিক কবিদের মতো নুতন নূতন গঠন-ভঙ্গি দিয়ে পয়ার-জাতীয় কবিতা-সৃষ্টির প্রয়াস নজরুল ইসলামে বেশী দেখা যায় না। চৌদ্দ ব্যষ্টির পয়ার ছন্দে রচিত তাঁর বিখ্যাত 'দারিদ্র' কবিতাটি। তাছাড়া আছে 'অশ্বিনীকুমার', 'গোকুল নাগ', 'সর্বহারা', 'রহস্যময়ী' ইত্যাদি কবিতা।

আবদুল কাদিরের ভাষায় নজরুল ইসলামের অধিকাংশ কবিতাই সুপ্রচলিত মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। মাত্রাবৃত্তে অযুগ্মধ্বনি একমাত্রা, কিন্তু যুগ্মধ্বনি দুইমাত্রা। আর স্বরবৃত্তের অযুগ্ম ও যুগ্ম উভয় প্রকার ধ্বনিই একমাত্রা বা ব্যষ্টি।

নজরুল ইসলাম 'আরবী মোতাকারিব ছন্দে' একটি কবিতা লিখেছেন।

|∧∧∧ |∧ ∧||∧ ∧ |∧ ∧
ফায়ু লান। ফায়ু লান। ফায়ু লান। ফায়ু লান।
বেনীর বাঁধ। আলগ্ ছাঁদ। আলগ্ ছাঁদ। খোঁপার ফুল
খোঁপার ফুল। কানের দুল। দোদুল দুল। দো দুল দুল।

নজরুল ইসলাম স্বরমাত্রিক ছন্দের মতন সংস্কৃত-ভাঙা মাত্রাবৃত্তেও অল্পসংখ্যক কবিতা রচনা করেছেন। মাত্র 'পূবের হাওয়া' শীর্ষক কবিতার উপসংহারটুকু যথাক্রমে শার্দুল-বিক্রীড়িত, সিংহ-বিক্রীড় ও অনঙ্গশেখর ছন্দে রচনা করেছেন।

নজরুল ইসলামের ছন্দ বিশ্লেষণ নজরুল ইসলাম যখন তাঁর প্রথম জীবনে কবিতার অনুশীলন শুরু করেন তখন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' ও 'পলাতক' বেরিয়েছে। এই দুই কাব্যের মুক্তবন্ধ স্বরবৃত্ত-রীতির কবিতাগুলো সে-সময় তাঁকে করে সমধিক আকর্ষণ। তিনি সেই রীতির অনুসরণে লিখেন তাঁর 'নির্ঝর' কাব্যের। 'অভিমানী', 'মুক্তি', ও 'চিঠি' কবিতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুক্তক স্বরবৃত্ত কবিতার দীর্ঘতম পংক্তি গঠন করেছেন ৪+৪+৪+৪+২ সিলেবল-যোগে, কিন্তু নজরুল ইসলাম আরও একটি চতুঃস্বর পর্ব অধিক যোজনা করেছেন। যেমন-

এখনো তার হয়নি কিছুই বলা।
এমনি করে ভার হলো গো ক্রমেই বালার একাঙ্কনী জীবন পথে চলা।
কস্তুরী সে হরিণ বালা উন্মনা আজ উদাস হয়ে ফিরে,
নাম-হারা ক্ষীণ নির্ঝর তীরে তীরে।
এমনি ক'রে কাটে বেলা-
শুধু কেন হঠাৎ কখন যায় ভুলে সে খেলা।
(নির্ঝর, 'অভিমানী')

Dhaka University Institutional Repository

উপরের প্রথম ও চতুর্থ পংক্তিতে ৪+৪+২ সিলেবল, দ্বিতীয় পংক্তিতে ৪+৪+৪+৪+২ সিলেবল, তৃতীয় পংক্তিতে ৪+৪+৪+৪+২ সিলেবল, পঞ্চম পংক্তিতে ৪+৪ সিলেবল এবং ষষ্ঠ পংক্তিতে ৪+৪+৪+২ সিলেবল সন্নিবেশিত হয়েছে। নজরুলের 'কামালপাশা' কবিতাটি ও ৪+৪+৪+৪+৪+২ এরূপ অসমপংক্তিক স্বরবৃত্ত ছন্দে বিরচিত। বাংলা মুক্তক রীতির স্বরবৃত্ত-কবিতায় এরূপ সুদীর্ঘ পংক্তি আর কোন কবি রচনা করেছেন কি-না তা বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন। নজরুল প্রতি পংক্তিতে ৩+৪+৪+৪+১ সিলেবল সন্নিবেশ করে সংরচনা করেছেন বাংলা ভাষায় অভাবনীয় প্রকৃতির গজল-গীতি। আর এ ছন্দঃরীতি অনুবর্তন করে অগ্রজ কবি শ্রী যতীন্দ্র মোহন বাগচী রচনা করেন তাঁর 'নীহাররিকা' কাব্যের 'ফাগুনে' কবিতা। নজরুলের গজল বাংলা গীতিকাব্যে প্রবর্তন করেছে এক নূতন ধারা।

প্রত্ন-স্বরবৃত্তের, চতুঃস্বরিক পর্ব সংহত হয়ে অক্ষরবৃত্তের চতুরাক্ষর পর্বে পরিণত হয়েছে, চৌদ্দ-স্বরের স্বরবৃত্ত পংক্তি হয়েছে চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার। অক্ষরবৃত্তে যুগ্মধ্বনি শব্দ-মধ্যে সচরাচর সংশ্লিষ্ট হয়ে এক-কলা এবং শব্দপ্রান্তে সর্বদা বিশ্লিষ্ট হয়ে দুই-কলা রূপে গণ্য। এ-ছন্দে শব্দের আদ্য ও-মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিও যদি সকল অযুগ্মধ্বনির ন্যায় সর্বত্র এক-ব্যষ্টিক হতো, তা হলে তার ধ্বনিভিক্তি হতো সুডৌল ও সুদৃঢ়, তাতে ব্যতিক্রমের কোনো অবকাশই থাকতো না। কিন্তু অক্ষরবৃত্তে নিম্নলিখিত পাঁচপ্রকার শব্দ-মধ্যস্থ যুগ্মধ্বনি কিকলো দুই ব্যষ্টির মর্যাদা লাভ করে।

(ক) দেশজ শব্দের মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিঃ

রোয়ে রোয়ে বহে না ক পূবালী বাতাস,
শ্বাসে না ঝাউয়ের শাখে সেই দীর্ঘশ্বাস।
-(চক্রবাক,'শীতের সিন্ধু')

প্রমোদ কানন পুড়ে, ওড়ে অট্টালিকা,
তোমার আইনে শুধু মৃত্যুদন্ড লিখা।
-(সিন্ধু-হিন্দোল, 'দারিদ্র')

এখানে 'আইনে' শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি মাত্রাবৃত্তের ভঙ্গীতে সম্প্রারিত হয়ে দুই-কলা, কিন্তু 'ঝাউয়ের' শব্দে মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি স্বরবৃত্তের ভঙ্গীতে সংকুচিত হয়ে-এক-কলা।

(খ) শব্দের শেষে সংযুক্ত 'টি', 'টা' 'টু', 'টুকু', 'খানি', 'গুলি' প্রভৃতি দেশজ প্রত্যয়ের পূর্বস্থিত যুগ্মধ্বনি

ভাবিতাম, দাগহীন অকলঙ্ক কুমারীর দান,
একটি নিমেষে মাঝে চিরতরে আপনারে রিক্ত করি' দিয়া
মন-প্রাণ লভে অবসান।
-(দোলন-চাঁপা, 'পূজারিণী')

Dhaka University Institutional Repository

উপরের 'একটি' দেশজ প্রত্যয় যথাক্রমে 'টি' পূর্বস্থিত যুগ্মধ্বনি 'এক' এখানে মাত্রাবৃত্তের নিয়মে প্রসারিত হয়ে দুই-মাত্রার মর্যাদা পেয়েছে।

(গ) সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের আদ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি-

দিক চক্র-রেখা ধরি' কেঁদে কেঁদে চলি
শ্রান্ত অশ্বশ্বসা গতি। চম্পা একাবলী
-(ছায়ানট, 'ঝড়ঃ পূর্ব-তরঙ্গ')

উপরের 'দিক্‌চক্র' সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের আদ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি 'দিক' এখানে দুই মাত্রার বৈকল্পিক মূল্য লাভ করেছে। কিন্তু অনেক বাংলা কবিতায় এরূপ যুগ্মধ্বনি একব্যষ্টিক বলেও গণ্য হয়েছে।

(ঘ) ক্রিয়াপদের অপ্রান্তিক স্বরান্ত যুগ্মধ্বনি -

রত্নহার! কিন্তু হায়, জিনি' শুধু মালা
কি হইবে বাড়াইয়া হৃদয়ের জ্বালা!
-(চক্রবাক, 'শীতের সিন্ধু')

উপরের 'বাড়াইয়া' ক্রিয়াপদের অপ্রান্তিক স্বরধ্বনির 'ড়াই' এখানে মাত্রাবৃত্তের প্রসারক রীতিতে দুই-মাত্রা।

(ঙ) কোন কোন সংস্কৃতজ শব্দের মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি -

কপোতের চঞ্চুপুটে কপোতীর হারায় কূজন,
পরিয়াছে বনবধূ যৌবন- আরক্তিম কিংশুক-বসন।
আজি নব-বসন্তের প্রভাত-বেলায়
গান হয়ে মাতিয়াছে আমাদের যৌবন-মেলায়।
- (চক্রবাক, '১৪০০')

এখানে 'যৌবন' শব্দ দ্বিতীয় পংক্তিতে চারকলা, কিন্তু চতুর্থ পংক্তিতে তিন-কলা।

নজরুল তাঁর প্রথম জীবনেই অক্ষরবৃত্তে তাঁর স্বকীয়তা দেখিয়েছেন যুক্তবন্ধ কবিতার পংক্তি-রচনায়। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের মুক্তক অক্ষরবৃত্ত কবিতাগুলির দীর্ঘতম পংক্তি ৮+১০ অক্ষরে দীর্ঘপয়ার, কিন্তু নজরুল ৮+৮+১০ অক্ষরেরও তার পংক্তি-সজ্জা করেছেন।

বাংলা ভাষার সকল বিখ্যাত কাহিনী-কাব্য ও মহাকাব্য বিরচিত হয়েছে প্রধানত চৌদ্দ-অক্ষরের সনাতন পয়ার-পদ্ধতিতে। অথচ অতি আধুনিক কবিগণ এই রীতি অনুসরণ করতে কেমন পরাঙ্মুখ। কিন্তু নজরুল চৌদ্দ-অক্ষরের সমিল পয়ার বন্ধে 'কবিতা -সমাধি', 'গোকুল নাগ', 'অশ্বিনীকুমার' 'দারিদ্র', 'শীতের সিন্ধ', 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ', 'দাড়ি-বিলাপ', 'নবীনচন্দ্র', প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

প্রসিদ্ধ কবিতা প্রণয়ন করে এই ছন্দোবন্ধ্যেও তাঁর অসামান্য দক্ষতা প্রমাণিত করেছেন। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখেছেন তাঁর 'নতুন চাঁদ' কাব্যের 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি' ও 'শিখা' কবিতা। নজরুল এ ছন্দে কোথাও মধুসূদনের ন্যায় অসম ও বিষম মাত্রার পরে যতিস্থাপনের দুঃসাহস দেখাননি, তিনি রাবীন্দ্রিক-রীতিতে ষোড়-সংখ্যক অক্ষরের পরেই পদচ্ছেদ করেছেন। দীর্ঘপয়ার শ্লোক নজরুলের মুক্তক কবিতাগুলোতে পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি সেই ছন্দোবন্ধে স্বতন্ত্রভাবে একটি কবিতাও লেখেননি। স্বরবৃত্ত অর্থাৎ দেশজ 'ছড়ার ছন্দ পরিণত রূপ নিয়েছে পয়ারে' অর্থাৎ অক্ষর বৃত্তে, এবং তা ''সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে'' ষান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত পর্বের উদ্ভব ঘটিয়েছে, এই অভিমত রবীন্দ্রনাথ অদ্ব্যর্থ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বাংলায় 'তিন মাত্রা মূলক' মাত্রাবৃত্তের উদ্গম এভাবে ঘটলেও চতুর্মাত্রিক ও পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্তের বিকাশে সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব অনস্বীকার্য।

চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে নজরুল তাঁর স্বকীয়তা দেখিয়েছেন অভিনব স্তবক রচনায়। তাঁর 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যের 'ফাল্গুনী' ও 'মাধবী-প্রলাপ' দুটি আশ্চর্য যতি-সুন্দর কবিতা। নিম্নে 'মাধবী-প্রলাপ' থেকে একটি স্তবক তুলে দিচ্ছি,

ও কি পিয়াল-কুসুম-ঝরা পরান কোমল,
ও কি বসন্ত-বনভূমি-রীতি-পরিমল?
ও কি কপোলে কপোল ঘষা
ওড়ে চন্দন খসা?
বনানী কি করে গোসা
ছোঁড়ে ফুল-ধুল?
ও কি এলায়েছে এলো-খোঁপা সাদা মাখা চুল?

এখানে প্রতি পংক্তির প্রারম্ভে আছে দুই-মাত্রার একটি অতি-পর্ব। স্তবকটির প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ পংক্তি ২+৪+৪+৪+২ মাত্রা-যোগে গঠিত। তৃতীয় পংক্তিতে দুই-মাত্রার অতি-পর্বের পরে আছে ৪+৪ মাত্রার তিনটি চরণ ও ৪+২ মাত্রার একটি সাধপর্ব। 'মাধবী প্রলাপ' ও 'ফাল্গুনী' নামক দু' কবিতার কোনো স্তবকে পংক্তির বা চরণের শেষে ছন্দঃরেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে এক-মাত্রার ফাঁক রাখা হয়েছে, কিন্তু তাদের কোথাও একটিও যুক্তপর্বিক পদ নেই, ফলে চার-মাত্রার চলনের মধুর লাস্যময়তা অনাহত ভাবে বেজেছে। নজরুল প্রতিভার এক অসামান্য সৃষ্টি হলো, পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত পক্ষ সংগে চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত চরণের মিশ্রণ দিয়ে গীতিকবিতা রচনা।

বাংলা মাত্রাবৃত্তে ছয়-মাত্রার চালে সর্বধিক সংখ্যক কবিতা সংরচিত হয়েছে। এই ছন্দে মুক্তক রচনার রীতি প্রবর্তন করেন নজরুল। তাঁর 'বিদ্রোহী' বাঙলা সাহিত্যে এই রীতির প্রথম কবিতা। তার কয়েক পংক্তি,

বল বীর
বল উন্নত মম শীর।
শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।------

Dhaka University Institutional Repository

মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক।
আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস, আমি সৃষ্টি বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস।

এই কবিতাটিতে পংক্তির হ্রস্বতম দৈর্ঘ্য ২+২ মাত্রা এবং দীর্ঘতম বিস্তার ২+৬+৬+৬+৬+৪ মাত্রা। পংক্তি প্রান্তের অপূর্ণ-পর্বগুলি দ্বিমাত্রিক (যথা, 'শির'), ত্রিমাত্রিক (যথা, 'মহাত্রাস'), ফলে সৃষ্টি হয়েছে ধ্বনিবৈচিত্র্য। কবিতাটির প্রায় প্রত্যেক পংক্তির প্রারম্ভে একটি দ্বিমাত্রিক অতি-পর্ব সংযোজিত হওয়ায় স্পন্দভঙ্গীতে এসেছে বৈশিষ্ট্য।

করাচীতে পল্টনের এক পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেবের কাছে নজরুল ইসলাম 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' পড়েছিলেন। সে-সময়েই তিনি হাফিজের ৯টি গজলের পদ্যানুবাদ করেন। ফারসী গজলের রূপান্তর করতে গিয়েই ছন্দের বিচিত্র কারুকার্যের দিকে নজরুলের প্রথম দৃষ্টি পড়ে।

স্বরবৃত্ত ছন্দে নজরুল সৃষ্টি করলেন বৈচিত্র্য।

৪	৪	৪	৩
হাত হতে মোর	হৃদয় যায়	দোহাই বাঁচাও	হৃদয়বান
আফসোস!	আমার গোপন সব	ফসকে যে দেয়	নিদয়-প্রাণ-

(দীওয়ান-ই-হাফিজ, নির্ঝর)

রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকার সমিল-মুক্ত স্বরবৃত্ত ছন্দে রচনা করেন নজরুল তাঁর 'কামাল-পাশা' কবিতা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রবর্তিত প্রাস্বরিক বা প্রস্বরমাত্রিক ছন্দে তরুণ বয়সেই রচনা করেন দীওয়ান-ই-হাফিজ'এর বাংলায় রূপান্তরিত কাবিতা।

৭	৭	৭	৫
হে মোর সুন্দর	চাঁদের চাঁদমুখ	তোমার রৌশন	রূপ মেখেই
রূপের জৌলুস	তোলায় টৌলদার	চিবুক গন্ডের	কূপ থেকেই

১৩২৮ চৈত্রের প্রবাসীতে নজরুল আরবী মোতাকারিব ছন্দে লেখেন দোদুল দুল। এ ছন্দের সাধারণ সূত্র।

৫	৫	৫	৫
ফাউন্‌লুন	ফাউন্‌লুন	ফাউন্‌লুন	ফাউন্‌লুন

এখানে 'ফুল' হ্রস্বসর, 'উ' দীর্ঘস্বর এবং 'লুন' বদ্ধস্বর।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল প্রথম বয়সেই সংস্কৃত ছন্দের ছাঁচেও কিছু কবিতা রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর 'ছায়ানট' কাব্যের 'পূর্বের হাওয়া'র পূর্ব তরঙ্গ কবিতাটির কিয়দংশ শাদূল বিক্রীড়িত ছন্দে নির্মিত।

সত্যেন্দ্রনাথের দত্তের 'ব্রক্ষমূর্ছা' ছন্দের আদলে নজরুল লিখেছেন-

VV---------	VVV--	VV--	V---
নব ঋত্বিক	নবযুগের	নমস্কার	নমস্কার
VVVV --	VVV -- --	V--	VVV--
আলোকে তোমার	পেনুআভাস	নওরোজের	নবউষার

('শরৎচন্দ্র', সন্ধ্যা)

সংস্কৃত 'তোটক' ছন্দে নজরুল রচনা করেন তাঁর 'জাগৃহি' কবিতা-

দোলে হিন্দোলে ভীন- তালে সৃষ্টি ধাতার,
বুকে বিশ্ব-পাতার বহে রক্ত-পাথার,........
('জাগৃহি', বিষের বাঁশী)

ছন্দ নিরুপিত হয় গাণিতিক নিয়মে। ছন্দ গঠনের মূলে থাকে কবির সচেতন মনের ক্রিয়া। নজরুল ছন্দচর্চা করেছেন কবিতায় প্রান সঞ্চারের প্রয়োজনে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,-

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর।
ভোরের আকাশ রাঙা হল রে
আমার পথ হল সুন্দর।
- (গীতিমালা-২১)

এ গানের সুর আমাদের অন্তরে আনন্দের সৌরভ বিস্তার করে। কিন্তু নজরুল যখন বলেন-

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার, কিসের তবে ডর?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
বধুরা প্রদীপ তুলে ধর।
কাল্ ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর।
-('প্রলয়োল্লাস', আগ্নিবীনা)

তখন সেই জয়ধ্বনিতে 'আমাদের চিত্ত ওঠে জেগে', সকল শংকা-ভয় বিস্তৃত হয়ে মহামৃত্যুর পথে আমাদের অন্তর হয় অভিসারী। রবীন্দ্রনাথ গাম্ভীর্য-ভরা, ওজন করা বাক্যে লিখেছেন 'বিদ্রোহী'। তার উপসংহার,

আশাহারা বিচ্ছেদের তাপ;
দুঃসহ দাহনে তার দীপ্ত করি হানির বিদ্রোহ
অকিঞ্চন অদৃষ্টেরে। পুষিব না ভিক্ষুকের মোহ।
-('বিদ্রোহী', বীথিকা, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' - ১৯শ খন্ড)

এর উচ্চতম নীতি কথার মহাত্মে আমাদের অন্তরে সম্ভ্রমবোধ জাগে সন্দেহ নেই। কিন্তু নজরুল যখন বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

বল বীর
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির
বল..... উঠিয়াছি চির-চিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর।

রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্রোহী' অক্ষরবৃত্তে দীর্ঘপয়ার পর্ববন্ধে বিরচিত, বাংলার এই সনাতন ছন্দের প্রধান গুণ গাম্ভীর্য ও স্থিতিস্থাপকতা। কিন্তু নজরুলের 'বিদ্রোহী' সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। বাংলা ভাষায় নজরুল এ ছন্দের প্রবর্তক। 'বিদ্রোহীর' উচ্ছৃংখল ভাব ও উদ্দাম আবেগ বহনের জন্য এ ছন্দই উপযোগী। এ ছন্দের গুনেই নজরুলের কথা হয়েছে প্রাণময় ও অন্তরস্পর্শী।

নাটক

নজরুলের কিশোর বয়সে রচিত 'চাষার সঙ', 'ঠকপুরের সঙ', 'মেঘনাদবধ', 'শকুনিবধ', 'দাতাকর্ণ', 'রাজপুত্র', 'কবি কালিদাস', 'আকবর বাদশা' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনে তাঁর কবি চরিত্রের আদিম রূপ লক্ষ্য করা যায়।

১৩৩৪ আষাঢ়ের 'নওরোজ' পত্রিকায় 'ঝিলিমিলি' প্রথম প্রকাশিত হয়। নজরুলের 'ঝিলিমিলি' রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটিকাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নজরুলের 'সেতুবন্ধ' রূপক নাট্য। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারার' সঙ্গে এর মিল রয়েছে।

'শিল্পী' ও 'ভূতের ভয়' রূপক নাটিকা-

উপরোক্ত চারটি রূপক নাটিকারই পরিসর স্বল্পপরিমিত; এগুলো রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী করে লিখিত নয়, বেতারে ও মজলিশে অভিনীত হওয়ারই উপযোগী।

'আলেয়া' নজরুলের প্রতীকী গীতিনাট্য।

নজরুলের 'মধুমালা' গীতিনাট্যের রচনাকাল অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৭। এই গীতিনাট্যের ভাষা মধুবর্ষী, গাঁথুনিতে সুঠাম শব্দগুলো হীরক খন্ডের মতো ঝকমক করছে। দক্ষ শিল্পীর মতো নজরুল চরিত্রগুলো অঙ্কন করেছেন; তাতে ভাস্কর্যের দীপ্তি আছে, তার চেয়েও বেশী আছে প্রাণের স্পর্শ। তাঁর এ শিল্পসৃষ্টি মহান ও কালজয়ী।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নজরুলের নাট্যচিত্র 'সাপুড়ে' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের 'পুতুলের বিয়ে' ছোট মেয়েদের গীতিনাটিকা, সেটি গ্রন্থবদ্ধ ও রেকর্ড হয়েছে। তাঁর 'বিয়ে বাড়ী', 'শ্রীমতী' ও 'প্রীতি-উপহার' রেকর্ড হয়েছে। 'ঈদল ফেতর' বেতার নাটিকা; এই নাটিকার নায়ক মহতাবের উক্তিতে আছে নজরুলের পরিণত বয়সের অধ্যাত্ম-কথার প্রতিধ্বনি।

নজরুলের রচিত 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৬ সালের জ্যেষ্ঠ মাসের 'সওগাতে'। 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী'তে যে আবেগ-প্রাচুর্য ও বর্ণনা-মাধুর্য রয়েছে, তাঁর তৎকালীন রচনায় তার ক্রমঃবিকাশই দেখা যায়। এটি 'বাঙালী পল্টনের এক ওয়ার্টে যুবকের আত্মকাহিনী' হিসেবে রচিত।

তাঁর 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থে এ গল্পটি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। 'রিক্তের বেদন' গল্পটিও এরূপ আর এক খামখেয়ালীর রোজনামচা।

-এ গল্পগ্রন্থের 'রাক্ষুসী' গল্পটি ব্যতিক্রমী। একটি টাইপ সৃষ্টির দিক দিয়ে এ গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

'স্বামীহারা' গল্পটিতে মানবিকতা ও প্রেমের একাগ্রতা মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করেছে।

'মেহের-নেগার' গল্পে প্রেমের মূল্য ও মর্যাদা স্বীকার করেছেন। প্রেম মানুষকে করে পবিত্র, করে অমৃতের অধিকারী, এই প্রত্যয় নজরুলকে দিয়েছে প্রথম থেকেই বিকাশের প্রেরণা।

প্রেমের মূল্য ও মর্যাদা 'ব্যথার দান' গল্পটিতে তিনি আরও গভীরভাবে স্বীকার করেছেন।

'হেনা' ও 'ঘুমের ঘোরে' গল্পগুলোতে আছে যুদ্ধের কথা। যুদ্ধের জন্য নায়কদ্বয় প্রেমকে অস্বীকার করেছে।

'অতৃপ্ত কামনা' গল্পটিতে অঙ্কিত হয়েছে এক করুন চিত্র।

নজরুলের প্রথম জীবনের 'রিক্তের বেদন' ও 'ব্যথার দান'-এর গল্পগুলোতে চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনা-সংস্থান বড় কথা নয়, আবেগের প্রগাঢ়তা ও কল্পনার ঐশ্বর্যে - এগুলো মনে আনে স্বপ্নাবেশ। তরুণ প্রেমের উদভ্রান্ত উচ্ছ্বাস ও বিরহী চিত্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এগুলোকে করেছে রসমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর 'বাদল বরিষণে', 'সাঝের তারা', 'দুরন্ত পথিক' প্রভৃতি যেন ভাষা ও বর্ণনার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে তিনি সুরশিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান হবেন, তার আভাষ এ দু'টি গল্পগুলোর অনেক ছত্র থেকেই অনুমান করা গিয়েছিল।

তাঁর পরিণত বয়সের রচনা 'শিউলি-মালা'র গল্পগুলো আঙ্গিক এবং বর্ণনাভঙ্গীর বিচারে অপেক্ষাকৃত অনবদ্য।

Dhaka University Institutional Repository

'শিউলি মালা'র প্রথম গল্প 'পদ্মা-গোখরো'। পল্লীগ্রামে এ ধরনের উপকথা সুপ্রচলিত। গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ ছাড়িয়ে উঠেছে মানবিকতার মাধুরী।

দ্বিতীয় গল্প 'জিনের বাদশাহ্' আরম্ভ থেকেই ব্যঙ্গরসে করছে ঝলমল। কিন্তু উপসংহারে এই ব্যঙ্গরস অকস্মাৎ এমন করুন রসে রূপান্তরিত হয়েছে যে, ভেবে বিস্ময় লাগে।

তৃতীয় গল্প 'অগ্নিগিরি'। এই গল্পটির আরম্ভ হাসির দীপ্তিতে, আর সমাপ্তি অশ্রুর কুয়াশায়। মনে হয় এটিই নজরুলের শ্রেষ্ঠ গল্প।

এ গ্রন্থের শেষ গল্প 'শিউলি মালা'। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নজরুল কিছুকাল ঢাকায় অবস্থান করছিলেন, তাঁর তখনকার জীবনের কিছু ছায়া আছে এ-গল্পে।

নজরুল সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়ণে আবদুল কাদির,

> ১৯০৫ খ্রী. ১৬ই অক্টোবর বাংলা বিভক্ত হলে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেছিলেন সেই বিভাগে অস্বীকারের সংকল্প জানাতে রাখী বন্ধন করে। কিন্তু তাঁর রাখী-বন্ধনের গান হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক মিলনের প্রকৃত সূত্র রচনায় মহৎ প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেনি, সেই ঐক্যের মন্ত্র কার্যতঃ সুচিত করে ভয়াবহ অনৈক্য। পক্ষান্তরে নজরুলের কণ্ঠে যে সংহতি-সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, তার মূল প্রেমের গভীরে, তাই তার প্রভাব হয়েছে এমন সর্বব্যাপী, এমন দুর্নিবার। তাঁর আহবানে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে, সকল মন্ডলীর মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছে- মুক্তির পথে, মনুষ্যত্বের পথে অভিসারী হয়েছে। তাই নজরুল নিঃসন্দেহে এদেশের জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি- প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি।

আবদুল কাদিরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের মতামত হচ্ছে, বাংলা সাহিত্য সমালোচনা প্রকাশের প্রথমেই আসেন আবদুল কাদির। নজরুল ইসলামের অসামান্য কবি প্রতিভা সম্বন্ধে প্রাথমিক অবস্থায় যে, কয়েক রস-বেত্তা আলোচনা করেছেন আবদুল কাদির তাঁদের মধ্যে পথিকৃৎ। তবে ত্রিশের দশক থেকে আমৃত্যু তাঁর নজরুল পর্যালোচনা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। বিশেষতঃ তাঁর বিভিন্ন প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন 'নজরুল প্রতিভার স্বরূপ' (১৩৯৫) আবদুল কাদিরের নজরুল মূল্যায়ণের সামগ্রিক পরিচয় বহন করে। কবি আবদুল কাদিরের নজরুল পর্যালোচনার মধ্যে সবচেয়ে গভীর নজরুলের কবিতার ছন্দের বিশ্লেষণ। অদ্যাবধি নজরুলের কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণে আবদুল কাদিরকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারেননি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাজী আব্দুল ওদুদ এবং সৈয়দ আলী আহসানের নজরুল সাহিত্যের পর্যালোচনা

কাজী আবদুল ওদুদ 'নজরুল প্রতিভা' (১৯৪৯) গ্রন্থে নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক জীবনের চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন।

প্রথম স্তর- তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা থেকে 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত।

দ্বিতীয় স্তর- 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পর থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান পর্যন্ত।

তৃতীয় স্তর- তাঁর সঙ্গীত রচনার, বিশেষ করে গজল রচনার যুগ।

চতুর্থ স্তর- তাঁর যোগী জীবন।

প্রথম স্তরে কাজী আবদুল ওদুদ নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পূর্বেই যে সাহিত্য জগতে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন তার বর্ণনা করেছেন। প্রথমেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের তুলনা করা হয়েছে। লেখকের মতে, 'বিদ্রোহী' থেকে তাঁর মানসজীবনের গতি যে মুখী হলো তার সঙ্গে পূর্বের ভাব-জীবনের সংগতি-অসংগতি দুই-ই রয়েছে। তাঁর এই যুগের একটি বিশিষ্ট রচনা 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাস। এতে দেখা যায় কবি একজন অসাধারণ ভাববিলাসী ও অভিমানী, ব্যর্থপ্রেমের বেদনায় গভীরভাবে আহত। কিন্তু এই আঘাত যত বড়ই হোক এতে মুহ্যমান তিনি হননি। এই নিস্করুণ আঘাতে তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে একটি মধু-স্রোত; কিন্তু এতে লাঞ্ছিত এমন কি ম্রিয়মাণও তিনি হননি। তবে তিনি অবলোকন করেছেন এক দায়িত্বহীন ভবঘুরের জীবন- সেই দায়িত্বহীনতায় তাঁর সুনিবিড় আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি; আর তাঁর প্রিয় ছিলেন ইরানী-কবিতিলক-হাফিজ তাঁর সূফী তত্ত্বের জন্যে নয়, তাঁর প্রেমের উন্মাদনার জন্যে।

আর এক শ্রেণীর মানুষের প্রতিও কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল- তাঁরা বাংলার সন্ত্রাসবাদী দল বা সশস্ত্র বিপ্লবী যারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

দ্বিতীয় স্তরে লেখক প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' অথবা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার সঙ্গে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার তুলনা করেছেন। এ কবিতাগুলো থেকেই দুই কবির জীবন-ধারার উপরে তাঁদের ভাবোচ্ছাসের প্রভাবের কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

কাজী আবদুল ওদুদের মতে, ১৩২৬ সালে- ইংরেজী ১৯১৯ সালে- নজরুল ইসলাম যখন কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত হন তখনই এক হিসাবে তিনি ছিলেন 'বিদ্রোহী'। তাছাড়া 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পূর্বেই 'শাত-ইল-আরব', 'মোহররম', 'কোরবানী' প্রভৃতি যে সব জনপ্রিয় কবিতা কাজী নজরুল লিখেছিলেন সে-সবে ব্যক্ত হয়েছিল মুসলমানসমাজের গতাণুগতিক

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের প্রতি ধিক্কার, এক বলিষ্ঠ নব জীবনারম্ভের জন্য তীব্র কামনা, আর অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি ও মহিমাময় তাঁর প্রত্যয়। লেখকের মতে এটি ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য খেলাফত যুগ। স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার হিন্দুর যে সাফল্য, মুখ্যত তাইই প্রেরণা জুগিয়েছিল মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলনে। কিন্তু হিন্দুর আয়োজনের ব্যাপকতা তাঁদের ছিল না, ফলে সফলতা তাঁদের জন্য হচ্ছিল সুদূরপরাহত।

কাজী আবদুল ওদুদের ভাষায় নজরুল যত বড় কবি তার চেয়েও বড় তিনি যুগ-মানব। যুগের বেদনা ও উন্মাদনা তাঁতে এত প্রবল যে, কবির কল্পনা-লোকে অবস্থান তাঁর পক্ষে যেন দুঃসাধ্য। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ ইসলামী কবিতা 'খালেদ'।

মধ্যযুগ বলতে মানুষের ইতিহাসের যে স্তর নির্দেশ করা হয় তাতে দেখা যায়, সংসারের প্রতিদিনের জীবনের প্রতি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতেই শিক্ষিতেরা তাকিয়েছেন। আধুনিক যুগ এক হিসাবে তার প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে ইংরেজ রাজত্বের প্রায় সূচনায়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে এই প্রতিবাদ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে। এই প্রতিবাদ আজ আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির এক Creed, ধর্ম বিশ্বাস, এক সময়ে যেমন তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস ছিল বৈরাগ্য। নজরুল একালের তেমনি প্রত্যয়শীল একজন ব্যক্তি। তবে তাঁর বিশেষত্ব এই যে, এই প্রত্যয় তাঁতে অনেকের চাইতে বলবত্তর-এতখানি প্রবলতা তাঁর এই বিশ্বাসে বিদ্যমান যে, আপাতদৃষ্টিতে যে সব মনে হয় অদ্ভূত খেয়াল-খুশী সে-সবকেও মহত্তর মর্যাদা দিতে তাঁর বাঁধে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর 'আলেয়া' নাটক।

একালের জীবনবাদ ও গতিবাদের যাঁরা শ্রেষ্ঠ কবি, যেমন ওয়াল্ট হুইটম্যান ও রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের বাণীর সঙ্গে তুলনায় নজরুলের বাণীর ত্রুটি অনেকক্ষেত্রে চোখে পড়ে, কিন্তু সেই সঙ্গেই চোখে পড়ে, বাণীর ত্রুটি তাঁতে যতই থাকুক জীবনের উপলব্ধি তাঁর সুগভীর। তাঁর বিখ্যাত কবিতা-সমষ্টি 'সাম্যবাদী' সম্বন্ধেও একথা খাটে। এতে তাঁর যুক্তিতর্ক যেমন প্রচুর তেমনি দুর্বল। কিন্তু সে-সবের মধ্যে দিয়ে যে বেদনাময় চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে তা পরম শ্রদ্ধার্হ।

কাজী আবদুল ওদুদের মতে, নজরুলের ভেতরে তারুণ্য চমৎকার, জীবনের আনন্দ তিনি সহজভাবে অনুভব করতে পারেন, নানা দিক দিয়ে তিনি একজন সহজ মানুষ- এ সবের কিছুই মিথ্যা নয়। অন্তরের গোপনতম প্রদেশে তিনি তাত্ত্বিক-আর সেই তাত্ত্বিকতা তাঁর যেন জন্মগত। কাজী আব্দুল ওদুদ এর নাম দিয়েছেন লীলাবাদ বা Pantheism এই লীলাবাদ তাঁর জন্য এক ধরনের আত্মবিস্মৃতি এনে দিয়েছে, তাঁকে আশ্চর্যভাবে নিরহঙ্কার ও সৌন্দর্য-পিপাসু করেছে, কিন্তু কবিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে এটি এই বাধা উপস্থিত করেছে যে এর ফলে বহির্মুখী না নয়ে অন্ত র্মুখী তিনি হয়েছেন অনেক বেশী; রূপ-বৈচিত্র্য অঙ্কনের চাইতে Type বা প্রতীক সৃষ্টির দিকে তাঁর মন ঝুকেছে।

Dhaka University Institutional Repository

'বিদ্রোহী' কবিতাটি যেন কবি চেতনার দুটি ধারা- এক দিকে তাঁর অন্তরে জাগে অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়, অন্যদিকে তিনি নিজেকে জ্ঞান করেছেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে দুঃস্থ মানবতায় অগ্রনায়ক।

যে-লীলাবাদে বিশ্বাস কবির মজ্জাগত বলেছি, তারও সঙ্গে আমাদের প্রথম স্পষ্ট পরিচয় হচ্ছে এতে, বিশেষ করে'এর এই সব চরণে,

জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ
স্বর্গ পাতাল মর্ত।
আমি উন্মাদ আমি উন্মাদ-
আমি চিনেছি আমারে আজিকে আমার
খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।

'বিদ্রোহী'তে কবির ঈশ্বর বিদ্রোহ প্রকাশ পায়নি বটে, কিন্তু এর পরের 'ধূমকেতু' কবিতায় সে বিদ্রোহ পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছে-

জানি ঐ ভূয়ো ঈশ্বর দিয়ে হয়নি যাহাও হবে তাও,
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি ---------- ইত্যাদি।

তাঁর 'বিদ্রোহী' যুগের প্রায় সমস্ত কবিতায় এই সাম্যবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু পুরোপুরি সাম্যবাদী নজরুল কখনো হননি, হলে তাঁর এই সাম্যবাদ প্রচারের দিনে 'খালেদ', 'ওমর' ও 'জগলুল' প্রভৃতি প্যান-ইসলামী ভাবের কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না। সাম্যবাদের প্রভাবে তাঁর ভিতরে ঘনীভূত হয়েছে দুঃস্থ ও বঞ্চিত মানবতার জন্য তাঁর দরদ। তাঁর ঈশ্বর দ্রোহ মানব সমাজের দুর্বল ন্যায়-অন্যায় বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ- অভিমানের ভঙ্গিতে; তার বেশী কিছু বলে' মনে হয় না।

তৃতীয় স্তরে লেখকের মতে, 'বিদ্রোহী'- যুগ নজরুল সাহিত্যের আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা তাঁর জনপ্রিয়তার মূল এই যুগের রচনা। কিন্তু এই যুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই 'বিদ্রোহী' যুগের উদ্দীপনা পূর্ণ-পরিণতি লাভ করবার পূর্বেই বিস্মিত দেশবাসী তাঁর কণ্ঠে শুনতে পেল- 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল' অথবা 'আমারে চোখ- ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদি' ইত্যাদি গজল। অর্থাৎ 'বিদ্রোহী'- যুগ নজরুলের জন্য জনপ্রিয়তা আনলেও তাঁর কাব্য- সাধনা ব্যপক সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর গানে।

'প্রতীক- প্রীতি' অধ্যায়ে লেখক বলেছেন, নজরুল বাংগালী মুসলমানের প্রিয় হয়েছেন তাঁর ইসলামী কবিতা ও ইসলামী গান দিয়ে। তাঁর প্রভাবে যে সমাজে নব উদ্দীপনা এসেছে, এ

Dhaka University Institutional Repository

কথাও সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল নজরুলের ইসলাম প্রীতির পাশাপাশি প্রতীক-প্রীতি নিয়ে।

নজরুল ইসলাম দার্শনিক নন-কবি। তাই বাংলার মুসলমানের নব-জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি দিয়েছেন কবির সহজ জীবনানন্দের ভিতর দিয়ে। হিন্দু দেব-দেবীতে তাঁর আনন্দ বাস্তবিকই অর্থপূর্ণ। এই আনন্দের ভিতর দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন জন্মভূমির সঙ্গে তাঁর যুগযুগান্তরের যোগ। নিজেকে এমন ব্যাপকভাবে ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে একই সঙ্গে সহজ মানুষ ও শক্তিমান হওয়া সম্ভবপর নয়।

'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'- এটি তাঁর এক খেয়ালী কথা নয়, এটি তাঁর ভিতরকার একটি স্থায়ী ভাব- প্রধান ভাব। বলা বাহুল্য, এমন আত্মমহিমা বোধ দুলর্ভ-- খুব উচুঁ দরের প্রতিভার মধ্যেই এর সন্ধান মেলে।

নজরুলের সার্বিক মূল্যায়ণে কাজী আবদুল ওদুদ,

> নজরুলের অত্যাশ্চর্য শক্তি, অথচ সাহিত্যে তাঁর অনবদ্য প্রকাশের অভাব, এটি তাঁর সাহিত্যের পাঠকদের দুঃখের বা ক্ষোভের কারণ না হোক- এটি বরং তাঁদের অন্তরে সঞ্চারিত করুক তীক্ষ্নতার জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে, কবি তিনি নিঃসন্দেহ- অনুভূতির গোপন আয়োজন তাঁর জগতে কখনো কখনো ঘটায় বাণীর অপূর্ব বিদ্যুৎ- দীপ্তি- কিন্তু কবি তিনি যত বড় তার চাইতেও বড় তিনি যুগ মানব। যুগের বেদনা ও উন্মাদনা তাঁতে এত প্রবল যে, কবির কল্পনা লোকে অবস্থান তাঁর পক্ষে যেন দুঃসাধ্য। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ ইসলামী কবিতা 'খালেদ'। খালেদের মহিমা উদাত্ত কণ্ঠে গাইবার চেষ্টাই তিনি করেছেন; কিন্তু দেখা যাচ্ছে, খালেদের বীরমূর্তি পূর্ণভাবে রূপায়িত করার চাইতে তাঁর মনে প্রবলতর তাঁর সমসাময়িক মুসলমান- সমাজের জন্য বেদনা অথবা অস্থিরতা।

সৈয়দ আলী আহসান

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর 'নজরুল ইসলাম' (১৩৬১) গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করেছেন এভাবে- প্রথমতঃ পরিচয়। এতে আছে আরম্ভ, প্রথম পর্যায় ও বিপ্লবী মন, ভাঙ্গারগান, যুগবাণী, নজরুল ইসলামের ছন্দ। দ্বিতীয় পর্যায় প্রতিধ্বনি- এতে রয়েছে নজরুল ইসলামের কতকগুলো বিখ্যাত কবিতা উদ্বৃত। তৃতীয় পর্যায় পরিশিষ্ট- এতে রয়েছে নজরুল জীবন-পঞ্জী, গ্রন্থ-পঞ্জী, নজরুল সম্বর্ধনা ও নজরুলের কয়েকটি রচনা। চতুর্থ পর্যায় পরিযোজন- এতে আছে মরু-ভাস্কর, বণ-গীতি, জুলফিকার, ফণি-মনসা। তাছাড়া-নজরুল ইসলামের কাব্যের ঐতিহ্য, নজরুল ইসলাম সংক্রান্ত আলোচনা এবং নির্দেশিকা।

আরম্ভ পর্যায়ে রয়েছে নজরুল ইসলামের অসুস্থতার কথা। সে সময়ে নজরুল জীবিত কিন্তু প্রাণবন্ত মানুষ হিসেবে অস্বীকৃত। আকস্মিক শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার আগেই অবশ্যই তিনি কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

রচনা থেকে বিরত থাকেন। তখনো হয়ত কিছু লিখেছেন কিন্তু তাতে নিরাভরণ তথ্যেরই প্রকাশ ছিলো শুধু, অক্ষুন্ন কাব্যিক-মাধুর্য ছিলো না। নিজস্ব উদ্দামতায় একদিন তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, উদ্দামতার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সে জগতও নেপথ্যে সরে গেল। ক্ষেত্র প্রস্তুত না ক'রে অতর্কিতে যে আলোড়ন শুধুমাত্র মুহূর্তকে স্বীকার করে এসে পড়ে তা' কখনো দীর্ঘায়ু হয় না। এই বেদনাদায়ক সত্য নজরুলের কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ ও অন্তর্ধানের আড়ালে বর্তমান, সৈয়দ আলী আহসানের ধারনা।

নজরুল আবির্ভাব রবীন্দ্রযুগে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যখন অত্যন্ত প্রবল, তখন তিনি অতর্কিতে নতুন এক সুর নিয়ে এলেন বাংলা কাব্যে। নজরুল তাঁর সুর দিয়ে সময়ের দাবী মেটাতে চেয়েছিলেন। পরিবেশ যা দাবী করেছিলো, কাছের মানুষের যা কাম্য ছিলো- বাংলা সাহিত্যে তা এনে দিয়ে কিছুদিনের জন্যে তিনি এক মূল্যবান আবর্ত সৃষ্টি করেছিলেন। সৈয়দ আলী আহসান রবীন্দ্রনাথের যুগে নজরুলের পাশাপাশি সত্যেন্দ্রনাথের কথাও উল্লেখ করেছেন।

লেখকের ভাষায়,

> সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিশিষ্টতা আছে, শ্রেষ্ঠত্ব আছে, কিন্তু যেহেতু বিরাট মহীরূপের পত্রচ্ছায়ার আড়ালে লালিত হয়েছিলো তাঁদের জীবন, তাই তাঁদের স্বকীয়ত্ব স্পষ্টভাবে লেখকের কাছে ধরা পড়েনি। যে কারণে নজরুল সকলের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন, তা হল প্রথমতঃ নিপীড়িতদের প্রতি উচ্ছ্বাসময় মমত্ববোধ, দ্বিতীয়তর দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি উদগ্র আবেগ।

সৈয়দ আলী আহসানের মতে,

কাব্যিক সৌন্দর্যের দিকে নজরুলের লক্ষ্য ছিল না। তাঁর রচনা ছিল লাঞ্ছিত এবং দুস্থদের জন্যে। বেদনাকে মেনে না নিয়ে তিনি বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মনের স্পৃহাকে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই আবেগ-প্রবণ মনের প্রকাশ পাই 'বারাঙ্গনা', 'কুলী' ইত্যাদি কবিতায়। সৈয়দ আলী আহসান বাংলা সাহিত্যসাধনায় মুসলমান কবিদের দানের কথা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক মুসলিম কবিদের মধ্যে কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, মীর মোশার্‌রফ হোসেন এবং আরো অনেকে। লেখকের মতে, ইসলামের অতীত কাহিনী এঁদের কাব্যের উপাদান যুগিয়েছে মাত্র।

এঁদের পরেই যারা এলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলো নতুন ইংরেজী শিক্ষার আলোক। তাঁদের প্রভাবও বেশী দিন টিকে থাকেনি।

সবশেষে এলেন নজরুল ইসলাম। তিনি অতীতকে প্রত্যক্ষ করলেন নতুন আলোকে। অতীতের এ নব রূপায়ণ বিভিন্ন ধারায় নজরুলের কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। কোথাও আছে স্বপ্নময় ভাবালুতা, কোথাও আছে স্মরণ, কোথাও আছে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে বিচার। সমস্ত কিছু নিয়ে তিনি উজ্জ্বল এক জগতের পরিকল্পনা করেছেন। বেদনার বিকল্প হিসেবে নয়- সহজভাবেই সমস্ত কিছুকে তিনি স্বীকার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

লেখকের মতে, রোমান্টিসিজম ও রিফরমেশন-এই দ্বৈত-সুরে নজরুলের কাব্য কখনও গতিহারা হয়নি। তাই নজরুলই আমাদের প্রথম জাতীয় কবি।

প্রথম পর্যায় ও বিপ্লবী মন অধ্যায়ে লেখক নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার কথা উল্লেখ করেছেন। আর এ পর্যায়ে নজরুলের ওপর মার্কিন কবি ওয়াল্ট-হুইটম্যানের প্রভাব আবিস্কারের চেষ্টাই প্রাধান্য পেয়েছে। মোদ্দাকথা বিদ্রোহ, বিপ্লব ও যৌবনের আবেগ যেখানে নজরুল ইসলামের কাব্যের উপপাদ্য হয়েছে, সেখানেই তিনি নিঃসঙ্কোচের হুইটম্যানকে অনুসরণ করেছেন। 'ভাঙ্গার গান'ঃ মানব মনের যে পর্যায়ে বিনাশের ইতিহাসই একমাত্র সত্য, 'ভাঙ্গার গান' তারই আবর্ত-সংকুল কাহিনীর বিন্যাস।

নজরুল ইসলামের 'যুগবাণী'র আবেদন একটি বিশেষ সময়ের মানুষের প্রচলিত চিন্ত ধারার ওপর নির্ভরশীল বলেই কালোত্তীর্ণ হতে পারেনি, কিন্তু তবুও এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় অনাচার, সামাজিক কুসংস্কার এবং মানুষের বদ্ধমূল দাস্যবৃত্তির বিরুদ্ধে এমন কতকগুলো কথা আছে যা' আজকের দিনেও অনিবার্যভাবে সত্য।

বিদেশী আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের যুগে 'যুগবাণী'র প্রবন্ধগুলো লিখিত। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের বিশৃংখলা, রুশের নবজাগরণ, ভারতের অসহযোগ আন্দোলন এসব নিয়ে দেশব্যাপী এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক এই পরিস্থিতি কিংবা বিক্ষোভকে যাঁরা ভাষা, ছন্দ ও বাণী দিয়েছিলেন, নজরুল ইসলাম তাঁদের একজন। এই সময়ের অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণের পরিচয়ই 'যুগবাণী'তে আছে।

তৎকালীন 'নবযুগ' এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত প্রবন্ধগুলো গ্রথিত করে 'যুগবাণী'কে সাজানো হয়েছে। কতকগুলো রচনা অত্যন্ত বেশী সাময়িক, যেমন, 'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', 'মহাজেরিন হত্যার জন্য দায়ী কে'? , 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি', 'লাট প্রেমিক আলী ইমাম', 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', 'ছুৎমার্গ', 'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ', কিন্তু এছাড়াও কিছু প্রবন্ধ আছে- যার সত্যতা পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ আজকের দিনেও মুছে যায়নি। যেমন 'ধর্মঘট' প্রবন্ধটি আজকের দিনেও নিষ্ঠুরভাবে সত্য।

'নজরুল ইসলামের ছন্দ' আলোচনা করতে গিয়ে লেখক প্রথমেই ইংরেজী লেখক- এড্‌গার এলান পো, শেলী ও সেক্‌সপীয়রের কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতে বাংলা ছন্দের আলোচনায় ক্রমান্বয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ছন্দ বৈশিষ্ট্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে। আর নজরুলের কবিতার ছন্দ বৈশিষ্ট আলোচিত হয়েছে নিম্নরূপভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

লেখকের মতে,

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ছন্দের সনাতন রূপকে অব্যাহত রেখেও শব্দাংশের ঝোঁক দিয়ে পর্ব, পদ ও বাক্যাংশের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন। নজরুল ইসলামের প্রতিভার ভাবগত ও ছন্দগত সৌন্দর্যের প্রথম উন্মেষ ঘটে 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'বিদ্রোহী' কবিতায় ছন্দের নতুনত্ব ও কোথাও কোথাও অন্তরাবেগের সুতীব্র স্ফূর্তির জন্য এই কবিতাটিই নজরুল প্রতিভার পথ নির্দেশক হয়ে আছে। কবিতাটি শুরু হয়েছেঃ

বল বীর-
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।
বল বীর-
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি,
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি
বিশ্ব-বিধাত্রীর।
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।

ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, 'বীর', 'শির', 'হিমাদ্রির', 'বিধাত্রীর', ও 'জয়শ্রীর' প্রত্যেক শব্দের মধ্যবর্তী 'ই' অথবা 'ঈ' স্বর বিলম্বিত লয়ের হওয়া সত্ত্বেও, শব্দান্তের 'অ' স্বর অনুচ্চারিত থাকায় প্রত্যেক শব্দের একটি ঝোঁকের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্ত স্বরে বিচ্ছিন্নভাবে ঝঃৎবংং আপতিত হওয়ায় বিভিন্ন পদ-মধ্যে গাম্ভীর্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া এ কবিতায় কবি আশ্চর্যভাবে একদিকে মহাপ্রাণ উষ্মবর্ণের ও অন্যদিকে অল্পপ্রাণ অন্তঃস্থবর্ণের অনুপ্রাসজনিত ঝোঁকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। তাছাড়া বিদ্রোহী কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণীয়।

'পূজারিণী' ও 'সিন্ধু' কবিতায় নজরুলের এক নতুন ছন্দ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল অক্ষরবৃত্তের যতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন পদভাগের প্রাথমিক মাত্রায় একটা চযৎধংধষ ধপপবহঃ বা বাক্যাংশগত বাড়ায় ঝোঁক সৃষ্টি করে বাংলা ছন্দের চিরাচরিত ক্লান্ত গতিতে প্রাণসঞ্চার করেন।

নজরুল ইসলাম ছন্দ ও মিলের বিচিত্র চাতুর্থ দেখিয়েছেন 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' কবিতায়।

(ক) মিলের বৈচিত্রঃ

নাই তাজ
তাই লাজ?

Dhaka University Institutional Repository

ওরে মুসলিম খরজু- শীর্ষে তোরা সাজ!
করে তস্‌লিম হর কুর্নিশে শোর আওয়াজ।

(খ) শুধু ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের সংলগ্ন-প্রয়োগে ছন্দ-স্পন্দের সৃষ্টিঃ
আজি বান্দা যে ফেরউন্ শাদ্দাদ্ নম্‌রুদ-মারোয়ান্

(গ) অক্ষরগত ও ঝংকাগত অনুপ্রাসের প্রয়োগঃ
শোন দামান্ কামান্ তামাম্ সামাম্
নির্ঘোষি কার নাম্

'ঝড়' কবিতায় পাওয়া যায় শব্দের দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের প্রকৃতি ও ধ্বনি প্রকাশ করবার চেষ্টা।

সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায়, নজরুল বাংলা ছন্দের পরিধির মধ্যে ইংরেজী ছন্দের বৈচিত্র্য এনেছেন।

পরিযোজন অধ্যায়ে সৈয়দ আলী আহসান 'মরু-ভাস্কর', 'বন-গীতি', 'জুলফিকার', ও 'ফণি-মনসা' গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে 'বন-গীতি' ও 'জুলফিকার'গানের বই। 'মরু-ভাস্কর' গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে,

> 'মরু-ভাস্কর' নজরুল ইসলামের সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ, কিন্তু রচনাকালের দিক থেকে বিচার করলে- ''নতুন-চাঁদ''-এর অনেক পূর্ববর্তী। প্রকাশের সঙ্গে কবির সম্পর্ক না থাকায় অনেক ত্রুটি ও শিথিলতার অন্তর্প্রবেশ ঘটেছে। ত্রুটি স্পষ্ট হয়েছে ছন্দ ও বাণী-বিন্যাসে এবং শিথিলতা, গ্রন্থ-পরিকল্পনা ও ঘটনার পারম্পর্যে।

'ফণি-মনসা' গ্রন্থ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান বলেন,

> সময় এবং কালের বিস্তৃত প্রসার সম্পর্কে কবির সচেতনতা থাকা বাঞ্ছনীয়, কেননা সত্যিকারের কবি একই সঙ্গে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবেন। 'ফণি-মনসা'য় নজরুল ইসলামের ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবেন। 'ফণি-মনসা'য় নজরুল ইসলামের এ-সচেতনতা আছে বলে মনে হয় না। তিনি এখানে ছন্দোবদ্ধ পদরচিয়তা, ইংরেজীতে যাকে বলে Verse সেই verse স্রষ্টা। মহৎ কবিতা বা সুন্দর কবিতা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, কিন্তু নিছক verse, যা বিশেষ প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্রে একান্ত মূল্যবান, 'ফণি-মনসা'য় নজরুল ইসলাম তারই কবি।

নজরুল ইসলামের কাব্যের ঐতিহ্যঃ নজরুল ইসলামের কাব্যে বিচিত্রধর্মী ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায়। সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কখনও তা হিন্দু-পৌরাণিকবোধকে জাগ্রত করেছে, আবার কখনও পারসিক-ঐশ্বর্য, বিলাস ও আনন্দের কথা স্মরণ করেছে।

'ঝড়' কবিতায় ঝড়ের বর্ণনায় যে রূপকের কল্পনা করেছেন তা প্রতীকধর্মী পৌরণিক জীবনের।

'ফাতেহা-ই-দেয়াজদহম' কবিতায় উন্মেষ-যুগের ইসলামের স্বপ্নের ঐতিহ্য বর্তমান।
আবার নজরুলের রচনায় হিন্দু-মসুলমান উভয় ঐতিহ্যের মিশ্রণ দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকগুলো উপমা ও রূপকালংকার বাংলা কাব্যক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের নিজস্ব সৃষ্টি। যেমনঃ

এসো, তুফান যেমন আসে,
সুমুখে যা পাবে দ'লে চ'লে যাবে অকারণ উল্লাসে।
আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
কূলের আবর্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারও ক্ষতি।

কাব্য ও ঐতিহ্য আলোচনায় সৈয়দ আলী আহসান নজরুলের সঙ্গে ওয়াল্ট হুইটম্যানের সাদৃশ্যের কথা বলেছেন।

ওয়াল্ট হুইটম্যান নিজের রচনা সম্পর্কে একটি কথা বলেছিলেন Who touches this touches a man -এ গ্রন্থে যে স্পর্শ করবে সে একজন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবে। নজরুল কাব্য সম্পর্কেও সে কথা খাটে। তাঁর কাব্য অতি তীব্রভাবেই ব্যক্তিগত- Most intensely personal.

প্রথমেই কাজী আবদুল ওদুদের 'নজরুল প্রতিভা' আলোচনায় লেখক নজরুলের সাহিত্যিক জীবনকে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করে আলোচনা করেছেন। এই স্তর বিন্যাস নজরুল সাহিত্য বিচারের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ লেখকের মতে, দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ 'বিদ্রোহী'র পরেই নজরুল তৃতীয় স্তরে গজল রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, কিন্তু লেখকের এ বক্তব্য ঠিক নয়। কেননা নজরুলের শেষ জীবনেও আমরা তাঁর সুন্দর রচনা পেয়েছি। তা সত্বেও কাজী আবদুল ওদুদ নজরুল সাহিত্য সমালোচনার প্রথম দিকের একজন। তা আমাদের জন্য কিংবা বাংলা সাহিত্যের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সৈয়দ আলী আহসান 'নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে নজরুলের রচনাকে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধকারে আলোচনা করেছেন। নজরুল ইসলামের অসামান্য কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে প্রাথমিক অবস্থায় যে কয়েকজন রসবেত্তা আলোচনা করেছেন কাজী আব্দুল ওদুদ তাঁদের মধ্যে একজন। লেখকের নজরুল ইসলামের ঐতিহ্য সম্পর্কিত আলোচনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইংরেজী ও বাংলা ছন্দের তুলনামূলক আলোচনা অভিনব এবং উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আজহার উদ্দীন খানের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা

আজহার উদ্দীন খানের 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' গ্রন্থে কতকগুলো প্রবন্ধ রয়েছে। যেমন, 'আধুনিক বাংলা কবিতা ও নজরুল', 'সৌন্দর্যের কবি নজরুল', 'প্রেমিক কবি নজরুল', 'সাধক কবি নজরুল', 'নজরুল সাহিত্যের আলোচনা', 'নজরুল সাহিত্যের বিচার', 'শিশু সাহিত্যে নজরুল', 'নজরুল সাহিত্যে নারী', 'সৌন্দর্যের কবি নজরুল', 'প্রেমিক কবি নজরুল' ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলা কবিতা ও নজরুল অধ্যায় পর্যালোচনায় আজহার উদ্দিন খানের বক্তব্য হলো, 'আধুনিক' কথাটির ব্যাপক ও আপেক্ষিক অর্থ থাকলেও আধুনিক বাংলা কবিতা বলতে সেই কবিতাকেই বোঝায়, যে কবিতার শুরু হয়েছে 'কল্লোলে'র কিছু আগে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহতি পর থেকেই। সে সময়কার অজস্র প্রশ্ন-সংকুলতার বেড়াজাল মানুষকে ছেঁকে ধরেছে কাজেই সাহিত্যেও তার প্রকাশ থাকা চাই। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ এবং রবীন্দ্র-প্রভাবিত তৎকালীন কাব্যসাহিত্যের পাশ কাটিয়ে সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক বাস্তবমুখীনতার তাগিদে মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের উচ্চূগলার সংস্কারমুক্ত বক্তব্য প্রকাশ হওয়া মাত্রই সে দশকের তরুণ পাঠক যেমনটি আকাঙ্খা করেছিল তেমনটি, তিনটি ভিন্ন সুরের সমবায়ে সমগ্র জীবনের প্রতিভাস পাওয়া গেল। আর তাঁদের কবিতাপাঠেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম হলো যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্ত মধ্যাহ্নের মধ্যে থেকেও সমকালীন কাব্য চিন্তাপদ্ধতি ও ভাষণ প্রযুক্তির দিক দিয়ে পূর্ণ স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে পারে। সুস্থ ও সবল মানুষের সম্ভোগক্ষমতা কত বিচিত্রধর্মী হতে পারে মোহিতলাল তা দেখালেন 'পান্থ বিস্মরণী' কবিতায়।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সমকালীন কাব্যে প্রকৃতিবিলাসকে সরাসরি বর্জন করে 'গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীরে'র স্থানে মরুভূমির রুক্ষতা নিয়ে এলেন, মুগ্ধ আত্মতৃপ্তির পরিবর্তে মানব সমাজের যারা ভিত্তি গড়ে তুলেছে তাদের অন্তর্জালাকে ব্যঙ্গ-শানিত কথনে রূপ দিলেন 'দুঃখবাদী; (মরুশিখা) কবিতায়।

আজহার উদ্দিন খানের মতে, আবেগ উদ্দামতা ও উত্তেজনার যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু পূর্ণ করলেন নজরুল ইসলাম। দুঃখবাদের বেদনা-বিধুর রোমন্থন নয় - 'বিদ্রোহী' কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠল বন্ধন মুক্তির দুর্বার আকাঙ্খা, মানবাত্মার লাঞ্ছনা নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বস্তুত তাঁর দৃপ্তময় চেতনাময় ঘোষণার পাশাপাশি সত্যেনদত্ত এমনকি মেহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বক্তব্যকেও মনে হবে যথেষ্ট মৃদু-

> আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
> নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার।

Dhaka University Institutional Repository

আমি হল বলরাম স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।
--- -- -- -- --- -- ---
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে একেঁ দেবো পদ-চিহ্ন
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।

(বিদ্রোহী; অগ্নি-বীণা)

সত্যেনদত্ত যেখানে স্বাভাবিক মানবতার খাতিরে মেথরকে বন্ধু, শূদ্রকে শুদ্ধ-সত্ত পাবকরূপে সম্বোধন করেন,

শূদ্র মহান গুরু গরীয়ান,
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার, ওগো।
শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে।

(শূদ্র-কাব্য-সঞ্চয়ন)

এখানে নজরুল ভিন্ন সুরে চড়া-গলায় বললেন,

আসিতেছে শুভদিন
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ-
--- -- --- -- -- --
সিক্ত যাদের সারা দেহমন মাটির মমতা-রসে
এই ধরণীর তরুণীর হাল রবে তাহাদেরি বসে।

(কুলি-মজুরঃ সর্বহারা)

লেখকের মতে, একথা বলা বাহুল্য যে আধুনিক কবিতার বিষয়বস্তুতে নবত্ব এলেও রূপ-নির্মাণে, অলংকরণে, বাকপ্রতিমায় তখন পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর আসেনি, তা শুরু হলো পরের দশক থেকে অর্থাৎ প্রেমেন্দ মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণুদে, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায়। কাজেই নজরুলের প্রভাব পরবর্তী বাংলা কবিতায় যেটুকু পড়েছে সেটা রূপকল্পের দিক দিয়ে নয়, পড়েছে মানুষ সম্পর্কে তিনি যেদিন যে নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন, সমাজ ও সংসারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় বইয়েছিলেন, তারই পোষকতায় পরবর্তী যাঁরা এগিয়েছেন তাঁরা রাজনীতির দিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্টতর এবং শ্রেষ্ঠতর কিন্তু ভাবনার দিক দিয়ে নজরুলের কাছাকাছি মানুষ।

তাছাড়া বুর্জোয়া সমাজের সর্বগ্রাসী পৈশাচিক লালসার প্রচন্ডতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী জনতা নজরুলের কবিতার মধ্যে প্রথম প্রেরণা পেয়েছিল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এবং সেই সূত্রেই তাঁর কবিতা আধুনিক যুগের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ধারাবাহিকতার মধ্যে সুস্থ-সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাসে আনাগোনা করে। তাই আধুনিক বাংলা কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে বাদ দেয়ার উপায় নেই।

সৌন্দর্যের কবি নজরুল অধ্যায় প্রসংগে লেখক,

Dhaka University Institutional Repository

তীক্ষ্ণতা যত সহজে লোকের মনে সাড়া জাগাতে পারে স্নিগ্ধতা তেমন পারে না। তার প্রমাণ নজরুল যে রুদ্র হয়েও রসবন্ত এ পরিচয় অনেকের নিকট অবিদিত। তাঁর সাহিত্যের বিপ্লবী ও বিদ্রোহীরূপ যত সহজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তত সহজে তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রকৃতির উপলব্ধি, প্রশান্ত প্রেমের লাবন্য-মাধুর্য যে রূপ মূর্তি পরিগ্রহ করে অপূর্ব সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছে তা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। তার কারণ হয়ত এটাই নজরুলের আবির্ভাব যে সময়ে, সে সময় ভারত ছিল পরাধীন। কাজেই পরাধীন জাতি তাঁর কাছ থেকে শৃঙ্খলভাঙার মন্ত্রেই উদ্বোধিত হয়েছে। প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাদির মূল্য তখন তাদের কাছে ছিল না।

আজহার উদ্দিন খানের ভাষায় নজরুলের 'ভাঙার গান'ও সৌন্দর্যে অনুরণিত, কেন না জাহান্নমের আগুনে বসেও তিনি পুষ্পের হাসি হাসতে পারেন। বিদ্রোহ-বিপ্লব তাঁর কাব্যের প্রধানতম সুর হলেও তাঁর কাব্যের একমাত্র সুর নয়। প্রথমেই তাঁর প্রসিদ্ধ 'বিদ্রোহী' কবিতার কথা, এ কবিতার মধ্যে একদিকে বিদ্রোহ বিপ্লবের উদাত্ত আহবান, যে বিদ্রোহ হচ্ছে 'কুৎসিত যাহা, অসাম্য যাহা সুন্দর ধরণীতে- হে পরম সুন্দরের পূজারী! হবে তাহা বিনাশিতে।' অপরদিকে বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের মাঝে গানের ছন্দের মত ললিত মধুরতার বাণী কর্মক্লান্ত দেহে বিরামদায়িনীর মত আশায় মনকে উদ্বুদ্ধ করে। কবির 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের-বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।' তাই কবিতাটি উদ্দেশ্যমূলক হয়েও কাব্য সৌন্দর্যে পরিমন্ডিত।

'অগ্নিবীণা' কাব্যে ফুটে উঠেছে কবির মধুর ও করুণরস। বীররস-প্রধান ধাতুর সঙ্গে যে মধুর রসের মিশ্রণ আছে তার আভাষ 'অগ্নি-বীণা'র 'বিদ্রোহী' কবিতাতে প্রথম পাওয়া যায়, আর পরবর্তী রচনায় প্রচুর মিলবে।

যেমন 'দোলন চাঁপা', 'ছায়ানট', 'চক্রবাক', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'বুলবুল' 'চোখের চাতক' প্রভৃতি বইতে। একেবারে শেষে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও যোগীজীবন যখন তাঁকে আকৃষ্ট করেছে তখন তাঁর বীররস, আদিরস প্রভৃতি ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে সর্বোত্তম শান্তির মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে।

অগ্নি-বীণার' মধ্যে চপল, উদ্দাম, উচ্ছাস যে ছিল ''দোলন-চাঁপায়'' তা শান্ত মধুর সুরে পরিব্যাপ্ত। ভাঙনের রুদ্র সুর এখানে আছে বটে, কিন্তু নির্মাণের বলিষ্ট উল্লাসে কবি উল্লসিত হয়েছেন,

গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিনাক-পানির শূল আসে।
ঐ ধুমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উলটাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।

আজহার উদ্দিন খানের মতে, 'দোলন-চাঁপা'য় যে প্রেমের মধ্যে ছিল মান-অভিমানের পালা, 'ছায়ানটে' যে-প্রেম দাঁড়িয়েছে মিনতির পসরা নিয়ে, 'সিন্ধু-হিন্দোলে'র 'সিন্ধু', 'অ-নামিকা', 'মাধবী-প্রলাপ', 'গোপন-প্রিয়া' প্রভৃতি কবিতায় সেই প্রেম দেহের বাসনা নিয়ে ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সেজন্য কবি চাঁদের কলঙ্কের মধ্যে ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ দেখেছেন; 'চক্রবাকে'র 'এ মোর অহঙ্কারে' ঈদের প্রথম চাঁদকে প্রিয়ার কানের পার্সি-ফুল হিসেবে, দেখেছেন। এ সব বাংলা সাহিত্যে নতুন না হলেও (গোবিন্দ দাস, মোহিতলালের মধ্যে দেহারতির পরিচয় নজরুলের পূর্বে ছিল) সেগুলোতে কবি-প্রাণের সাহসের পরিচয় আছে। নজরুলের কথায়- 'সুন্দরী বসুমতী চিরযৌবনা দেবতা ইহার শিব নয়-কামরতি।' তাই প্রেমের মধ্যে তিনি সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ মানেন নি; তাঁর প্রেম অসুন্দরকেও সুন্দর করে। তাঁর দৃষ্টিতে তাই বারাংগনা মা হিসেবে শ্রদ্ধা পায়,

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে?
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে।
নাই হলে সতী তবুত তোমরা মাতা- ভাগনীরই জাতি;
তোমাদের ছেলে আমাদের মত, তারা আমাদের জ্ঞাতি;
আমাদেরই মত খ্যাতি-যশ-মান তারাও লভিতে পারে,
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে।-

(বারাঙ্গনা- সাম্যবাদী সর্বহারা)

রস ও সৌন্দর্য সৃষ্টি যা কিছু সাহিত্যের প্রাণবন্ত হোক না কেন মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা যখন সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করে, তখন সে রস ও সৌন্দর্য মানুষের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই জন্ম নেয়, কঠিনতার মধ্যে যে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তার প্রমাণ নজরুলের 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা', 'প্রলয় শিখা', 'ভাঙ্গার গান', 'বিষের বাঁশী', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি কাব্য। দুঃখ-পীড়ন লাঞ্ছনার মধ্যেই আনন্দের সন্ধ্যান দেন কবি। অনাগত সুদিনের তরে শত উৎপীড়ন- নিপীড়নকে জয় করেই কবি অমৃতের গান শোনান।

আজহার উদ্দিন খানের ভাষায়, অশ্রুসিক্ত সুন্দর বিশ্বকে ছেড়ে বিশ্বাতীত সৌন্দর্যের কবি তিনি নন, কেননা সংসারের নিত্য সংগ্রাম ও কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে বসে শুধু বাঁশী বাজিয়ে আরামের বিলাস-জীবন তিনি কখনো যাপন করেননি; দেশ জাহান্নামে যাক, চারদারে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলুক আর নীরোর মতো ঘরে বসে বীণার তারে আঁচড় দিয়ে কল্পলোকের জাল-বোনার স্বপ্ন তাঁর ছিল না। দুঃখ ব্যথা বেদনায় উদাসীন বৈরাগ্যের মত নির্লিপ্ত নির্বিকার শান্তির বাঁধা বুলি আওড়াননি তিনি। তাই চিরকালের যা প্রকৃত, যা নিত্যের প্রত্যক্ষ, যা সহজে প্রাপ্ত, তাতে যে রস ও যে সৌন্দর্য থাকে, নজরুল সেই রসের রসিক, সেই সৌন্দর্যের কবি।

প্রেমিক কবি নজরুল প্রসঙ্গে লেখক বলেন, কোন কবির নামের আগে যদি কোন বিশেষণ জোটে তাহলে সেটি হবে কবির বিরল সৌভাগ্যের এবং দুভার্গ্যের ব্যাপার। কেননা বিশেষণটি কবিকে একটি নির্দিষ্ট দিকে পরিচিত করে তুলে- তাঁর কবি-কৃতির পূর্ণ পরিচয় বহন করে না।

বিদ্রোহের রূপ কবিকে সাহিত্য সমাজে এত বেশী পরিচিতি দিয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে তিনি যেরূপ অনন্যতা দেখিয়েছেন সেটির মতো বাংলা প্রেম-কবিতার সুবিপুল ঐতিহ্যে প্রখর উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, আমাদের সাহিত্যে প্রেমের কবিতার অভাব নেই,

Dhaka University Institutional Repository

আত্মপন্থী প্রেমের কবিতা উপভোগের জন্যে বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরের উত্তর সাধকদের গীতিকাব্যের ব্যপ্তি ও গভীরতায় আমরা এমনি রসাপ্লুত হয়ে পড়ি যে, নজরুলের প্রেমের কবিতায় রোমান্টিসিজমে মগ্নহবার আগ্রহই থাকে না।

আজহার উদ্দিন খানের কথায়, নজরুল কোন ধরা-বাঁধা পথে পদচারণা করেননি-বাধা বন্ধন হারা দুরন্ত বালকের মতো সবকিছু আচার-বন্ধন, নিয়ম-কানুন ভেঙে পথ তৈরী করেছেন। তাঁর কবিতার এই বৈশিষ্ট্য প্রেমের কবিতাতেও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। যে তারুণ্যের জোরে তাঁর শির উন্নত, চির-দুরন্ত, দুর্মদ তিনি, সেই তারণ্য বন্ধনহারা ষোড়শী কুমারীর প্রেমেও উদ্দাম, চঞ্চল মেয়ের ভালবাসায় মুখর। বাঙলার মজ্জাগত রোমান্টিসিজমের প্রভাবকে তিনি এড়িয়ে চলতে পারেননি। জাতীয় কবিতা ও সঙ্গীতে নজরুলের ভাষা যেমন অগ্নিবীণা, প্রেম বিরহের কবিতাতেও তেমনি তাঁর ভাষা অশ্রুসিক্ত। তাঁর হৃদয়- বেদনার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রকৃতি একাত্ম হয়ে গেছে। তাঁর কাব্য চরিত্রের এ দুটি দিক পরস্পর, বিরোধী সত্তা নয়, একটি মৌল প্রত্যয়, কারণ যে স্পর্শ-চঞ্চলতা ও ভাবালুতা তাঁকে বিপ্লবী করেছিল সেই প্রাণময়তাই তাঁকে প্রেমিক ও হৃদয়ধর্মী করেছে। মোদ্দাকথা তাঁর জীবন সাধনার দুটি দিক তাঁর একটি মাত্র কথায় এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা হাজার কথা খরচ করলেও বলা যেতো না।

মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য।

(বিদ্রোহী; অগ্নি-বীণা)

সাধক কবি নজরুল প্রসঙ্গে লেখক বলেন, যে কবি বলেছিলেন, 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু-ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন, আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন' সেই কবিই গেয়েছেন 'শিরোপরি মোর খোদার আরশ, গাই তারি গান পথ বেভুল।' কথাগুলোর মধ্যে অসামঞ্জস্য আবিস্কার করা কঠিন নয় কিন্তু নজরুলের কবি-মানস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তিনি প্রথম থেকেই বিশ্বাসী কবি। হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম ঐতিহ্যধারায় যাঁর জীবন স্নাত হয়েছিল, সেই সাধক কবি নজরুলের ধর্মপ্রবণতা বুঝতে হলে, তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের পরিচয় আমাদের নিতে হবে।

আজহার উদ্দিন খানের ভাষায়, কবির আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে খুব অল্প বয়সে বাবাকেও হারান। তাই তিনি জীবন নির্বাহ করার জন্য মসজিদে কাজ নেন। পাশাপাশি আসে পাশের পাড়াগাঁয়ে মোল্লাগিরি ও করেছেন। তাই ইসলাম ধর্মের ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে পালন করতে হয়েছিল। পরবর্তীতে লেটো দলে যোগ দেয়ার ফলে পালাগান লেখার সময় তাঁকে হিন্দুপুরাণগাথার সাহায্য নিতে হয়েছিল। উভয় ধর্মের সঙ্গে এভাবে তাঁর পরিচয় হয়- পরবর্তীতে এ জ্ঞান আরো বিস্তৃত হয়েছে। এ সময়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন কতিপয় হিন্দু মুসলমানের নাক সিটকানো মনোভাব-পরস্পরকে ঘৃণা করার, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা। তিনি আরো দেখেছেন ধর্মের আবরণে ক্ষুধিত পীড়িত মানুষের সহজ বিশ্বাসকে বিকৃত করে কেমন করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে পীর-পুরোহিতরা।

Dhaka University Institutional Repository

আজহার উদ্দিন খানের মতে, প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে চলে গেলেন করাচী। ফিরে এসে সময়ের প্রয়োজনকে অনুভব করে একের পর এক 'অগ্নি-বীণা', 'ভাঙ্গার গান', 'বিষের বাঁশী', 'প্রলয় শিখা' লিখতে শুরু করেন। কবিতার মধ্যে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কথাই তিনি বললেন না, সামাজিক কুসংস্কারকেও আঘাত করলেন, কারণ তিনি জানতেন দেশের আন্দোলনকে জোরদার করতে হলে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান সর্বপ্রথম বিলুপ্ত করতে হবে। মানুষকে সচেতন করার জন্য তাঁর এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল সেদিন। আচারসর্বস্ব জড়বাদী দেশে তিনি আনলেন এক জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। সেজন্য ভগবানের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করতে তার দ্বিধা হয়নি। তাই বলে তিনি নাস্তিকও ছিলেন না। যে ভগবানের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন যাকে লাথী মেরে ঘুম ভাঙাতে চেয়েছিলেন তাকেই 'ফরিয়াদ' কবিতায় নিজের নালিশ পেশ করেছেন। মানুষকে ও ধর্মকে এক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যেখানে জীবনের সঙ্গে ধর্মের মিল হবে, ধর্মের আওতায় মানুষ গড়ে উঠবে না, ধর্ম গড়ে উঠবে জীবনের আওতায়,

মানুষে রে ঘৃণা করি'
ও' কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি!
ও' মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে।
পূজিছে গ্রন্থ ভন্ডের দল! মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ - গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!
(মানুষ-সাম্যবাদী: সর্বহারা)

তাই মানুষকে জাতের গন্ডী দিয়ে বিচার করা হবে না, ধর্ম মানুষের সঙ্গে আচার-আচরনের প্রতিক্রিয়ারূপে থাকবে না, থাকবে মানুষের উদার মনের প্রতিভূ হিসেবে। সেজন্যে নজরুলের কাছে আল্লা ও হরির মধ্যে কোন ব্যবধান নেই-যিনিই রাম তিনিই রহিম, কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, "পাগল তারা আল্লা ভগবানে ভাবে ভিন্ন যারা"।

জড় মুসলমান সমাজকে সেদিনকার স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশ গ্রহন করার জন্য 'আনোয়ার', 'ওমর', 'খালেদ', 'কোরবানী', 'মোহররহম', 'শাত-ইল-আরব', 'শহীদী ঈদ' এবং আরো অনেক কবিতা লিখেছেন। তাই তিনি অসংখ্য গানে তাকে ডাক দিয়েছেন,

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল।। (জুলফিকার)

নজরুল বিশ্বাস করেন, এক পরমেশ্বরই সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতান্তরাত্মা। নজরুল এই সত্য জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি নয় প্রেম দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। কাজেই হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদ রাখেননি। যে মন বলতে পারে 'মোহাম্মদ মোর নয়ন মনি মোহাম্মদ মোর জপি মালা' সেই মনই গাইতে পারে 'আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়ন-তারা হৃদয়ে মোর রাধা প্যারী।'

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল সাহিত্যের আলোচনা ঃ- আজহার উদ্দিন খানের মতে, নজরুল যখন বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেন তখন রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশয়ী প্রভাব সমস্ত সাহিত্যিক চেতনাকে পরিব্যপ্ত করে রেখেছে। সৈনিকজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ নজরুলের জীবনানুভূতি স্বতন্ত্র হওয়ায় তাঁর প্রকাশরীতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াবার জন্য তাঁকে বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের কবিদের মত সজ্ঞানকৃত চেষ্টা করতে হয়নি। নজরুল জীবনকে দেখেছেন, আঘাত করেছেন, আঘাত দিয়েছেন, তাদের সমতলে নেমে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করেছেন, কাজেই অভিজ্ঞতার জোরে অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্যে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত হয়েছেন- সেটা জীবনের উন্মাদনার দিক, যে উন্মাদনা যৌবনের অঙ্গ তাকেই রূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছু দূরত্বের সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু প্রেম প্রকৃতি বর্ণনায় তাঁর স্বকীয়তা বিদ্রোহীরূপের মত প্রখর নয়।

আজহার উদ্দিন খানের মতে, ভারতবর্ষে যখন একদিকে অসহযোগ আন্দোলনের জনপ্রিয়তা অপরদিকে সন্ত্রাস আন্দোলনের অপ্রতিহত যাত্রা তখনই অর্থাৎ সেই ভাংগনের যুগে-সেই চঞ্চলতার যুগে নজরুল 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'প্রলয়শিখা' হাতে নিয়ে বিপ্লব ও সংগ্রামকে কামনা করলেন। নজরুল তাঁর তীর লেখনীখাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ধর্মধ্বজীদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন কবিকে বিব্রত করেননি, তিনি মানুষের জয়গান গেয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার দিনে তিনি তাদের উদার মানবিকতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, ধর্মের মহান বানীতে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন, জীবনের উজ্জ্বল আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর সমগ্র-সাহিত্য সাধনাই সাক্ষ্য দিবে। এখানে শুধু তাঁর একটি কবিতার কিছু অংশ উদ্বৃত করা হলো,

জাতের চাইতে মানুষ সত্য
অধিক সত্য প্রাণের টান,
প্রাণ ঘরে সব এক সমান।
বিশ্বপিতার সিংহ আসন
প্রাণ-বেদীতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাইত প্রাণ।

(সত্য-মন্ত্র; বিষের বাঁশী)

নজরুল-সাহিত্যের বিচার বিশ শতকীয় বাংলা কাব্যের প্রথম দু'দশক বড়ো সংকটের সময় গেছে। তৎকালীন কবিরা রবীন্দ্রনাথের চারপাশে বেড়াতে আরম্ভ করলেন। তবে 'কল্লোলে'র তরুণ কবিরা বাস্তবকে উপলব্ধি করলেন, রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবে কয়েকজন কবির আত্মবিসর্জন দেখে তাঁরা প্রমাদ গণলেন। 'কল্লোলে'র তরুন কবিদের সে আকাঙ্খা সত্যেন দত্তের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে মিটেছিল। মোহিতলাল, নজরুল, জীবনানন্দ এঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কিন্ত যে যাঁর নির্দিষ্ট পথ বেছে নিয়ে তাঁর প্রভাবকে ঝেড়ে ফেলেছেন। কিন্তু তরুন কবীরা বিষয়ের দিক থেকে যে গভীরতার সন্ধান খুঁজে ফিরছিলেন তা সত্যেন দত্তের কবিতায় ছিল না। এই তাগিদ থেকেই মোহিতলাল

Dhaka University Institutional Repository

দেহাত্মবাদ নিয়ে এলেন, যতীন সেনগুপ্ত সুর তুললেন দুঃখবাদের আর কয়েকজন সাংসারিক আত্মতৃপ্তির আসরে আনলেন স্বপ্নলুব্ধ যাঙময়তা। বাংলা কবিতায় নতুন সুর এল কিন্তু জনসাধারণ যেন তাতেও তৃপ্তি পাচ্ছে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদের শাসন মন্ত্র ক্রমবর্ধমান আঘাতে কঠোরতর হচ্ছে, দেশের উপর পৈশাচিক হত্যাকান্ড চলেছে, দেশবাসীর আসা আকাঙ্খাকে সমূলে ধ্বংস করছে, তখন তারা আশা করেছে সাহিত্যিকদের তাদের দুঃখ-ব্যথায় সহযোদ্ধা হতে, আত্মচেতনা ও জাগরণের অমোঘবাণীর সন্ধান জানতে। কিন্তু জাতির সঙ্কটমুহূর্তে তাঁরা তাদের পাশে এসে দাঁড়াননি। এরই মাঝে নজরুল অন্যায় জড়ত্ব-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য মন নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়া মাত্রই একই সঙ্গে জনসাধারণ ও তরুণ কবিদের মনকে চুম্বকের মত টেনে নিলেন। জনসাধারণ যা চাচ্ছিল তা তাঁর কাব্যে পেল এবং যাঁরা সত্যেন দত্তীয় কাব্যভঙ্গীর পথে সার্থকতার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তাঁরা নজরুল ইসলামের পথে এসে দাঁড়ালেন। নজরুল স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে নিছক শব্দঝঙ্কার ও পদলালিত্য জাতিকে সজাগ করতে পারবে না, চাই বক্তব্যে চড়া গলায় কঠিন সুর, যা শোনা মাত্রই 'উৎসাহে বসিবে রোগী শয্যার উপরে।'

আজহার উদ্দিন খানের মতে, কাব্য-রচনায় বসে তিনি কাব্যালংকারের দিকে তাকাননি, তাকিয়েছিলেন তাঁর বিরাট দেশের দিকে- দারিদ্র্য অশিক্ষা-অত্যাচারে নিষ্পোষিত জনতার দিকে, যারা রুটি চায়, কাজ চায়, সৌন্দর্যকে উপভোগ করার মত শান্ত পরিবেশ চায়। তাই তিনি জনগণকে সচেতন করার জন্যে রুদ্রের মত সংহার মূর্তি ধারণ করেছেন, কারণ তিনি জনতার শক্তিতে শ্রদ্ধাশীল বিশ্বাসী কবি বলেই নিশ্চিত জানতেন যে, সুন্দর সুখী সমাজ গড়ে তুলবে এরাই। এই বিশ্বাসের বাণী শুধু তিনি কবি হিসেবে নন, ন্যায় ও সত্যের সৈনিক হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

"জান যায় যাক্ পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়"

----- এই বাণীই তাঁর সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা যা শক্তিহীন পীড়িত মানুষের সর্বাত্মক সংগ্রামের সর্বাঙ্গীন সঙ্কল্পকে বজ্রকঠোর সুকঠিন ইস্পাতের মত মনোবল যোগাচ্ছে।

আজহার উদ্দিন খানের ভাষায়, নজরুলের কবি-,মানস সেদিন দু'জন নেতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে- তাঁরা হলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও কমরেড মুজফ্ফর আহমদ। বারীন ঘোষের কাছে তিনি বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নেন আর মুজফফর সাহেবের সংস্পর্শে এসে চাষী-মজুরদের অশ্রু সজল বেদনার সঙ্গে পরিচিত হন। এঁদের সান্নিধ্য ও তখনকার পরিস্থিতি এবং প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, মুসলিম সংস্কৃতির দুর্বার সাহসিকতা, হিন্দু ঐতিহ্যের আত্ম সমাহিত সাধনা তাঁর অফুরন্ত আশাবাদে, গভীর সত্যনিষ্ঠায় মানবজাতির ভাস্বর ভবিষ্যতের অটুট আস্থায় এমন এক উপকরণ যুগিয়েছে যাতে করে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে রবীন্দ্র প্রবর্তিত ধারা বাইরেও জনমানুষ সমুস্থ ভাবধারাকে রসোত্তীর্ণ করে কবিতা লেখা যায় এবং লিখলে কবিতার জাত যায় না। এখানেই তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু সাহিত্যে নজরুল প্রবন্ধে লেখকের মতামত হচ্ছে, রবীন্দ্র-যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে নজরুল বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী-গানে, গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, এক কথায় সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে তিনি নিজের আলোকসামান্য প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। শিশু সাহিত্যে ও নজরুলের অবদান রয়েছে।

নজরুল রবীন্দ্রনাথের মতো তত্ত্বের গহন অরণ্যে প্রবেশ করে শিশুতত্ত্ব অবিস্কার করেন নি। তবে তাঁর কবিতায় কিছ কিছু তত্ত্ব কথা আছে যা রবীন্দ্র ভাবনায় ভাবিত। শিশুর জন্মরহস্য নিয়ে নজরুল যে কবিতা লিখেছেন তা রবীন্দ্র ভাবনায়ই অনুকৃতি। তাছাড়াও স্কুল পালানো, স্কুল ছুটি এসব বিষয়ে ও রবীন্দ্রনাথ উকিঝুঁকি মারেন। নজরুলের শিশু সাহিত্য সে সময়কার রচনা- যে সময়ে নজরুল প্রতিভা অর্ন্তমুখী হয়নি; তাই সে সময়কার রচনায় শিশু মনের চঞ্চলতা, তরুন মনের উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে- যা শিশুদের মন সহজেই জয় করে নিতে পারে। তিনি রচনার মধ্যে বয়সকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন- এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

নজরুল শিশুদের নিয়ে কবিতার মধ্যে শিশুদের খেলিয়েছেন, হাসিয়েছেন। তাঁর 'মা', 'লিচু চোর', 'খুকী ও কাছবেড়ালী' প্রভৃতি কবিতা আমাদের দেশে সব শিশুদেরই প্রায় মুখস্থ আছে।

নজরুল সাহিত্যে নারী নজরুল কোন সংস্কারের কাছে দাসখৎ লেখেননি, জীবন ও সাহিত্যে কোন জীবনবিরোধী সমস্যার অবতারণা করেননি বলেই পুরুষের সংগে নারীর সম-অধিকার স্বীকার করেছেন, 'স্বর্ণ-রোপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরী'তে বন্দিনী নারীকে দাসীত্বের চিহ্ন বিসর্জন দিয়ে মুক্তির মন্ত্রে উদ্বোধিত করেছেন। সম্মান দেখাবার ছলে যে সমাজ নারীকে একদিকে আধ্যাত্মিকরাজ্যের দার্শনিকতায় মহিমান্বিত করে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করে আবার অপরদিকে ব্যবহারিক জীবন দাসীর ন্যায় অবজ্ঞা ও অবহেলা করে এই দু-প্রকার অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

নারীর ওপর স্বেচ্ছাচারী ধর্মান্ত পুরুষ-সমাজ যেভাবে মাতা, কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীরূপে Exploit করেছে- তার ফিরিস্তি "নারী", "মিসেস এম, রহমান", "বারাঙ্গনা" কবিতায় পাওয়া যায়।

নারী অবলা নয়, তার মধ্যে যে আদ্যাশক্তির অমিত সম্ভাবনা নিহিত আছে তার সম্বন্ধে সে অচেতন বলেই নারী অবরুদ্ধ জীবনের অবমাননা মুখ বুজে সহ্য করে। তাই কবি জাগরনী মন্ত্রে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন সুপ্ত সিংহীকে,

চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথায় ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল।
যে ঘোমটা তোমা করিপাছে ভীরু ওড়াও সে আভরণ।
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন যেথা যত আভরণ।
--- --- --- --- --- ---

Dhaka University Institutional Repository

ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মত আয় মা পাতাল ফুঁড়ি।
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি।
(নারী-সাম্যবাদীঃ সর্বহারা)

নজরুল নারীর রণ-রঙ্গিনী মূর্তিই কামনা করেননি, তাকে প্রেমময়ী বধূ, স্নেহময়ী জননী ও প্রিয় দয়িতারূপেও চিত্রিত করেছেন। তাঁর অজস্র গান ও কবিতায় তার প্রমাণ রয়েছে। নারীর প্রেমময়ী কল্যাণী মাতৃমূর্তিরূপও তাঁর দৃষ্টিতে উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত হয়েছে,

দুর দুরান্ত হতে আসে ছেলে মেয়ে
ভুলে যায় খেলা তারা তব মুখে চেয়ে!
বলে, 'তুমি মা হবে আমার?' ভেবে কী যে!
তুমি বুকে চেপে ধর, চক্ষু ওঠে ভিজে
জননীর করুনায়!

আবার অপরদিকে নারীর প্রতি সন্দেহ সংশয় অশ্রদ্ধাও প্রকাশ পেয়েছে যেখানে সে মোহময়ী ছলনাময়ী মায়াবিনী। নারী হৃদয়ের কঠিনতায় রূঢ়তা, উপেক্ষা, উদাসীনতা, নির্মমতা তাঁকে মাঝে মাঝে এমন বিবশ করে দিয়েছে যে নারীর সততায় তিনি সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থ নারীর এই নিষ্ঠুর রূপেরই আলেখ্য।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর নারী প্রেমই তাঁকে বিদ্রোহী করেছে- প্রকৃতি প্রেমই আরেক অর্থে তাঁর নারী প্রেম। "বিদ্রোহী", "অ-নামিকা", "সিন্ধু", "এ মোর অহঙ্কার", "গোপন প্রিয়া" প্রভৃতি কবিতা ও গানে নিত্যকালের প্রিয়াকে তিনি আহ্বান করেছেন।

নজরুল সাহিত্যের সার্বিক মূল্যায়ণে আজহারউদ্দীন খাঁন,

> 'ভারতীয় রাজনীতিতে যখন খেলাফত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আলী ভাতৃদ্বয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতা আনয়ন করার কাজে ব্যাপৃত, তখন নজরুল এই মিলন প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করে তোলবার জন্যে লিখলেন 'কামাল পাশা' ও শত-ইল-আরব'। এই কবিতা দুটির উদ্দেশ্য ঐশ্লামিক রাষ্ট্র-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা নয়, ঐ কবিতাদ্বয়ের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের সামনে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম-তমুদ্দুনের সংমিশ্রণে ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতনরূপ ফুটিয়ে তোলা। তাই নজরুলের কাব্যে ও গানে সংস্কৃতির সমন্বিতরূপ দেখতে পাই। হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেকের জ্ঞান আছে প্রচুর কিন্তু নজরুলের মত উভয় সংস্কৃতির প্রতি সর্বসংস্কারমুক্ত চিত্ত অপর কারোর মধ্যে তেমন দেখিনি। একদিকে হিন্দু-সংস্কৃতির মনীষা, ত্যাগ ও তপস্যা, অপরদিকে মুসলিম সংস্কৃতির দুর্বার তেজ ও দুরন্ত মাহলের অপূর্ব মিশ্রণে যে দিব্য মানবত্বের সৃষ্টি হয় কবি নজরুলের সাহিত্য সেই রমাদর্শের সাহিত্য। এটি তাঁর জনপ্রিয়ার অন্যতম কারণ।

আজহারউদ্দীন খান 'বাংলা সাহিত্য নজরুল' (১৩০৪) গ্রন্থটিতে নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের কয়েকটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে 'আধুনিক বাংলা কবিতা ও নজরুল' অধ্যায়টি বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন লেখকদের তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে এবং তাঁদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সুশীলকুমার গুপ্তের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা

সুশীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল-চরিতমানস' গ্রন্থের বিষয় বিন্যাস এরূপঃ প্রথম ভাগঃ ১ম অধ্যায়ঃ নজরুল যুগ, ২য় অধ্যায়ঃ নজরুল জীবন। দ্বিতীয় ভাগঃ ১ম অধ্যায়ঃ কবি নজরুল, ২য় অধ্যায়ঃ অনুবাদক নজরুল, ৩য় অধ্যায়ঃ শিশু সাহিত্যে নজরুল, ৪র্থ অধ্যায়ঃ নজরুলের উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ, ৫ম অধ্যায়ঃ নজরুলের সাংবাদিকতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ গীতিকার ও সুরকার নজরুল। তৃতীয় ভাগঃ ১ম অধ্যায় ঃ নজরুলের উত্তরাধিকার, ২য় অধ্যায়ঃ বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে নজরুলের অবদান, ৩য় অধ্যায়ঃ নজরুলের উত্তরসাধক। অতএব আলোচনা যে সর্বাত্মক তা মনেতেই হবে। তবে আমার বিষয় যেহেতু 'নজরুল সাহিত্য সমালোচনার ধারা' সেহেতু সাহিত্যের পর্যালোচনা করব।

লেখক এ গ্রন্থের তিন ভাগের প্রথম ভাগে নজরুলের যুগ ও জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় ভাগে তাঁর (নজরুলের) সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তৃতীয় ভাগে নজরুলের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

কবি নজরুল সম্পর্কে সুশীলকুমার গুপ্তের আলোচনা, বাংলা সাহিত্যে কবি হিসেবে নজরুল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন; রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের চরম উৎকর্ষের সময়ে যখন অধিকাংশ কবি তাঁর সর্বব্যাপী প্রতিভার কাছে দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মসর্ম্পণ করে কাব্য সরস্বতীর অরাধনা করেছিলেন, সেই সময় নজরুল তাঁর অগ্নিবীণা হাতে নিয়ে বিদ্রোহী বেশে বাঙলা সাহিত্য প্রাঙ্গনে আবির্ভূত হলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অনেকাংশে অস্বীকার না করেও নজরুলের কাব্য যে সুর ও স্বরে বিশিষ্ট, এ কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কাব্য ভাবনা ও রীতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), মোহিতলাল (১৮৮৮-১৯৫২) ও যতীন্দ্রনাথ (১৮৮৮-১৮৫৪) নজরুলের পূর্বসূরী হলেও তাঁর কাব্য প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্খা, ব্যথানৈরাশ্য ও বিদ্রোহ বিক্ষোভের যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, এ কথা না মেনে উপায় নেই। রবীন্দ্র বিরোধীতার ক্ষেত্রে প্রথম বলিষ্ঠ কবিকণ্ঠ তাঁরই। জনজীবনের সঙ্গে কাব্যকে সার্থকভাবে যুক্ত করার প্রথম গৌরব বহুলাংশে তিনিই দাবী করতে পারেন। বাঙলা কাব্যের বিদ্রোহ, পৌরুষ ও যৌবনের অগ্রগণ্য ভাষ্যকারদের মধ্যেও তিনি অন্যতম। তাঁর রবীন্দ্র বিরোধিতামূলক বিদ্রোহ পরবর্তী বাংলা কাব্যের আধুনিক কবিদের স্বকীয় বৃত্ত খুঁজে নিতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করেছে। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কবিদের নিজস্ব স্বরও সুর নির্ণয়ে তাঁর প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর আলোচনায় নজরুলের কাব্য গ্রন্থগুলির প্রকাশকালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। আলোচনার প্রথমেই প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লোখ করে সমস্ত কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ করে নিয়েছেন। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়বস্তু ও গঠনরীতি আলাদা ভাবে দেখিয়েছেন। কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ নিয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বিয়াল্লিশ সালের আগষ্ট বিপ্লবের আরম্ভকালের মধ্যে নজরুল প্রতিভার উদয় ও অস্ত হয়েছে। দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হবার পর তাঁর কতগুলি কাব্যগ্রন্থ, যেমন-'নতুন চাঁদ', 'মরু-ভাস্কর', 'শেষ-সওগাত' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। আগষ্ট বিপ্লবের পূর্বে প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হচ্ছে- 'অগ্নিবীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'বিষের বাঁশী', 'ছায়ানট', 'পূর্বের হাওয়া', 'চিত্তনামা', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফণি-,মনসা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'জিঞ্জীর', 'চক্রবাক', 'সন্ধ্যা' ও 'প্রলয়শিখা'। এই কাব্যগ্রন্থ গুলির ভাববস্তুর বিচার করলে তিনটি ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফনিমনসা', 'জিঞ্জীর', 'সন্ধ্যা' ও 'প্রলয়-শিখা' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর মোটামুটি এক। কবির বিদ্রোহীরূপ এগুলির মধ্যে প্রধানতঃ পরিস্ফুট। দেশপ্রেম, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে কবির বিক্ষোভ, নৈরাশ্য, আশা ইত্যাদি কাব্যরূপ পেয়েছে।

'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'পূর্বের-হাওয়া', 'সিন্ধূ-হিন্দোল' ও 'চক্রবাকে'র মধ্যে কবির প্রেমিকরূপই বেশী মাত্রায় প্রতিফলিত। মানবিক প্রেম, বাৎসল্য, প্রকৃতি প্রেম ইত্যাদি বিষয়ই এই সব গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। 'নতুন চাঁদ', 'শেষ সওগাত' প্রভৃতি গ্রন্থের বিশেষ কোন চরিত্র নেই। উপযুক্ত তিনটি ধারার কবিতাই এই সব গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'চিত্তনামা' ও 'মরু-ভাস্কর' জীবনবিষয়ক কাব্যগ্রন্থ।

সুশিল কুমার গুপ্তের মতে, নজরুল ইসলামের সর্বাপ্রেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নীবীণা' প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালের (১৯২২) কার্তিক মাসে। এই কবিতাগ্রন্থে (১) প্রলয়োল্লাস (২) বিদ্রোহী (৩) রক্তাম্বর-ধারিনী মা (৪) আগমনী (৫) ধুমকেতু (৬) কামালপাশা (৭) আনোয়ার (৮) রণ-ভেরী (৯) শাত-ইল-আরব (১০) খেয়াপারের তরনী (১১) কোরবানী (১২) মোহররম্। এ ছাড়া একটি উৎসর্গ কবিতা আছে। নজরুলের সকল কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে 'বিদ্রোহী'। কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালের দুর্গাপূজার সময়। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি অনেকখানি সামাজিক ও রাজনীতিক চেতনাজ্ঞান সমৃদ্ধ। সুশীল কুমার গুপ্তের মতে, 'বিদ্রোহী' বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিম্বলিক কবিতা। নজরুলের এই সার্থক সিম্বলিকের মূলে কাজ করেছে তাঁর অপ্রতিহত দুর্দান্ত পৌরুষ, উদ্দাম উন্মুক্ত হৃদয়াবেগ এবং বীর্যবন্ত চির-উন্নত-শির অহমিকা। এই অহমিকার উদগ্রতম প্রকাশের আর একটি সার্থক উদাহরণ 'ধুমকেতু' কবিতাটি। বস্তুতঃ নজরুলের 'বিদ্রোহী' ও 'ধুমকেতু' কবিতা দুটির মধ্যে তাঁর বিদ্রোহের যে রুদ্রদেব প্রকাশিত তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে অন্যান্য বিদ্রোহভাবমূলক রচনায়। এ জন্যে এ কবিতা দুটি তাঁর কাব্য জগতে একটি বিশেষ গৌরবময় আসনের অধিকারী।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল আবেগ প্রধান কবি বলে কাব্যের বহিরঙ্গ- গঠনে তাঁর কৃতিত্ব অন্তরঙ্গ- নির্মাণ নৈপুন্যের তুলনায় কম। ..... নজরুলের ভাষা লক্ষনীয় পরিমাণে বেগবান, শানিত, সংগ্রামমুখর ও বলিষ্ঠ। ..... তাঁর পূর্বে ভাষার ঠিক এই ধরনের সংগ্রামশীল মূতির সঙ্গে আমরা পরিচিতি ছিলাম না। শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারে নজরুল দেশীবিদেশী, তৎসম, তদ্ভব প্রভৃতি সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রেই অবাধ স্বাধীনতা গ্রহন করেছেন।

নজরুল যৌগিক ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও স্বরবৃত্ত ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। স্বরবৃত্ত ছন্দে নজরুল যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, যৌগিক ছন্দে নজরুলের শক্তি সীমিত। নজরুল ও ... কাব্যদেহকে অলংকারে ভূষিত করেছেন। শব্দালংকারের মধ্যে ধ্বন্যুক্তি বা ধ্বনিবৃত্তি এবং অনুপ্রাসের ব্যবহার নজরুল কাব্যে বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

'অনুবাদক নজরুল' অধ্যায়ে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে, যে সব কবি অনুবাদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন, নজরুল যে তাঁদের মধ্যে একজন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় স্বল্প থাকলেও আরবী ও ফারসী সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আরবী ও ফারসী সাহিত্যের অমর ভান্ডার থেকে ভাব, শব্দ, ছন্দ, সুর প্রভৃতি সংগ্রহ করে তিনি বাংলা ভাষাকে ঐশ্বর্যশালী করতে সর্বরূপ যত্নবান ছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙলার নিজস্ব ভাব ও ভাষার প্রতিও তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ছিল বলে অন্য সাহিত্য থেকে তিনি যা চয়ন করে এনেছেন তা বাংলা ভাষার নিজস্ব জিনিস হয়ে উঠেছে। তাঁর অনুবাদের পরিমাণ তেমন বেশী না হলেও তা উৎকর্ষের মান সামান্য নয়।

নজরুলের অনুবাদ গ্রন্থ তিনটি। এগুলো হচেছ- 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' (আষাঢ় ১৩৩৭ সাল- ১৯৩০), 'কাব্য আমপারা' (১৯৩৩) ও 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ম' (১৯৫৯)। এ ছাড়া নজরুল ইংরেজী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি কবিতার অনুবাদ ও ভাবানুবাদ করেছেন।

নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' ও 'রুবাইয়াৎ-ই- ওমর খৈয়াম' গ্রন্থদ্বয়ের মূল ফারসী পদ্য এবং 'কাব্য আমপারা'র ভিত্তি আরবী গদ্য। তিনি সবক্ষেত্রেই যথাসম্ভব মূলের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছেন।

প্রবন্ধঃ সুশিল কুমার গুপ্তের ভাষায়, নজরুলের প্রবন্ধগুলো মননশীলতার অভাবহেতু অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ এবং উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপকে কন্টকিত। নজরুলের কোন কোন রচনা অবাঞ্ছিতমাত্রায় প্রচারমূলক। তা সত্বেও নজরুলের কয়েকটি রচনা তাঁর ব্যক্তিমানসের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন সমালোচনার জন্যে মূল্যবান তাই এক বিশেষ ধরনের আবেগ ও পৌরুষসমন্বিত গদ্যপ্রণয়নে তাঁর স্থান উপেক্ষণীয় নয়।

Dhaka University Institutional Repository

'যুগবানী'র প্রকাশ কাল ১৩২৯ সালের কার্তিক মাস (অক্টোবর, ১৯২২ খ্রীঃ) অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকারের শোষন, অত্যাচার, অন্যায় এবং এদেশীয় সমাজের ভীরুতা, অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নজরুল সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে সব জ্বালাময়ী ও আবেগাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন তাদের কুড়িটি 'যুগবাণী' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ প্রবন্ধগুলো হচ্ছে 'নবযুগ', 'গেছে দেশ দুঃখ নাই', 'আবার তোরা মানুষ হ', 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', 'ধর্মঘট', 'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান', 'ছুৎমার্গ', 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন', 'মুখবন্ধ', 'রোজ-কেয়ামত বা প্রলয় দিন', 'বাঙালীর ব্যবসাদারী', 'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?' 'কালা আদমিক গুলি মারা', 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি', 'লাটপ্রেমিক আলি ইমাম', 'ভাব ও কাজ', 'সত্য-মিক্ষা', 'জাতীয় শিক্ষা', 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়'। 'যুগবাণী'র একবিংশ ও শেষ প্রবন্ধ 'জাগরণী', ১৩২৭ সালের (১৯২০) আষাঢ় মাসের 'বকুল'-এ 'উদ্বোধন' শিরোনামে আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থটি বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এসব প্রবন্ধের বাস্তববোধ নিষ্ঠা-রাজনৈতিক চেতনা, স্বভাবসিদ্ধ ভাবাবেগের প্রাবল্য ও গভীর মানবপ্রেম রচনাশৈলীর ত্রুটি ও উদ্দেশ্য পরতন্ত্রতা সত্ত্বেও পাঠকের মনকে দূরন্তভাবে আকর্ষণ করে ও নাড়া দেয়। বস্তুতঃ এসব রচনা যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা উদ্দীপনের জন্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা করতে এরা অনেক পরিমাণেই সফল হয়েছিল- একথা মনে রাখলে এগুলোর কতকটা সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

'ধূমকেতু' প্রবন্ধ ১৩৬৭ সালে (১৯৬০) অগ্রহায়ণ মাসে আত্মপ্রকাশ করে। এ গ্রন্থে সংকলিত একুশটি লেখা হচ্ছে, 'ধূমকেতুর আদি উদয় স্মৃতি', 'ধূমকেতুর পথ', 'আমার ধর্ম', 'মোহররম', 'মুশকিল', 'লাঞ্ছিতা', 'বিষবাণী', 'নিশাল-বরদার', 'তোমার পণ কি', 'ভিক্ষা দাও', 'আমি সৈনিক', 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য', 'মেয় ভূখাঁ হঁ', 'কামাল', 'ব্যর্থতার ব্যথা', 'আমার সুন্দর', 'ভাববার কথা', 'আজ চাই কি', 'নজরুল ইসলামের পত্র', 'একখানা চিঠি' (ইব্রাহিম খাঁ) ও 'চিঠির উত্তরে।'

উপন্যাসঃ সুশিল কুমার গুপ্তের মতে, উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নজরুল বিশেষ কোন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হননি।

'বাঁধন-হারা' নজরুলের প্রথম উপন্যাস এবং বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। এটি প্রথম ১৩২৭ সালের (১৯২০) বৈশাখ মাস 'মোসলেম ভারতে' ধারাবাহিক ভাবে বের হয়। পুস্তকাকারে এর প্রথম প্রকাশ- শ্রাবণ ১৩৩৪ সাল (১৯২৭) গ্রন্থটি সুরসুন্দর নলিনীকান্ত সরকারকে উৎসৃষ্ট।

নজরুল-কবি-মানসের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে নুরুল-চরিত্রের কতটা স্বার্থকতা থাকলেও 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের নায়কচরিত্ররূপে- এটি রসোত্তীর্ণ নয়। নূরুল- চরিত্রের কোন বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ নেই। উপন্যাসের প্রথমে বাঁধন-হারা নূরুলের যে পরিচয়, উপন্যাসের শেষেও তার কোন রূপান্তর নেই। উপন্যাসের আখ্যানভাগ বা প্লটটি শিথিল ও সংহাতহীন। তাছাড়া নায়কচরিত্রে

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবমুখিতার অভাব পীড়াদায়ক। শুধুমাত্র সাহিত্যিকের জীবনদর্শন ও ব্যক্তিসত্তার একটি দুর্লক্ষ্য ছায়াভাস নায়কচরিত্রে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় এটি একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় গৌরবান্বিত।

পত্রোপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র চারটি- মাহবুবা, সোফিয়া, রাবেয়া ও সাহসিকা। সব দিক বিবেচনা করলে প্রধান স্ত্রী-চরিত্র, মাহবুবা, কেননা মাহবুবাকে কেন্দ্র করেই অন্য নারী চরিত্রগুলো অনেক পরিমানে বিবর্তিত। মাহবুবাই নুরুলকে ভালবেসে 'নিজের হাতে মরনের মুখে' যুদ্ধে পাঠিয়েছে আর তাই এ পত্রোপন্যাসের মূলসূত্র।

'মৃত্যু-ক্ষুধা' [প্রথম প্রকাশ-ফাল্গুন ১৩৩৬ (১৯৩০ খ্রীঃ)] উপন্যাসের জন্যে নজরুল সৎঔপন্যাসিকের গৌরব সঙ্গতভাবেই কতকটা দাবী করতে পারেন। এই একটি গ্রন্থই সত্যকার উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। এই উপন্যাসেই নজরুল জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্খা, বেদনা ও নৈরাশ্যকে সার্থক শিল্পীর মত স্পর্শ করতে পেরেছেন। মৃত্যু-ক্ষুধার পটভূমিকা কৃষ্ণনগরে। নজরুল এক সময় কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ-সড়ক এলাকায় বাস করতেন। শ্রমজীবি খ্রীস্টান ও মুসলিমেরা এই স্থানের বাসিন্দা ছিল। 'মৃত্যু-ক্ষুধা' এই পরিবেশে লেখা। উপন্যাসের সময় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের যুগ।

'মৃত্যু-ক্ষুধার' ভাষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কোন কোন জায়গায় আঞ্চলিক বা গ্রাম্যভাষা প্রয়োগ করে গ্রন্থাকার তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলো ও তাদের পরিবেশকে জীবন্ত করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। কয়েকটি স্থানের বর্ণনা যেমন নিখুঁত বাস্তবানুগ, তেমনি কবিত্বময়।

'কুহেলিকা' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। এই উপন্যাসের উপর রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাহিরে' (১৯১৬) এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের-দাবি'র (১৯২৬) প্রভাব লক্ষণীয়।

ছোটগল্প- সুশিল কুমার গুপ্তের মতে, রচয়িতা হিসাবে নজরুল বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী নন।

'ব্যাথার দান' গল্পগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ খ্রী)। এটি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। গ্রন্থটিতে ছয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে 'ব্যথার দান', 'হেনা', 'বাদল-বরিষনে', 'ঘুমের ঘোরে', 'অতৃপ্ত কামনা' ও 'রাজবন্দীর চিঠি'।

'ব্যথার-দান'-এ দারা ও বিদৌরা এবং 'হেনা'য় সোহরাব ও হেনার বিরহমিলনের কাহিনী কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এ দুটি গল্পের মধ্যে অন্যান্য গল্পের তুলনায় কতকটা আখ্যায়িকা রস আস্বাদন করা যায়। যুদ্ধস্থানের মৃত্যুচ্ছায়াম্ন পটভূমিতে রচিত প্রণয়কাহিনীতে একটি অভিনব জীবনবেদনার রস সঞ্চারিত। অত্যধিক ভাবাবেগ ও উচ্ছলতা মৃত্যুবিভীষিকার মধ্যে প্রেম ও

Dhaka University Institutional Repository

জীবনপিপাসার তীব্রতারই প্রতীক। তবে স্থানে স্থানে এই উচ্ছ্বাসাধিক্য কাহিনীর গতিকে ভারাক্রান্ত করেছে বলে মনে হয়।

'বাদল-বরিষনে', 'ঘুমের ঘোরে', 'অতৃপ্ত কামনা' ও 'রাজবন্দীর চিঠি', গল্পগুলোর মধ্যে একটি কবি মনের বিরহবিধুর ও অশ্রুদীপ্ত প্রেমস্মৃতিমন্থনের ইতিবৃত্ত বিধৃত হয়েছে। উচ্ছাসের আতিশয্যে এই ইতিবৃত্তগুলো কুয়াশাচ্ছান্ন হলেও প্রেমিকহৃদয়ের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ও আবেগানুভূতির রৌদোজ্জ্বল রেখাচিত্রন ও এগুলোতে অবর্তমান নয়। কথাবস্তুর লক্ষণীয় অভাব কয়েকটি ক্ষেত্রে কতকটা পুষিয়ে দিয়েছে কবিত্বময় তীব্র ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক বর্ণনার মাধুর্য।

'রিক্তের বেদন' (প্রথম প্রকাশ-১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ)- এ মোট আটটি গল্প আছে। গল্পটির মধ্যে মানবপ্রেমের একটি বেদনাদীপ্ত রূপ প্রস্ফুটিত। কাব্যধর্মী ভাষার উষ্ণতা এই প্রেমকাহিনীকে পুষ্পিত করতে সহায়তা করেছে। বাগবাহুল্য বাদ দিলে 'রিক্তের বেদন' একটি মোটামুটি উপভোগ্য গল্প।

'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' বাঙালী পল্টনের একটি বওয়াটে যুবক, যে বাগদাদ গিয়ে মারা পড়ে, নেশার ঝোঁকে তার আত্মস্মৃতিরোমন্থনের বৃত্তান্ত। এই কাহিনীতে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের সামান্য প্রতিফলন ঘটেছে বলে এটি একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় মন্ডিত। এটি ১৩২৬ সালের জ্যেষ্ঠ মাসের 'সওগাত'-এ আত্মপ্রকাশ করে।

'মেহের-নেগার' গল্পে মুসলমান যুবক য়ুসোফের সঙ্গে মেহের নেগার ও গুলশানের বিয়োগান্ত প্রনয়কাহিনী কাব্যময় ভাষায় আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রিত। কিন্তু আখ্যানভাগের দৈন্য ও আবেগের প্রাবল্য গল্পের রসনিস্পত্তির পথে বাঘাত সৃষ্টি করেছে।

'সাঁঝের তারা'র মধ্যে কথিকার ঢঙটি প্রবল এবং এর উপর রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র রচনাশৈলীর প্রভাব একান্তভাবে অনুভবগম্য।

'রাক্ষুসী' ও 'স্বামীহারা' গল্প দুটিতে দুটি নারীর যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মকাহিনী বিবৃত হয়েছে।

'সালেক' গল্পটির উপর 'লিপিকা'র প্রভাব গভীরভাবে বিদ্যমান।

'দুরন্ত পথিক' কথিকায় মানবাত্মার শাশ্বত সত্যের পথে এক মুক্তদেশের উদ্বোধন বাঁশির সুর ধরে চিরযৌবনের প্রতীক এক দূরন্ত পথিকের জয়যাত্রার ইতিহাস কীর্তিত।

'শিউলি-মালা' গল্পগ্রন্থ (প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর-১৯৩১) চারটি ছোটগল্পের সঞ্চয়ন- 'পদ্ম-গোখ্‌রো', 'জিনের বাদ্‌শা', 'অগ্নি-গিরি' 'শিউলি-মালা'। কলকাতার নামকরা তরুণ ব্যরিষ্টার আজহারের সংগে শিউলি নামে একটি মেয়ের বিয়োগান্ত প্রণয়কাহিনীই 'শিউলি-মালা' গল্পের উপজীব্য। কাব্যধর্মী ভাষাও এখানে জীবন যন্ত্রণার তীব্রতাকে ফোটাতে সহায়তা করেছে। ১৯২৮

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্টাব্দে যখন নজরুল ঢাকায় যান তখন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্টতা হয় তার স্মৃতি 'শিউলি-মালা' গল্পে ছায়া ফেলেছে।

'পদ্ম-গোখরো' একটি পল্লী উপকথা উপলক্ষ্য করে রচিত। একটি অতিপ্রাকৃত পরিবেশে গল্পটি গড়ে উঠলেও মানবিকতার মধুরতায় তা হৃদয়গাহী হয়ে উঠেছে। নায়িকা জোহ্‌রার চরিত্রটি উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত।

'জিনের বাদশা' গল্পটির উপসংহার বিস্ময়কর। নায়ক আল্লারাখা ও নায়িকা চানভানুর চরিত্রচিত্রনে নজরুল অসামান্য পরিমিতিবোধ ও জীবন দর্শনের আশ্চর্য দীপ্তি প্রদর্শন করেছেন।

'অগ্নি-গিরি' শুধু 'শিউলি-মালা' গল্প গ্রন্থেরই শ্রেষ্ঠ নয়, নজরুলের সমস্ত বিখ্যাত গল্পগুলোরও অন্যতম। বীররামপুর গ্রামের সবুর আখন্দ নামে একটি শান্তশিষ্ট ও সুবোধ বালককে পাড়ার রুস্তমের দল নিত্য অন্যায়ভাবে উত্ত্যক্ত করত। একদিন নূরজাহান নাম্নী একটি মেয়ের তিরস্কার সেই শান্ত ছেলেটি হয়ে উঠল দুরন্ত। নূরজাহানের প্রেমের সোনার কাঠিতে সবুরের নিদ্রিত পৌরুষ জেগে গেল ও তার অন্তরের স্তব্ধ পাহাড় হয়ে দাঁড়াল অগ্নিগিরি। নজরুল কৈশোরে যখন দরিরামপুর হাই স্কুলে পড়তেন তখন গ্রামের যে বখাটে ছেলেরা তাঁকে খুবই জ্বালাতন করত তাদেরই দৌরাত্মের ইঙ্গিত রয়েছে এই গল্পটিতে। অভিপ্রায় ও কার্যকারতার অনন্যতা আছে বলে গল্পটি যে একটি শিল্পসম্মত রূপ লাভ করেছে, এ কথা অনস্বীকার্য। কেননা অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য এবং কার্যকরতার অনন্যতার বিচারেই মুখ্যতঃ শিল্প হিসেবেই ছোট গল্পের মূল্যায়ণ করা উচিত।

সুশিল কুমার গুপ্তের ভাষায়, বাংলা নাট্যসাহিত্যে নজরুলের দান অকিঞ্চিৎকর। 'ঝিলিমিলি' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৭ (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ), এই তিনখানি নাটকের কোনোটিতেই নজরুলের নাট্য প্রতিভার কোনো উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর পড়েনি।

'ঝিলিমিলি' গ্রন্থটি 'ঝিলিমিলি', 'সেতুবন্ধ', 'শিল্পী' ও 'ভূতের ভয়' এ চারটি একাংক নাটিকার সমষ্টি। এদের মধ্যে একমাত্র 'ঝিলিমিলি', নাটিকাটিই সবচেয়ে বেশী নাট্যলক্ষণাক্রান্ত।

'ঝিলিমিলি' মোটামুটি একটি রূপক-সাংকেতিক নাটিকা। এই নাটিকাটি ১৩৩৪ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে কৃষ্ণনগরে লিখিত হয় এবং ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসের 'নওরোজে' আত্মপ্রকাশ করে।

'সেতুবন্ধু' রূপক সাংকেতিক নাটিকা। প্রকৃতির শক্তির সংগে মানুষের তৈরী যন্ত্রশক্তির সংঘাতে যন্ত্রশক্তির পরাভব দেখানোই এই নাটিকার উদ্দেশ্য।

'শিল্প' রূপক-সাংকেতিক নাটিকা হলেও কাহিনীর মধ্যে কোন কোন জায়গায় বাস্তবিকতা থাকায় স্থলবিশেষে এটি বাস্তব সাংকেতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'ভূতের ভয়' নাটিকায় কবি দেশের মুক্তির জন্যে বিপ্লবের উদ্বোধন চেয়েছেন।

'আলেয়া' বিশুদ্ধ গীতিনাট্য নয়, এটি গীতিপ্রধান নাটক। এটি বিদেশী অপেরার সঙ্গে তুলনীয়। ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসের (১৯২১) 'কল্লোলে'র সাহিত্য সংবাদে 'আলেয়া'র কথা উল্লেখিত হয়।

'মধুমালা' (রচনাকাল-অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ সাল (১৯৩৭ খ্রীঃ) তিন অঙ্ক-বিশিষ্ট গীতিনাট্য।

১৩৬৫ সালের (১৯৫৮) ৭ই বৈশাখ তারিখের ঈদ সংখ্যায় দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় 'ঈদ' শীর্ষক নজরুলের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়।

উপসংহারে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের (১৯৩০) প্রথম অনুচ্ছেদেই নজরুল সম্বন্ধে তাঁর মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, গ্রন্থ মধ্যে তাঁর সে- ধারনাই কেবল যুক্তিগ্রাহ্য ও প্রমাণসিদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন,

> নজরুল ইসলামের জীবন যেমন বিচিত্র, তাঁর প্রতিভাও তেমনি বহুমুখী। আধুনিক বাংলা কাব্য ও সংগীতের ইতিহাসে নজরুল নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ অধ্যায়ের যোজনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সবচেয়ে নির্ভীক ও বলিষ্ঠ কবিকণ্ঠ তাঁরই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বর্তমান শতাব্দীতে জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে নজরুল সর্বপ্রধান কবি। প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগে অতিআধুনিক বাংলা কাব্যকে রবীন্দ্রকাব্য থেকে স্বতন্ত্র একটি নিজস্ব গতিপথ খুঁজে নিয়ে সাহায্য করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নজরুল অন্যতম। বর্তমান যুগে নজরুলের মতো বহুমুখী প্রতিভা একমাত্র রবীন্দ্রানাথ ছাড়া আর কোন সাহিত্যিক ও সংগীতকর্মীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি।

- এ বক্তব্যে লেখক নজরুলের মধ্যে রাবিন্দ্রীক শক্তির বৈচিত্র্যই প্রত্যক্ষ করেছেন তবে রবীন্দ্রনাথের পরে।

সুশীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল-চরিত মানস' (১৩৬৭) গ্রন্থের কালানুক্রম রক্ষিত হলেও নজরুলের কবিতায় রচনা বা প্রকাশের কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় আলোচনায় পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। তা সত্ত্বেও সুশীলকুমার গুপ্তের বইটি নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনার প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এবং সে কারণে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। কলকাতার সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে তিনিই প্রথম নজরুল সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়ণের চেষ্টা করেন, সে দিক থেকে তিনি পথিকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহর নজরুল সাহিত্যের পর্যালোচনা

মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে দুখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া অপর এক গ্রন্থে রয়েছে নজরুল সম্বন্ধে একটি অধ্যায়।

১. নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা ১ম সং ১৯৬৩ সাল, ঢাকা।
২. নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ, ১৯৭৩ (১৯৮০ সাল), ঢাকা;
৩. নজরুল কাব্যে মুসলমি ঐতিহ্য/ বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ১ম সং ১৯৭৫ গ্রন্থের অন্তর্গত (১৩৭২), ঢাকা।

নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনায় তাঁর গ্রন্থটিকে কতকগুলো অধ্যায়ে বিভক্ত করে নিয়েছেন। অধ্যায়গুলো হচ্ছে, 'নজরুল কাব্যের সাংস্কৃতিক পটভূমি', 'নজরুল কাব্যে নবচেতনা', 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা', 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম সাধনা', 'নজরুল কাব্য; ঐতিহ্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম', 'নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ', 'চিত্রকল্পের ব্যবহার এবং নজরুল কাব্যে সমালোচনার হেরফের'।

নজরুল কাব্যের সাংস্কৃতিক পটভূমি পর্যালোচনায় লেখকের বক্তব্যে আমরা পাই, কোনো লেখক যে দেশ ও সমাজ সীমার বাসিন্দা তার স্বতন্ত্র ও নিজস্ব ভাবধারা এবং চেতনাকে তিনি রক্তের স্পন্দনে অনুভব করবেন, অন্যথায় কোনো মহৎ সৃষ্টি তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, লেখকের 'ব্যক্তিগত মনের' চেয়ে দেশাশ্রিত মন অনেক বড় কথা। এই দেশাশ্রিত মনকে লেখক কি ভাবে ফুটিয়ে তুলবেন, কোন রূপরীতির তিনি সাধক হবেন, তা নির্ভর করে লেখকের ব্যক্তি প্রতিভার ওপর। কিন্তু সমাজসত্তা ও সামাজিক ঐতিহ্যের সাথে তাকে একাত্ম বন্ধনে আবদ্ধ হতেই হবে। সেই সঙ্গে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির তিনি উত্তরাধিকারী সে সম্পর্কে ও তাকে সচেতন হতে হবে।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার মতে, সমাজ-সত্তার সাথে গভীর সম্পর্ক রেখে, দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অন্তরঙ্গ পরিচয়ে চিনে নিয়ে এবং সর্বোপরি নিজস্ব উত্তরাধিকারকে সম্পদ হিসেবে গ্রহন করে কাজী নজরুল ইসলাম কাব্যসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত মনের চেয়েও দেশাশ্রিত মন যে অনেক বড় কথা, এ সত্য বোধেও তিনি ছিলেন উজ্জীবিত। তাই তাঁর কবিতায় দেশ-মাটি-মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয়, তাদের আশা ও আকাঙ্খার বিচিত্র বর্ণনালী যেমন অকৃত্রিমভাবে ধরা দিয়েছে তেমনি রূপায়িত হয়েছে অন্তর্নিহিত আবেগ। নজরুল শুধু দেশ-মাটি-মানুষকেই অন্তরঙ্গ পরিচয়ে চিনে নেননি, সেই সঙ্গে ইতিহাস-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকেও চিনে নিয়েছেন। যে ভৌগোলিক পরিবেষ্টনী ও সমাজ-পরিধির বাসিন্দা তিনি, তার ঐহিত্য সম্পর্কে ও ছিল তাঁর স্পষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

ও পরিচ্ছন্ন ধারণা। এরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কবিতায়। রসবেত্তাদের মতে, স্বল্পশক্তিমান কবি ঐতিহ্যের অনুকরণ করেন, শক্তিমান কবি ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ ঘটান, এবং শক্তিহীন কবি ঐতিহ্যকে না মঞ্জুর করেন। নজরুল প্রতিভাধর যুগস্রষ্টা কবি। তাই তাঁর কবিতায় ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ এমন মহিমাময় ও ভাস্বর নজরুল কাব্যের বৈশিষ্ট্যের উৎস সন্ধান করতে হলে স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা কাব্যের সাংস্কৃতিক পটভূমিকার দিকে নজর দিতে হবে।

সংস্কৃতি মানুষের চিন্তাধারা; আচার-আচারণ ও বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিফলন। সংস্কৃতি শুধু ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাধারা, আচার-আচরণ ও বিশ্বাসেরই প্রতিফলন নয়, সংস্কৃতি দেশীয় এবং জাতীয় মনেরও অভিব্যক্তি।

নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ধর্মকেন্দ্র সংস্কৃতির উৎস।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যও ছিল নিছক ধর্মকেন্দ্রিক মুসলিম সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য যে মুক্তির পথ পেয়েছিল, ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষে আধুনিক কালে সেই মুক্তির পথটিই ভিন্নরূপে উন্মেচিত হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, বিবর্তন ও সমৃদ্ধি যে বিদেশী এবং বহিরাগত সংস্কৃতির বলশালিতার কল্যাণেই সম্ভব হয়েছিল তা ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গৃহীত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং মানবীয় কল্যাণ চিন্তাকে ধারণ করে নিতে সক্ষম হয়েছে তার মূলেও রয়েছে এই ঐতিহাসিক অবদানের ভূমিকা।

লেখকের মতে,

> মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল- এই তিনজনের কাব্যসাধনায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবোধের তিনটি ভিন্নধর্মী রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনের কাব্যধারায় হিন্দুসংস্কৃতির ঐতিহ্য ধরা পড়েছে। ফলে মধুসূদন সামগ্রিক কাব্যসাধনায় এদেশের একটি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠির জীবন ধারা ও মানস পরিচয় অনুদঘটিতই রয়ে গেছে।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার মতে, মধুসূদন অপেক্ষা রবীন্দ্র কাব্যসাধনা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিস্তৃত কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের রূপায়ণে উভয়ের চিন্তাধারা মানসপ্রবনতা একই খাতে প্রবাহিত। ইসলামী আদর্শ ও মানবিক চিন্তাধারার যেটুকু পরিচয় রবীন্দ্রনাথের রচনায় ধরা পড়েছে তা পরোক্ষ প্রভাবজাত, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার সূত্রে গৃহীত নয়।

কিন্তু নজরুলের কাব্যে সাংস্কৃতি ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের নবরূপায়নের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উদার ও সহনশীল বোঝাপড়া এবং মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল ইসলাম ধর্মীয় আদর্শ এবং মুসলিম সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু এ রূপায়ন কোনসূত্রেই দেশীয় সংস্কৃতির ব্যবহারের প্রতিবন্ধকরুপে বিবেচিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে সমগ্র বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য এবং বাঙালী জনগোষ্ঠীর ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারই নজরুলের কাব্যে নবরূপে ও রেখায় ধরা দিয়েছে। ভাষা, বিষয়, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, রূপক সর্বক্ষেত্রেই এই পরিচয় আপন

Dhaka University Institutional Repository

মহিমায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। এই উদার ও সহনশীল সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার কল্যাণেই নজরুল কাব্যে হিন্দু-মুসলিম উভয়-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সমভাবে স্থান করে নিয়েছে। আর এ কারণেই তিনি অবলীলায় হিন্দু-ইতিহাস, পুরা-কাহিনী ও ধর্মীয় বিষয়- সম্ভারকে মুসলিম ইতিহাস, পুরা-কাহিনী ও ধর্মীয় বিষয় সম্ভারের পাশাপাশি স্থান দিতে সক্ষম হয়েছেন। লেখক আরো বলেন, নজরুল কাব্যের নব মূল্যায়নের প্রশ্নে এই ঐতিহাসিক সত্যের উল্লেখ অপরিহার্যরূপে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নজরুলের কবিতায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতিগত আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে। কাব্য-বিচারে, এ সত্যকে যেমন ধর্তব্যের মধ্যে রাখা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তাঁর কাব্যের শক্তির উৎস আবিস্কার এবং উদার মানবিক প্রেরণার সূত্র-অনুসন্ধাণ। শুধু বিষয়বস্তু আহরণের ক্ষেত্রেই নয় ভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং চিত্রকল্পের ব্যবহারেও নজরুল সামাজিক ঐতিহ্যের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখেছেন, ফলে বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পরিচয়ই তাঁর কবিতায় ধরা দিয়েছে।

নজরুল কাব্যে নবচেতনা পর্যালোচনায় লেখক বলেছেন বাংলা কাব্যে যুগ-বিবর্তনে নানা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। রাষ্ট্র, ধর্ম, সামাজিক অবস্থা ও রুচিবোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যের গতিধারাও পরিবর্তিত হয়, কারণ এর উপরই সাহিত্যের অগ্রগতি নির্ভরশীল। তাই কোনো সাহিত্যধারাই চিরস্থায়ী হতে পারে না, পরিবর্তনের বাঁকে বাঁকে তাকে সমুদ্র সন্ধানী হতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাংলা সাহিত্য ধারায় ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে একটি সুস্পষ্ট রেখা-চিহ্ন লক্ষণীয় হয়ে উঠে এবং কাব্যে- অবয়বেও তার স্পষ্ট স্বাক্ষর বিধৃত হতে দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী-কাব্যধারায় দেব-দেবীর লীলা-বর্ণনা, অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ নিশ্চিতভাবেই কাব্য-অবয়বে একটি বিশেষ পরিচয়-চিহ্ন স্পষ্ট করে তুলেছিল; কিন্তু প্রাচীন ধারার অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের কাব্যে মানবীয় প্রেম-কাহিনী ও ঐতিহাসিক সত্যের স্পর্শ দীপ্ত হয়ে উঠেছে। এ জন্যই কেউ কেউ ভারতচন্দ্রকে 'সন্ধি-যুগের কবি' বলে থাকেন।

বিষয়বস্তু দিক থেকেই নয়, ছন্দ বিচারের মাপকাঠিতেও ভারতচন্দ্রের কাব্যে নতুনত্বের অনুসন্ধান করা চলে। উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং যমক অনুপ্রাসের নির্বাচনেও ভারতচন্দ্র ছিলেন নিঃসন্দেহেই বিশিষ্ট। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে কাহিনী-বর্ণনার যে বহুবিস্তারী প্রচেষ্টা আছে, ভাবানুভূতির ততটা গভীরতা নেই; এ ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র তাঁর সমকলিন কাব্যধারা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি।

ঈশ্বরগুপ্তে এসে বাংলা কাব্যে নতুন যুগের চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আঙ্গিক-বৈচিত্রের দিক থেকে না হলেও সমাজ সচেতন কবিসত্তার প্রকাশে ঈশ্বরগুপ্ত উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা। প্রবহমান ধারা থেকে নতুন পথ-নির্মাণ-প্রচেষ্টায় তাঁর কবিশক্তি নিয়োজিত নবযুগের রূপকার

Dhaka University Institutional Repository

মাইকেলে কাব্যপ্রেরণা হিসাবে যে দেশীয় বিষয়-বস্তুর অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায় তার মূলেও রয়েছেন ঈশ্বরগুপ্ত।

প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনে এসেই বাংলা কবিতা যথার্থ-অর্থে নতুনত্ব পরিগ্রহ করল। এ নতুনত্বের ধারা ও প্রকৃতি এমন স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হতে থাকল যে, আঙ্গিকের দিক থেকে বাংলা কাব্যের প্রাচীন ও প্রবহমান ধারার সাথে এর তেমন কোন আত্মীয়তাই অনুসন্ধান করা গেল না, যদিও বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তিনি ঐতিহ্যের অনুসারী হয়েছেন।

মধুসূদন থেকে আধুনিক কাব্যের সূচনা হলেও, বস্তুতঃ একালে 'আধুনিক কবিতা' বলতে রবীন্দ্রোত্তর কাব্য সাধনার ইতিহাসই বিবৃত হয়। তদুপরি রবীন্দ্র কাব্যে জীবনের নানা গতিপ্রবাহ থাকলেও অবক্ষয়ের চিত্র, কিংবা জীবন-যন্ত্রণার হাহাকার সেখানে-ধ্বনিত হয় উঠেনি। উত্তর-কাব্যে রবীন্দ্রনাথ আঙ্গিকের দিক থেকে যতটা আধুনকিতর হয়েছেন, প্রকৃত পক্ষে বক্তব্যের ক্ষেত্রে ততটা হননি।

সত্যেন্দ্রনাথ শব্দের রূপরীতির বিচারে রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন বটে, কিন্তু মানুষের দুঃখ-বেদনার রূপকার হিসাবে যে স্বাতন্ত্র্য খুব বেশী দৃষ্টিগ্রাহ্য ছিল না। যতীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে সচেতন বক্তব্য রয়েছে। মোহিতলালে আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যের প্রয়াস তো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, কিন্তু সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনার এবং সমসাময়িক জীবন-যাত্রার জটিলতার রূপকার হিসাবে কেউই নজরুলের মতো এত বেশী প্রাণবন্ত ও সোচ্চার নন। নজরুলের এই প্রাণবন্ততার মূল নিহিত রয়েছে তাঁর আন্তরিকতায়, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশনায় এবং অকৃত্রিম বেদনাবোধে।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার ভাষায়, নজরুল কবিভাবনা ও মানবতার আদর্শ-সংগঠনে গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করেননি। তাঁর আদর্শবোধে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতাই স্থান লাভ করেছে। মাইকেল নবমানবতার আদর্শ সংগঠনে তাঁর অধিগত বিদ্যার আলোককে কাজে লাগিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের আদর্শবোধে রয়েছে তাঁর চিন্তাধারা প্রসূত অভিজ্ঞান, কিন্তু নজরুল তাঁর কাব্যাদর্শকে এবং ব্যাপক-অর্থে মানবতাবোধকে কোনো কাব্যাদর্শের কিংবা অর্জিত চিন্তাসম্পদের রঙে অনুরঞ্জিত করেননি। বরং যেখানেই তিনি মানবতাবাদের পরিপোষক জীবনবাণী ও চিত্তসম্পদ লাভ করেছেন, তাকেই বিনা দ্বিধায় নিজের কাব্যের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। এ কারণেই ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্যে লালিত কবিমানস বিপরীতধর্মী ঐহিত্যের অনুপ্রেরণার উল্লেসিত হতেও দ্বিধাবোধ করেনি, কেননা তিনি সর্বত্রই মানবতার আদর্শ অন্বেষণ ও অনুসরণ করেছেন।

নজরুল কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য অধ্যায়ে মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার বক্তব্য হচ্ছে, ঐতিহাসিক সচেতনতার অভাব এবং জাতিগত সংকীর্ণতার কারণে যে-ক্ষেত্রে হিন্দু-কবিরা মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহারে অনীহা এবং মুসলিম সংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, সে-ক্ষেত্রে নজরুল

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম অবলীলায় উভয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমভাবে কাব্যে রূপায়িত করেছেন। পূর্বনির্ধারিত ধ্যান-ধারণার ফলে হিন্দু-কবিদের রচনায় মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহার কিছু মাত্রও স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়নি, বরং তাঁদের রচনাপাঠে এ-দেশে মুসলিম অস্তিত্বের বিস্মৃতিই স্বাভাবিক হয়ে উঠে। আধুনিক কালে অবশ্য কোন কোন কবি সাহিত্যিক মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষা ব্যবহারের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মোহিতলাল মজুমদারের কিছু কবিতায় এর পরিচয় আছে।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার মতে,

নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহার ও নবরূপায়ণকে মৌলিক সৃজনক্ষমতার স্পর্শে ভাস্বর করে রেখেছেন; অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এ-ব্যাপারে মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের ঐতিহ্যকেই তিনি অনুসরণ করেছেন, এমনকি স্বাতন্ত্রবোধের যে পরিচয় নজরুল-কাব্যে দেদীপ্যমান এবং স্বতন্ত্র মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহারের তাঁর যে কাব্যকৃতি তার প্রেরণার উৎসও মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের রচনার মধ্যেই নিহিত। ভাষা, বিষয়, উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং সার্বিক কাব্য উপাদান সংগ্রহে তিনি সেই বিশাল ভান্ডারেই হাত পেতেছেন, অবশ্য কাব্যের প্রকাশ-প্রকরন ও আঙ্গিকগত স্বাতন্ত্র্য, নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে তাঁর স্বাভাবিক সৃজনক্ষমতা এবং সর্বোপরি গ্রহন-শক্তিই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার ভাষায়, মুসলিম ঐতিহ্যকে কবিতায় রূপায়িত করতে গিয়েই যে শুধু নজরুল পুঁথি-সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন এমন নয়, জনচিত্তে আবেগ ও অনুপ্রেরণা এবং সর্বোপরি রস-সঞ্চার করতে হলে যে লোক-সাহিত্য তথা জনসম্বর্ধিত সাহিত্যের চিরায়ত সম্পদের সাথে ঐতিহ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক এ সত্যবোধেও তিনি উজ্জীবিত ছিলেন। তাছাড়া নিছক মুসলিম দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলেও লক্ষ্য করা যাবে যে, নজরুলের রচনায় এই 'নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে' নেবার সৃজনশীল প্রয়াসই সার্থকতায় মন্ডিত। নজরুলের সমসাময়িক যে সব মুসলিম কবি ইসলামী ঐতিহ্য মূলক বিষয়সম্ভার নিয়ে কাব্য রচনা করেও নজরুলের তুলনায় সার্থকতা লাভে সম্ভব হননি; তার কারণ প্রতিভা ও সৃজনক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ছাড়াও লোক-সাহিত্যের সাথে যুগোপযোগী সম্পর্ক স্থাপনের চেতনার অভাব এবং ব্যর্থতা। কেননা রচনার উপজীব্য বিষয় সংগ্রহে যাঁরাই পুঁথি-সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁদের রচনাতেই অপেক্ষাকৃত গভীরতর আবেগ ও সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেন থেকে ফররুখ আহমদ পর্যন্ত সকলের রচনাতেই আমরা এ সত্যটি অনুভব করি।

লেখকের ভাষায়,

> সমকালীন পটভূমিতে মুসলিম ভাবধারা ও চেতনাকে রূপ দিতে গিয়ে নজরুল ইসলাম পুঁথি-সাহিত্য ও লোক-সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন। লক্ষ্য করা যায় যে, নিছক ধর্মীয় বিষয়বস্তুর ব্যবহারেই নয়, মুসলিম ঐতিহাসিক বীরদের এমন কি সমকালীন নায়কদের গৌরব-গাঁথা রচনায়ও তিনি প্রাচীন সাহিত্য থেকে ভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি আহরণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার ভাষায়, নজরুলের লেখা মহানবীর 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' ইসলামী ও মুসলিম আদর্শভিত্তিক কবিতা। শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সাহিত্যেই অনন্য মর্যাদার দাবীদার বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তাছাড়া কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, মিশর নেতা জগলুল পাশা, রীফ-নেতা গাজী আব্দুল করিম, ইসলামের গৌরব যুগের খালেদ, তারিক, মুসা, খলিফা ওমর এঁদের নিয়ে নজরুল কবিতা রচনা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে নজরুলের কবিতায় বাংলা ভাষী মুসলমান মুসলিম ঐতিহ্যের একটি সমন্বিত রূপ খুঁজে পেয়েছিল। নজরুলের কবিতা সুদীর্ঘকালের সাধনার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত রূপায়নকে এক সঙ্গে ধারণ করেছে, ফলে এসব কবিতায় বাংলাভাষী মুসলিম পাঠক শুধু তার আত্মার প্রতিধ্বনি খুঁজে পায়নি, বস্তুতপক্ষে তার অস্তিত্বের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসকেই যেন আবিস্কার করেছে। ইতিপূর্বে বাংলা কাব্যে মুসলিম কবিদের রচনায়ও বিভিন্ন সূত্রে বুনিয়াদি মুসলিম অস্তিত্বের ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে উচ্চারণ বজ্রকণ্ঠ হয়ে উঠতে পারেনি, বস্তুতঃপক্ষে নজরুলের কণ্ঠেই যেন তাঁরা সমবেতভাবে কথা হয়ে উঠেছেন।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার মতে, নজরুল-কাব্যে আমরা মুসলিম ঐতিহ্যমন্ডিত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়াবলীর ব্যাপক ও বিস্তৃত ব্যবহার লক্ষ্য করেছি। আরবী-ফারসী শব্দাবলী নজরুলের কবিতায় কোনো বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করছে না, বরং ছন্দ-ঝঙ্কার ও দ্যোতনার মধ্যে দিয়ে একাত্ম হয়ে মিলেমিশে আছে। শব্দ ব্যবহার ও বিন্যাসের এই স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততার কল্যানেই যেসব কবিতায় নজরুল পংক্তি ও স্তবক বিশেষে একটিও বাংলা শব্দ ব্যবহার করেননি, সে সব কবিতাও বাংলা কবিতার চারিত্র্য- বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে।

নজরুল কাব্যঃ ঐতিহ্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম পর্যালোচনায় লেখক বলেছেন, আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নজরুলের সাধনার মধ্যে দিয়েই একটি জাতীয় রূপ অভিব্যক্ত হতে দেখা যায়। লক্ষনীয় যে, নজরুল দেশের মনকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন এবং দেশ অর্থে তিনি একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকেই ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি, সেই জনগোষ্ঠীর মনমানসের পরিচয়কেই বড় করে দেখেছেন। সহজাত প্রবণতার দরুন নজরুল দেশীয় ও জাতীয় ট্রাডিশান বা ঐতিহ্যের প্রাণশক্তির দিকে হাত বাড়িয়েছেন-- যে প্রাণশক্তি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক কর্মধারা থেকেই উৎসারিহ হয়েছে। এই উপলব্ধির ফলেই তিনি বাংলার হিন্দু মুসলিমের বহু শতাব্দীব্যাপী ইতিহাস, স্বাতন্ত্র্যধর্মী সাংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং সর্বোপরি জীবনধারা থেকে কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। মাইকেল কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো রামায়ণ কিংবা মহাভারতকেই এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎস হিসেবে নেননি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপকেই কাব্যে বানীময় করে তুলেছেন। নজরুলের সংস্কৃতিক চিন্তা ও কবি-ধর্মের এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার মতে, স্বদেশপ্রেমের রূপকার হিসেবে নজরুল নিজ সম্প্রদায়ের নবজাগরণের ক্ষেত্রে যে অনন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তা ঐতিহাসিক তৎপর্যমন্ডিত। সমগ্র দেশের জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হিসেবে তাঁর কাব্যে যেমন জাগরণ বানী উচ্চারিত হয়েছে তেমনি মুসলিম জনগোষ্ঠীর নব জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও তা সঞ্চারিত করেছে ঐতিহাসিক অনুপ্রেরণা। তাছাড়া স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশচেতনার ক্ষেত্রে নজরুল মুসলিম কবিদের মানস-প্রবণতার উত্তরধিকারকেই কাজে লাগিয়েছেন- নতুন ভাষা ও ছন্দে তাকে সজ্জীবিত করে তুলেছেন। লেখক আরো বলেন, নজরুল-কাব্যে স্বদেশ, স্বজাতি ও সম্প্রদায়ের মুক্তি ও কল্যাণকাঙ্খা দেশপ্রেমের অনাবিল ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে। যেহেতু নজরুল দেশপ্রেমের অর্থে দেশের জনগোষ্ঠীর সামাজিক আশা-আকাঙ্খার অভিব্যক্তিকেই বুঝেছেন, সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,

স্বদেশ বলিতে বুঝিছি কেবল
দেশের পাহাড় মাটি বায়ু জল
দেশের মানুষেব ঘৃণা করে চাই
করিতে দেশ স্বাধীন।
যত যেতে চাই তত পথে তাই
হই মা ধুলি বিলীন।

নজরুল এসেই সর্বপ্রথম স্বদেশ ও স্বজাতি- চেতনা একটি ব্যাপক পটভূমি খুঁজে পেল। নজরুল স্বধর্ম ও স্বজাতির উত্থান- কামনা করেছেন, মুসলমানকে অতীতের গৌরবোজ্জল স্বপ্নে উজ্জীবিত হতেও আহবান জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কবিতায় হিন্দু- সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও বিচিত্র রূপে এবং রেখায় ধরা দিয়েছে। আর এ কারণেই অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে নিরুত্তাপ সমাজ জীবনে তিনি যে নতুন অনুভূতির উত্তাপ সঞ্চারিত করেছিলেন তাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই সমভাবে অনুপ্রাণিত হল। নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হলে 'রণভেরী', 'বন্দী-বন্দনা', 'জাগরণী' ও 'বিদ্রোহীর বাণী'র মত কবিতা।

নজরুলের এই সংগ্রামী শপথ প্রবল স্বদেশ-চেতনা ও স্বদেশ প্রেম থেকেই উৎসারিত। আর এই স্বদেশ প্রেমের কল্যাণেই তিনি স্বজাতির আত্মার আত্মীয়, এবং স্বদেশের জাতীয় কবির অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত।

নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা অধ্যায়টি পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, কোনো রচনার আধুনিকতা নির্ণয়ের প্রশ্নে 'আধুনিক' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থের সাথে উল্লিখিত রচনার চরিত্রগত স্বাধর্ম্যের অনুসন্ধানই সম্ভবতঃ প্রকৃষ্ট উপায়। এ অনুসন্ধানের পেছনে আধুনিক চরিত্রের পটভূমি বিশ্লেষণও অত্যাবশ্যক। নজরুল কাব্যের আধুনিকতা নির্ণয়ে এ কারণেই সমগ্র আধুনিক বাংলা কাব্যান্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার ভাষায়, রবীন্দ্র কাব্যে একটি গভীর আধ্যাত্মবোধ ক্রম-পরিণতির মধ্যে দিয়ে জীবন-দর্শনে রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মবোধ সমন্বিত হয়েছে ধর্ম-বিশ্বাস, আধুনিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা এবং সামগ্রিক ঐতিহ্য-চেতনার মধ্যে। কিন্তু যুগধর্মের প্রভাবে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিগোষ্ঠি এই স্থির বিশ্বাসে প্রত্যয়ী হতে পারেন নি। এ-ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-কবিমানসের সাথে তাঁদের বিরোধ উত্তুঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। রবিন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিরা স্পষ্টঃই উপলব্ধি করলেন যে, রবীন্দ্র-আশ্রিত কাব্য-পরিমন্ডল থেকে মুক্ত না হতে পারলে জীবনের সামগ্রিক দিকের চিত্রাঙ্কন অসম্ভব। কারণ রবীন্দ্র-কাব্যস্রোতে অবগাহন করে জীবনের শুচি-শুভ্রতা সম্পর্কেই উপলব্ধি সম্ভব, জীবনের কলুষ-কালিমার রূপায়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

অন্যান্য আধুনিক কবির মতো সচেতন-রবীন্দ্র-বিরোধিতার অঙ্গীকার নিয়ে নজরুল ইসলাম কাব্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হননি, এ-কারণেই রবীন্দ্র-বিরোধিতার চেয়ে নিজস্ব কণ্ঠের মৌলিক সুরের ব্যঞ্জনাই যেন তাঁকে বাংলা কাব্যে এক স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট আসনের অধিকারী করেছে। বলা যেতে পারে প্রতিভার মৌলিকত্বই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র পথ পরিক্রমায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে যতীন্দ্রনাথের কবি কর্মে মৌলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রয়াস রেখায়িত হয়েছে এমন দাবী করা হয়ে থাকে, কিন্তু লেখক তা স্বীকার করেন না। কেননা রবীন্দ্রনাথের জীবন বাদী দৃষ্টিভঙ্গী যতীন্দ্রনাথের ছিল না, যতীন্দ্রনাথ জীবনকে দেখেছেন খন্ডিত দৃষ্টিতে 'রুদ্রের স্বরূপ, 'বাস্তব দুঃখবাদ, বিদ্রোহ, জীবনবোধ, অবিশ্বাস, জড়বাদ, ধর্মবিরোধীতা, সমাজ-সচেতনতা ইত্যাদি ছিল যতীন্দ্রনাথের কবিকর্মের প্রধানতম লক্ষণ।' যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী কবিরূপে পরিচিত, তাঁর কবিতায় দুঃখকে ও যন্ত্রণা-কাতরতা অমেয়রূপ লাভ করেছে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথে দুঃখবাদ সমাজমানসের উপলব্ধির প্রতীকরূপ নয়, সংসারে সর্বাঙ্গীন বিপর্যয় তাঁর কবিচিত্তে যে বেদনা ও কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে তাই তাঁর কবিচিত্তে তথা সমগ্রিক উপলব্ধিতে নৈরাশ্যের ছায়া বিস্তার করেছে এবং এ-নিরাশা থেকেই তাঁর মনে নাস্তিকতার উৎসমুখ সম্প্রসারিত হয়েছে।

মোহিতলাল ক্লাসিকধর্মী কবি। মোহিতলাল কবিকর্মে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেওয়া সত্বেও তাঁর কবিতার ক্লাসিক্যাল গঠন তাঁকে জনপ্রিয় করেনি, অধিকন্ত লক্ষণীয় যে, মোহিতলালের কবিতা ক্লাসিকধর্মী বটে, কিন্তু তাঁর রচনার এমন কোন ক্লাসিকসুলভ মহত্তম ভাবনার প্রকাশ নেই যা সমগ্র মানবসত্তাকে আলোড়িত করতে পারে।

প্রকৃতির দিক থেকে মোহিতলালের কবিতা সুঠাম-গঠন ও ধ্বনি প্রধান, যতীন্দ্রনাথের কবিতা বেদনা-করুন অথচ অনাড়ম্বর গঠন। কিন্তু নজরুলের কবিতায় ঘটেছে উভয়ের আশ্চর্য সমন্বয়-রূপের দিক থেকে নজরুলের কবিতা ক্লাসিকধর্মী নয়, বরং বল যেতে পারে শিথিল বন্ধন, মোহিতলালের ভাস্কর্যসুলভ গাঁথুনি তাঁর কবিতায় সৌন্দর্যরূপ লাভ করেনি, আবার যতীন্দ্রনাথের মন্থরগতিও তাঁর কবিতায় ছাড়পত্র পায়নি, উভয়ের সমন্বয়ে এমন এক বাণী বিন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে যাতে সচেতন রূপকর্মের চেয়ে প্রাণ-প্রবাহের গতিবেগই সঞ্চারিত হয়েছে সর্বক্ষেত্রে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের মতো

Dhaka University Institutional Repository

কোনো সচেতন ও সজ্ঞান প্রচেষ্টায় তিনি বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করেননি। উল্লেখযোগ্য যে, কাব্যের আঙ্গিক ও গঠনরীতির দিক থেকে নজরুল-প্রবর্তিত নতুনত্বে কারুকর্মের লক্ষণ প্রকট নয়।

মোহিতলালের রচনার রবীন্দ্রনাথকে আত্মসাৎ করে নতুন-সৃষ্টি প্রেরণার গতিবেগ সঞ্চারের চেষ্টা আছে, এ কারণে তাঁর কাব্য সৃষ্টির পেছনে যতটা আয়াসের লক্ষণ বিধৃত, ততটা মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতার স্বাক্ষর নেই। কিন্তু নজরুলের কবিতা মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতার। নজরুলের মানসিকতায় মুক্তিকামী চেতনার তীক্ষ্ণতা গভীর প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল, বরং এ কারণেই যুগ-সমস্যার উচ্চকণ্ঠ কবিরূপে তিনি স্বদেশের প্রাণসত্তায় ব্যাপক আলোড়ন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া, নজরুল-কাব্যে যুগাভিসারী জীবনবোধের যে তীব্রতা আছে এবং প্রাণধর্মের সজীবতায় তিনি যে নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন বাংলা কাব্যে তাঁর উৎস সন্ধ্যান প্রায় অসম্ভব।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার মতে, নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' কবিতায় তাঁর ব্যক্তিসত্তার যে জয় ঘোষনা করেছেন তার সাথে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' কবিতার ভঙ্গীগত সাদৃশ্য রয়েছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' অবশ্য বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ নেই, আছে আত্মোপলব্ধির বন্ধনহারা উল্লাস। কিন্তু নজরুল ইসলাম নিগৃহীত সমাজ ও যুগামানসের, প্রতিভূরূপে 'বিদ্রোহী' সত্তার উদ্বোধন ও জয় ঘোষণা করেছেন। তাঁর সে বিদ্রোহের লক্ষ্য সামাজিক অসাম্যরে ও অত্যাচার অবসান। এ-কারণেই 'বিদ্রোহী'তে চিন্তাধারা ও প্রকাশ-রীতি অসংযম থাকা সত্বেও নজরুলের ভাষা হয়েছে বলিষ্ঠ, ধ্বনি-গম্ভীর ও বেগবান। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' কবিসত্তার যে জাগরণ তার সাথে 'বিদ্রোহী'র বিপ্লবী চেতনার সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নজরুল প্রতীক-অর্থে সামাজিক জাগরণ ও সমাজসত্তার বিপ্লবী চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 'ভাঙ্গার গানে' তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছ,

লাথি মার ভাঙরে তালা
যত সব বন্দীশালা
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা
ফেল উপাড়ি,

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাঙার গান গেয়েছেন তাঁর কবি সত্তার কণ্ঠরোধী পরিস্থিতির বিরুদ্ধে;

ওরে চারিদিকে মোর
একী কারগার ঘোর
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখী
এসেছে রবির কর।
। নির্ঝরের স্বপ্নভাঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রেমের অভিষেক' কবিতার সাথে নজরুলের 'দারিদ্র্য' কবিতার প্রকাশভঙ্গির সাদৃশ্য অনুসন্ধান করা যেতে পারে। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনোপলব্ধির পার্থক্যটুকুও দৃষ্টি এড়াবার মতো নয়।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার ভাষায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতা রচনা করেছেন চোখে দেখে, পুরোপুরি অন্তর-অভিজ্ঞতায় নয়, রূপতৃষ্ণাই সেখানে মুখ্য, কিন্তু নজরুলের কবিতা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্পর্শে সজীব। রবীন্দ্র-কার্ব্যাদর্শের বিরুদ্ধে তাঁর এ বিদ্রোহ প্রতিভার মৌলিকত্বের স্বাভাবিকতাই ঘোষিত হয়েছিল, অন্যান্য সমসাময়িক কবিদের মতো এর পেছনে তেমন কোন সর্তক প্রস্তুতি ছিল না। প্রতিভার এ-বৈশিষ্ট্যই নজরুলকে অন্যান্য আধুনিক কবি থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের বাচনভঙ্গী তাঁর পরবর্তী নজরুলে, এমন কি জীবনানন্দ দাশেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। জীবনানন্দ দাশে নজরুলের প্রভাব বর্তেছে দেশাত্মবোধ, স্বাদেশিক অনুপ্রেরণা ও সম-সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। নবজাগ্রত চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবিমনে নজরুল স্বাভাবিকভাবেই প্রেরণার জোয়ার এনেছেন। রূপতৃষ্ণায় জীবনানন্দ সত্যেন দত্তে ঝুঁকলেও, এই প্রবণতা তাঁর চিত্তে অধিককাল স্থায়ী হয়নি, যেমন স্থায়ী হয়নি নজরুলের উদ্দামতার প্রতি তাঁর প্রাথমিক আর্কষণ। তবে জীবনানন্দের 'ঝরা পালক', 'দেশবন্ধু', 'হিন্দু-মুসলমান', 'বিবেকানন্দ', 'পতিতা' প্রভৃতি কবিতায় আমরা নজরুলের ধ্বনিই শুনতে পাই।

জীবনানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং কিছু পরিমাণে জীবনানন্দীয় কাব্যধারাকে আত্মস্থ করে স্বতন্ত্র কবিসত্তার উদ্বোধন ঘটিয়েছেন আরেকজন কবি-তিনি ফররুখ আহমদ। রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের প্রভাবাধীন, বিষয় ও ভাষার ঐতিহ্যে নজরুলের এবং বাকভঙ্গী মধুসূদনের।

রবীন্দ্র-প্রভাবিত হওয়া সত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁকে স্বকীয় কবি চরিত্রের অধিকারী করেছে তার মধ্যে সমাজ-সচেতনতা অন্যতম। আঙ্গিকের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের লক্ষনীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে যুগচেতনা। উচ্চকণ্ঠপ্রবণতার দিকে থেকে নজরুলের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য বা সমধর্মিতা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয়, কিন্তু কবিতার আঙ্গিক প্রকরণ ও প্রকাশ- পদ্ধতির ক্ষেত্রে দু'জনের পার্থক্যটিও উপেক্ষা করা যায় না।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা পাঠকের চেতনাকে জাগ্রত করে আবেগের স্পর্শে, কন্তু বিষ্ণুদে কিংবা আমিয় চক্রবর্তীর আবেগশুধু মন্থরই নয় অসংলগ্নও বটে। এক ধরনের অসংলগ্নতার মধ্যে দিয়ে বিষ্ণুদে এবং বিশেষভাবে আমিয় চক্রবর্তী তাঁর কবিধর্মের আধুনিক চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই প্রচেষ্টায় আধুনিক ইংরেজ ফরাসী কবিদের প্রভাব তাঁর ওপর বিশেষ ভাবে বর্তেছে।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার ভাষায়, রোমান্টিক চরিত্রই সমর সেনের কবিতার প্রধানতম লক্ষণ জীবনানন্দ দাশের কোনো কোন কবিতায় যে সনাতন রোমন্টিকতার স্পর্শ পাওয়া যায় সমর সেনে এসে তা নগর কেন্দ্রিক রূপ নিয়েছে ভিন্নতার আঙ্গিককে আশ্রয় করে। কল্লোল গোষ্ঠির কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-কাব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান তুলে ধরলেও রোমান্টিক

Dhaka University Institutional Repository

চেতনা পরিহার করতে পারেননি; রবীন্দ্র-কাব্যের আধ্যাত্মিক শুচি-শুভ্রতাকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি রোমান্টিক চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন মানবীয় ভোগবাদ ও জীবনতৃষ্ণায়। তাঁর কবিতা পরিণতির পথে এগিয়ে গেছে সম্ভবতঃ আঙ্গিকের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে, জীবনোপলব্ধি কিংবা জীবনদৃষ্টিতে তিনি পূর্বাপর প্রায় একই বৃত্তে অবস্থান করেছেন।

রবীন্দ্র প্রেম-কাব্যের অতীন্দ্রিয় ও অশরীরী রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বুদ্ধদেব বসু শরীরনিষ্ঠ প্রেমকাব্য রচনায় আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহ্যিক প্রেরণা ছিল প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য, গোবিন্দ দাস, মোহিতলাল ও নজরুলের প্রেম বিষয়ক কবিতা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ে নজরুল-কাব্যের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। আঙ্গিকের দিক থেকে না হলেও সমাজ-চেতনা-কেন্দ্রিক অন্তর্প্রেরণায় উভয়ের সমধর্মিতা লক্ষনীয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ে রাজনৈতিক দর্শনজাত কবিতা বুদ্ধিবৃত্তির চমৎকারিত্বকে আশ্রয় করেছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে এ-ধারাই সুকান্ত ভট্টাচার্যের হাতে বলিষ্ঠ ও বেগবান হয়েছে। সুকান্ত ভট্টাচার্যে ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্যরীতির অনেকটা সার্থক সমন্বয়। নজরুলের আবেগ এবং রবীন্দ্রনাথের মননধর্মিতা সুকান্ত ভট্রাচার্যের কবিতায় হৃদয় সংবেদ্য রুপ লাভ করেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে নজরুল কাব্যের আঁবেগ ও সুদৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী ছিলেন বলে এবং রবীন্দ্র-কাব্যের মাধুর্য ও ভাষা লালিত্যকে কাব্যের সৌকর্ষ করে নিতে পারায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা পাঠকের মর্মমূলে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

তিরিশের প্রধান কবিরা নজরুল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পথ ছেড়ে স্বতন্ত্র পথে এগিয়ে গেলেন; কিন্তু মার্কসবাদী রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী তরুণ কবিমনে অবশ্য এরা উভয়েই প্রেরণার উৎস হয়ে রইলেন। দিনেশ দাশ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা সমাজ সচেতনতার নামে বিষয়-নির্ভরতাকেই প্রাধান্য দিলেন, ফলে তাঁদের রচনায় উচ্চকণ্ঠ প্রবণতা বহুবিস্তরী হয়ে রইলো।

বিমলচন্দ্র ঘোষ দীর্ঘ সাধনায়ও তাঁর নিজস্ব কোনো কবি চারিত্র্য গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে তাঁকে কখনো সুভাষ-সুকান্ত আবার কখনো বা অতি আধুনিক রোমান্টিক কবিদের ছায়ায় কাব্য রচনায় ব্যাপৃত দেখা যায়। নজরুলের-কাব্যের বহিরঙ্গ-তাঁর রচনায় অনুসৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাঁর অন্তর্জ্বালা ও তীব্রতাসঞ্চারী বেদনাবোধ রূপ লাভ করেনি। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ে নজরুলের চেয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাকভঙ্গির প্রভাবই বরং বেশী।

তবে উপরোক্ত কবিদের গণ-জাগরণমূলক মার্কসবাদী কবিতা রচনায় নজরুলের পরোক্ষ অবদান অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার মতে, নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা-কাব্যে মুসলিম-সাধনায় লেখকের বক্তব্য হলো, আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম সাধনার ধারায় সবচেয়ে বড় প্রেরণা কাজী নজরুল ইসলামের। প্রাণবন্যার বিস্তৃতি ও উচ্ছলতায় ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্যে নজরুল কাব্যের স্বাতন্ত্র্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব অসংশয়িত। শুধু মুসলিম কাব্যসাধনার ধারায়ই নয়, সমগ্র বাংলা কাব্যের মহিমান্বিত অগ্রগতিতেও নজরুলের অবদান বিশেষরূপে চিহ্নিত। নজরুল কাব্যের প্রভাব ও প্রেরণা তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী মুসলিম কবিদের কাব্যসাধনার ধারায় প্রলম্বিত। নজরুল কাব্যরীতির এই সুদূরপ্রসারী প্রভাব দ্বিবিধ; (১) আঙ্গিকগত (২) বিষয়বস্তু ও ভাবগত (৩) ভাষা। আধুনিক বাংলা কবিতার ভাব ও আঙ্গিকগত পরিবর্তন যদিও ইতিমধ্যে প্রাগ্রসরতায় উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে এবং একদা সর্বগ্রাসী কবি প্রতিভা নজরুলের প্রভাবকে অতিক্রম করে বিচিত্রতর খাতে বইতে শুরু করেছে, তবুও মুসলিম কাব্য-সাধনার অগ্রগতিতে নজরুল-কাব্যধারার প্রভাব নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, কবিতার ক্ষেত্রে সত্যিকারের প্রভাবটা অনেকটা অনুভূতির স্তরে অবচেতনার গভীরে কাজ করে। এবং সে দিক থেকে দেখতে গেলে, যাঁরা নজরুলী ঢঙে কবিতা লেখেননি তাদের মধ্যেও এ-প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে।

এ-কথা নির্দ্বিধায়ই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে মুসলিম বাংলার স্বতন্ত্র কাব্যসাধনার দিগন্তে নবোদিত সূর্যের মহিমা বিদুরিত হয়েছে। নজরুল পূর্ববর্তী মুসলিম কবিদের রচনায় নিজেদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ এবং সাহিত্যকর্মে তার রূপায়ন লক্ষ্য করা গেলেও তা মাইকল ও রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভার আলোকে ছিল সমাচ্ছন্ন। কিন্তু নজরুলে এসেই আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিমায় তিনি ঐতিহ্যের রূপায়ণ ঘটালেন। নজরুল-কাব্যে ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্য বলিষ্ট ব্যঞ্জনায় মুর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর এই কাব্যধারার দুর্মর গতিবেগ বাংলার মুসলিম- মানসে এনেছে নতুন আলোড়ন। মীর মোশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ প্রমুখ কবিরা নজরুলের আবির্ভাবের আগেই স্বাজাত্যবোধের ধ্বনী উচ্চারণ করেছিলেন; কিন্তু সে বাণী বজ্রকণ্ঠ ছিল না, ছিল অর্ধোচ্চারিত। নজরুলের শক্তিমন্ত্র আহবান তাদের চিত্তে জাগরনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিল।

বাংলার মুসলিম সাহিত্য ধারার বিকাশে নজরুলের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দের সার্থক ব্যবহার ও ইসলামী আদর্শ এবং মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়নে নজরুলের অবদান অবিস্মরণীয়। আরবী ফারসী শব্দের সাথে সংস্কৃতানুগ শব্দের সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যে বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন।

নজরুলের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কালে আমরা যে কয়জন বিধি মুসলিম কবির সাক্ষাৎ পাই তাঁদের মধ্যে শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দীন, বন্দেআলী মিয়া, বেগম সুফিয়া কামাল, আব্দুল কাদির, সুফী মোতাহার হোসেন, মহীউদ্দীন, বেনজীর আহমদ, মঈনুদ্দীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম কবিদের মধ্যে ক্লাসিকধারার বিশিষ্ট লক্ষণ শাহাদাৎ হোসেন ও আব্দুল কাদিরের রচনাতেই উজ্জ্বল।

নজরুলের পূর্বসূরী হওয়া সত্ত্বেও গোলাম মোস্তফার কবিতায় নজরুলের উচ্চকণ্ঠ- প্রবণতা এবং সাময়িক বিষয় নির্ভর কাব্য রচনার প্রেরণা লক্ষনীয়।

বিষয়ানুসারে আরবী-ফারসী শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে কবিতা যে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদের কবিতায় তার প্রচুর নির্দশন রয়েছে। এঁরা আরবী ফারসী শব্দকে কবিতার আবহে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন।

নজরুল ইসলামের উত্তরসাধকদের মধ্যে মহীউদ্দীন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী গণকাব্য রচনায় তিনি মনোভঙ্গী ও চিন্তাধারার দিক থেকে নজরুলেরই অনুসারী।

বেনজীর আহমদও কাব্য ক্ষেত্রে প্রধানতঃ নজরুল ইসলামকেই অনুসরণ করেছেন। আবেগ, অনুভূতি প্রকাশের তীব্রতায় বেনজীর আহমদে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনা এবং বাধ-ভাঙ্গা ও কূলপ্লাবী আকাঙ্খাই ধ্বনিত।

কাজী কাদের নওয়াজ সত্যেনদত্তীয় পরিমন্ডলের কবি। তবে ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্যমূলক কবিতায় তিনি নজরুল ইসলামকে অনুসরণ করেছেন। ফারসী কবিতারও প্রভাবও তাঁর ওপর বর্তেছে।

বেগম সুফিয়া কামাল রবীন্দ্র-ভাবপরিমন্ডলের কবি। ক্ষেত্র-বিশেষে নজরুল-কাব্যধারা তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছেন সত্য, কিন্তু এ সত্ত্বেও রবীন্দ্র প্রভাবই তাঁর কাব্যে ব্যাপকতর।

বন্দে আলী মিয়ার রচনায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম এবং লোক-সাহিত্য ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার মতে, নজরুল পরবর্তী মুসলিম কবিদের রচনায় দুটি উল্লেখযোগ্য চেতনা লক্ষ্য করার মতো। একটি হচ্ছে রবীন্দ্রকাব্য- পরিমন্ডল থেকে বেরিয়ে আসবার সচেতন প্রয়াস, অন্যটি নজরুল-কাব্য প্রকরণ অতিক্রমের বাসনা। নজরুলের সমসাময়িক মুসলিম কবিদের রচনায় অবশ্য এ চেতনার কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রকাশ নেই। ঐতিহ্যবোধ, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে এঁরা নজরুলকে অনুসরণ করেছেন। নজরুল পরবর্তী আধুনিক মুসলিম কবিরা কাব্যের প্রেরণা ওরচনার প্রকরণের ক্ষেত্রে নজরুলকে এড়িয়ে যাবার কিংবা তাঁকে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু ঐতিহ্যমূলক কিংবা বিষয়বস্তু ভিত্তিক কবিতায় তাঁরা নজরুলের প্রভাবাধীনরয়ে গেছেন। মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামের ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক কাব্যরচনায় ঐতিহ্যবাদী কবিরা এখনও নজরুলী ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, নজরুলী কাব্যধারা ফররুখ আহমদের হাতে

Dhaka University Institutional Repository

অনেকখানি স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে এই বৈশিষ্ট্য মন্ডিত কাব্যধারার প্রভাবও তরুণতম কবিদের রচনায় লক্ষণীয়।

নজরুল-কাব্যের শিল্পরূপ ঃ চিত্রকল্পের ব্যবহার চিত্রকল্প সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব মতামত হচ্ছে, কাব্যে চিত্রকল্প বা রূপকল্প সৃষ্টি কবির সৃজনী- প্রতিভার পরিচায়ক বলে বিবেচিত। এই নিরিখে নজরুল- কাব্যপাঠে- মনোনিবেশ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, চিত্রকল্প সৃষ্টিতে নজরুলের দক্ষতা অপরিসীম।

নজরুলের কিশোরকালের বহু কবিতায় ভাব, উপমা-উৎপেক্ষা এবং চিত্রকল্পের আকর্ষনীয় ব্যবহার লক্ষ্য কব্য যায়। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় রচিত কবিতায় নজরুল শব্দ-চিত্ররূপ অঙ্কনে মুনসীয়ানা দেখিয়েছেন,

লাবণ্য শুকাল আজ সকলি ফুরাল,-
মঞ্জু- কুঞ্জবনে কলি ঝরিয়া পড়িল
আড়ালে লুকাল চাঁদ, ধৈরয ভাঙিল বাঁধ
থামিল সাগর জল, উড়ে গেল পরিমল,
ক্ষণপ্রভা হেসে ঐ কোথায় লুকাল!
সাধনা মিটিল হায়। আশা না পুরিল।
(করুণ গাথা, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড)

উপরোদ্ধৃত কবিতা চিত্রকল্পের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লার ভাষায়, নজরুল নিজের অনুভূতি, আবেগ ও বক্তব্যের বাণীরূপ দিতে গিয়ে প্রয়োজনবোধে শব্দচিত্র একেঁছেন, উৎপ্রেক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সৃষ্টি করেছেন বর্ণ-সমুজ্জ্বল রূপকল্প। নজরুলের চড়া-সুরের কবিতা পাঠের সময় বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে পাঠকের চেতনা সজাগ হয়ে ওঠে ফলে এ সবের শিল্পরূপ প্রায়শই সৃষ্টি এড়িয়ে যায়। নইলে তাঁর বহু রাজনৈতিক- সামাজিক কবিতায় ও আশ্চর্য শিল্পরূপের পরিচয় পাঠকের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করতো। অনস্বীকার্য যে, বেদনা মিশ্রিত কারুণ্যের কবিতাতেই নজরুল শব্দচিত্র ও রূপকল্প সৃষ্টিতে অধিকতর পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। প্রকৃতির রূপ-সুষমা অংকনে তাঁর পারদর্শিতা অতুলনীয়। দুর্যোগময়ী রাত্রির পটভূমিকায় সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে অবলম্বন করে নিয়ে ছন্দোধ্বনি সৃষ্টি ও মিলের ধ্বনিময় সংশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নজরুল অপূর্ব ও অবিস্মরণীয় রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায়।

উপমা, ও উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টি ও চিত্রকল্প রচনার স্বতন্ত্র এবং অধিকতর আকর্ষণীয় ধারা লক্ষ্য করা যায় নজরুলের ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায়। চিত্রকল্প রচনায় অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে নজরুলের 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যের অন্তর্গত 'চাদনি রাত্রে' শীর্ষক কবিতায়।

Dhaka University Institutional Repository

নিসর্গ- বন্দনা নয় বরং প্রকৃতি-বর্ণনার প্রয়োজনেই নজরুল চিত্রকল্প রচনা করেছেন এবং তাতে সঞ্চারিত করেছেন গতিশীলতা। ব্যক্তি হৃদয়ের ভাবানুভূতি এবং হাহাকারের সাথে এর সংযোগ ঘটার দরুণ তা হয়ে উঠেছে গভীরতর অর্থবহ। নজরুলের চিত্রকল্প প্রায়শই স্থিরচিত্র নয়, বক্তব্যের অন্তর্নিহিত আবেগ, প্রগাঢ় অনুভূতির তীক্ষ্ণতা এবং দৃষ্টির বর্ণাঢ্যতা তাঁর গান- কবিতা দিয়েছে প্রাণসত্তা।

সংগ্রামী- মানুষকে আবাহন করে যে সব কবিতা রচিত হয়েছে তাতেও নজরুল সৃষ্টি করেছেন আকর্ষনীয় রূপচিত্র।

উদাহরণ, ব্যথার সাঁতার পানি - ঘেরা
চোরাবালির চর,
ওরে, পাগল, কে বেঁধেছিস
সেই চরে তোর ঘর?
শূণ্যে তড়িৎ দেয় ইশারা,
হাট তুলে দে সর্বহারা,
মেঘ জননীর অশ্রুধারা
ঝরছে মাথার'পর,
দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি
দুলিয়ে তরু কর।
(সর্বহারা)

এক সৃষ্টিধর্মী ও কল্পনা- প্রতিভাসমৃদ্ধ মনের প্রেরণায় নজরুল তাঁর কবিতায় এমনি ধরনের আকর্ষনীয় চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

নজরুলের সার্বিক মূল্যায়ণে মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ,

> নজরুল কবি ভাবনা ও মানবতার আদর্শ-সংগঠনে গতানুগতিক প্রন্থা অনুসরণ করেননি- তাঁর আদর্শবোধে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতাই স্থান লাভ করেছে। মাইকেল নবমানবতার আদর্শ সংগঠনে তাঁর অধিগত বিদ্যার আলোককে কাজে লাগিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের আদর্শবোধে রয়েছে তাঁর চিন্তাধারা প্রসূত অভিজ্ঞান, কিন্তু নজরুল তাঁর কাব্যাদর্শকে এবং ব্যাপকঅর্থে মানবতাবোধকে কোনো কাব্যাদর্শের কিংবা অর্জিত চিন্তা সম্পদের রঙে অনুরঞ্জিত করেননি। বরং যেখানেই তিনি মানবতাবাদের পরিপোষক জীবনবাণী ও চিত্তসম্পদ লাভ করেছেন, তাকেই বিনা দ্বিধায় নিজের কাব্যের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। এ কারণেই ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্যে লালিত কবিমানস বিপরীতধর্মী ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় উল্লেসিত হতেও দ্বিধাবোধ করেনি, কেননা তিনি সর্বত্রই মানব আদর্শ অন্বেষণ ও অনুসরণ করেছেন।

লেখকের সার্বিক মূল্যায়ণে মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থটিতে নজরুল সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। তাঁর মধ্যে 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক প্রবন্ধটি তুলনামূলক আলোচনা বিধায় বৈশিষ্টপূর্ণ। এ ছাড়া নজরুল কাব্যের শিল্প রূপ অধ্যায়ে 'নজরুল কবিতার শিল্পরূপ', 'নজরুল কাব্যে উপমা', 'নজরুল কাব্যে চিত্রকল্প' ও ''নজরুল কাব্যের ভাষা ও ছন্দ'' আলোচনায় লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন হিন্দু ও মুসলমান কবিদের ওপর নজরুলের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর আলোচনাটি মূল্যবান।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

আতাউর রহমানের নজরুল সাহিত্যের পর্যালোচনা

আতাউর রহমান রচিত 'কবি নজরুল' (১৯৬৮) তিনি নজরুল কাব্যের বিভিন্ন দিক প্রবন্ধের আকারে আলোচনা করেছেন, আবার নজরুল কাব্যে ভাবপ্রবাহ ১ম ও ২য় তরঙ্গ নামে বিভিন্ন কবিতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নজরুলের মন-মননের রূপ প্রকটনেও প্রয়াসী হয়েছেন। আলোচিত বিষয়গুলোর তালিকা, 'নজরুল- জীবনী-পঞ্জী', 'নজরুল- রচনাবলী', 'বাংলা সাহিত্যে নজরুলের ভূমিকা', 'নজরুলের কাব্যে প্রেরণার উৎস', 'নজরুল ইসলাম ও বাংলা কবিতায় ঋতুবদল', 'নজরুলঃ একজন নৈরাজ্যবাদী' 'নজরুল সাহিত্যে প্রেম ও রোমন্টিকতা', 'নজরুলের দৃষ্টিতে প্রেম ও নারী' 'নজরুল কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতি', 'নজরুলের আধ্যাত্মিকতা', 'সাম্যবাদী নজরুল', 'নজরুল কাব্যের শাশ্বত ও সাময়িক মূল্য', 'নজরুল কাব্যের ভাবপ্রবাহ- ১ম তরঙ্গঃ অগ্নিবীণা- বিষেরবাঁশী- দোলনচাঁপা- ছায়ানট- চিন্তানামা- ভাঙারগান- পূর্বের হাওয়া। ২য় তরঙ্গঃ সর্বহারা- ফনিমনসা সিন্ধুহিল্লোল।'

আতাউর রহমানের কথায়, মাইকেল ও নজরুলের কাল ও পরিবেশের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাছাড়া শিল্প সৃষ্টির প্রেরণায় নজরুল মাইকেল থেকে পৃথক। মাইকেলের কাব্য সৃষ্টির মূলে ছিল শিল্পীর কৌতুহল। কিন্তু নজরুলের সাহিত্য-সাধনার মূলে প্রেরণা দান করেছে সমাজ বিপ্লবের এষণা। মাইকেলের অভিযোগ নিয়তির নির্মমতার বিরুদ্ধে, নজরুলের বিদ্রোহ মানুষের গড়া অন্যায় সমাজ-বিধানের বিরুদ্ধে। ক্লাসিকতা মাইকেলের অবিচ্ছেদ্য সংগী, পক্ষান্তরে নজরুল চরম গীতিপ্রবণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেল স্বচ্ছন্দগতি,-নজরুল সে ছন্দের দিকে প্রায় উদাসীন। মাইকেলের তেজ গতি ও বীরত্বব্যঞ্জক মনোভঙ্গি নজরুলে লক্ষ্যযোগ্য। মাইকেলের ধর্মনিরপেক্ষ উদারতা নজরুলের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। উভয়ের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের সাদৃশ্য বিস্ময়কর সন্দেহ নেই।

আতাউর রহমানের ভাষায়, রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছেন প্রার্থনার ভাষা, নজরুল দিয়েছেন প্রতিবাদের ভাষা। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা, অসীমের প্রতি আগ্রহ, নিঃসঙ্গতার বেদনা নজরুল নাকচ করেননি।

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে নজরুল মানুষকে জাতির উর্ধে স্থান দিয়েছেন। জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নজরুল একান্ত করে নির্যাতিত শ্রেণীর মুক্তির কথা ভেবেছেন। নজরুলের পূর্বসূরীরা বলেছেন জাগো দেশ, জাগো জাতি নজরুল বললেন,জাগো নিপীড়িত, জাগো কৃষক- জাগো শ্রমিক- জাগো নারী। এইখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট এবং এখানেই তিনি যুগোত্তর। শুধু দেশের স্বাধীনতার অস্পষ্ট কল্পনা নয়, শোষিত শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর মুক্তির অভিধা তাঁর কাব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। উৎপীড়িত অবহেলিত মানুষের বিদ্রোহী মনের জ্বালা নজরুল কাব্যে দেদীপ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিপ্লবাত্মক সমাজচেতনা বাংলা সাহিত্যে নজরুলের সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান। স্বদেশীয় যুগের 'দেশ কল্যাণ' আর নজরুলের বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। স্বদেশী নেতারা নির্বিত্ত নিঃস্ব জনসাধারণের উপকার করার প্রয়াসী, নজরুল তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামী।

নজরুলের কাব্য প্রেরণার উৎসঃ আতাউর রহমানের মতে, বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের মর্যাদা অনন্যসাধারণ। কেবলমাত্র কাব্য প্রতিভার দ্বারা তাঁর এই মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কাব্যরচনার সঙ্গে অকৃত্রিম জীবনবোধ ও সত্যনিষ্ঠা যুক্ত না হলে কোন কবির রচনা সার্থক, সর্বজনীন ও স্থায়ী হয় না। নজরুলের কবিসত্তার সঙ্গে মানব প্রেম ও সত্যনিষ্ঠা অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত। তাঁর কাব্যসাধনার মূল- প্রেরণাই হচ্ছে মানবপ্রেম এবং সত্যের জন্য গভীর আগ্রহ। নজরুলের কবি- কল্পনার সঙ্গে শাশ্বত মানবতাবোধ এবং দেশের সমকালীন সমস্যার সংযোগ অত্যন্ত নিবিড় বলেই তিনি একাধারে কবি এবং মানব- প্রেমিক রূপে আমাদের কাছে সমাদৃত।

কাব্যের ভাব, রূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পৃথিবীর যে কোন দু'জন সমালোচকের মতৈক্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। মানুষের সমাজসমস্যার যথার্থ উপলব্ধি ও সমাধানের জ্ঞান ব্যতিরেকে শিল্প সৃষ্টি অনেকের মতে স্বপ্নবিলাসিতা মাত্র। ইংরাজী সাহিত্যের মিলটন- শেলী- বায়রণ, ফরাসী সাহিত্যের রুশো- ভলটেয়ার- বালজাক, রুশ সাহিত্যের পুশকিন টলষ্টয়-গোর্কি নির্যাতিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। নজরুল ইসলাম এঁদের সমগোত্রীয়।

হৃদয়বৃত্তির খেলায় সব কবিই উৎসাহী। কিন্তু কবি জীবনের প্রাথমিক ধাপে নজরুলের দৃষ্টি ছিল তাঁর বিরাট দেশের দিকে-দারিদ্র্য- অশিক্ষা- অত্যাচারে নিস্পেষিত পৃথিবীর জনতার দিকে। সেই নির্যাতিত মানুষের দুঃখ-বেদনাকে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়ে কাব্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। একেই বলেছেন কবি- "মানুষের বেদনার পূজা" তাঁর বক্তব্য ছিল যেমন শানিত তেমনি ঋজু এবং স্পষ্ট; কলা- কৌশলের গোলক-ধাঁধায় বক্তব্যকে তিনি হারিয়ে যেতে দেননি। তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ অলংকৃত, কিন্তু তা সর্বদাই অকৃত্রিম বলেই সহজেই হৃদয়স্পর্শী।

আতাউর রহমানের মতে, নজরুলের সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য মানুষ জাতির কল্যাণ সাধনা। এর বাইরে তিনি ভাবতে পারতেন না। এই ভাবনা ছিল তাঁর অস্থিমজ্জাগমত। এই জন্য তাঁর সাহিত্য হয়েছে প্রচারধর্মী ও অতিরিক্ত আদর্শমূলক। জার্মান কবি গ্যেটের মতে "প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম ও শেষ দাবী সত্যপ্রীতি।' নজরুল এই দাবী পূরণ করেছেন পরিপূর্ণভাবে। নজরুলের সাহিত্য সাধনার মূলে প্রেরণা দিয়েছে সত্য প্রকাশের আগ্রহ- সত্যই তাঁর কবিজীবনের মূল দর্শন। সত্য প্রকাশের ব্যাকুলতা তাঁর কাব্যে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

রাজদ্রোহের অপরাধে কবিকে বন্দী করা হলে তিনি তাঁর জবানবন্দী তৈরী করেছিলেন। বাংলার বিদ্রোহী কবির জবানবন্দী পড়তে গিয়ে মনে পড়ে ফরাসী কবি পল এলুয়ারের কথা।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ও এলুয়ার-একজন সাম্রাজবাদী শাসকের কারাগারে বন্দী-আর একজন বর্বর ফ্যাসিষ্ট আক্রমনে জর্জরিত। উভয়ে সংগ্রাম করেছেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা সাম্য- ভ্রাতৃত্বের পক্ষে।

আতাউর রহমানের কথায়, নজরুলের সমগ্র সাহিত্য সাধনা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই- সত্য বিবেক ও মানবতার তিনি অতন্দ্র প্রহরী। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের স্থান সবার উপরে- ধর্ম- শাস্ত্র- মসজিদ-মন্দিরের চেয়েও পবিত্র এই মানুষ। মানুষকে ভালবাসেন-মানুষের সর্বাত্মক মুক্তি-- চান বলেই কবি পরাধীন জাতির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন, শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারা মানুষকে দিতে চান অন্নবস্ত্রের অধিকার। তাঁর সত্যোপলব্ধির সঙ্গে স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তির কোন প্রভেদ নেই।

সত্যনিষ্ঠা, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবশতই কবি অসাম্প্রদায়িকতা কোন বিশেষ ধর্ম ও নীতি তাঁর সত্যান্বেষণের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেনি। সত্যকে পাবার জন্য কবি হৃদয়ের দিকে তাকিয়েছেন, নির্ভর করেছেন সত্যবিচারের শ্রেষ্ঠ নিরিখ বিবেকের উপর। মানুষের জীবন বিপুল,- অনাগত কালের গর্ভে নিহিত বহু সত্যসম্ভাবনা কোন বিশেষ শাস্ত্র, কোন বিশেষ মহাপুরুষের দ্বারা তার শেষ মীমাংসা কখনই সম্ভব নয়। তাই কবি বলেন,--

১। তোমার দেবতার সৌন্দর্য- শক্তি- মহিমা অনাদি অনন্ত কোন গুরু পুরোহিতের মন্ত্রশাস্ত্রের নিগড়ে যে বিরাট পুরুষ বাঁধা পড়ে নেই। (ধুমকেতু)।

২। এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই। (সর্বহারা)।

নজরুলের কাব্য সাধনা নিঃসঙ্গ কবির সৌন্দর্য চর্চায় সীমাবদ্ধ নয়। সমষ্টির জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত তাঁর কাব্য ও সাহিত্য।

নজরুল ইসলাম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদলঃ আতাউর রহমানের মতে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর নজরুলের বৈপ্লবিক সমাজ চেতনার সারথ্যে বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র-পরিমন্ডল থেকে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছুসংখ্যক উৎসাহী তরুণ পশ্চিমের অত্যাধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-দর্শনের কাছে পেলেন অধিকতর বাস্তববাদ ও যুক্তি-বিজ্ঞানের শিক্ষা। বিপ্লব-পূর্ব রুশ-সাহিত্য, ফারসী-সাহিত্য, নরওয়ের বোয়ার-হ্যামসুন, ইংল্যান্ডের শে-হাকস্‌লি ওয়েলস-লরেন্স, বাংলা সাহিতের আধুনিক অধ্যায়কে প্রভাবিত করলো। নতুন যুগের এই উদার আলোক নজরুলের ললাট স্পর্শ করলেও বৃহত্তর মুসলমান সমাজ সামন্ত্রতান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন। এই সময়ে ইতিহাসের নিয়মে বাংলার শিক্ষিত মুসলিম যুবকেরা সমাজ-সংস্কারের কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। সেদিন মুসলিমদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ছিল- সমাজ ছিল না। পক্ষান্তরে হিন্দু মধ্যবিত্ত অবক্ষয় ও সংকটের সম্মুখিন। তাই নিম্নমধ্যবিত্তের কেরানীকুলের বেদনা এবং শিক্ষিত বেকারের অসহায়ত্ব সেদিন সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। 'কল্লোলে'র যুবকেরা যখন ঘোরাফেরা করছে শহরে- শহরতলীতে কলে-করখানায় শ্রমিক- মজুরের- এলাকায়, মুসলিম লেখকের তখন তাদের স্ব-সমাজ অর্থাৎ পল্লীর কৃষকজীবন পরিক্রমণে ব্যাপৃত। তাই নজিবর রহমান, কাজী ইমদাদুল হক থেকে মাহবুবুউল আলম, আবুল ফজল পর্যন্ত -সবার উপন্যাসের পটভূমি পল্লী সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী- পরিবেশ। কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অবলোকন ও অনুধাবনের পরিচয় পাওয়া যায় তৎকালীন সচেতন কর্মী মুজফ্‌ফর আহমদ, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমন্ত সরকার, নজরুল ইসলাম প্রভৃতির চিন্তায় ও কর্মে। নজরুল ইসলাম সমভাবে সান্নিধ্য পেয়েছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ ও দেশবন্ধুর। 'নবযুগ' 'লাঙ্গল' 'গণবাণী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সোচ্চার বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ তাঁর এই সময়কার সৃষ্টি 'সর্বহারা' ও 'ফনিমনসা'।

সত্যেন দত্তের পর সামাজিক অবিচার ও অসাম্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ নির্ণয়ে যথার্থভাবে নিয়োজিত বলেই নজরুল নতুন যুগের পথিকৃৎ। এই চেতনা যুবমানসে আলোড়ন এনেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই, নিপীড়িত মানুষকে নতুন দৃষ্টিতে দেখবার প্রেরণা এসেছে। "সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।" (সাহিত্য চর্চা-বুদ্ধদেব বসু)

আতাউর রহমানের ভাষায়, প্রাথমিক পর্যায়ে কবিতার বিষয়বস্তু গ্রহণে এবং আঙ্গিক রচনায় নজরুল সমভাবে মৌলিক- স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় জগৎ অতিক্রমণে নজরুল সিদ্ধ ও সার্থক। নজরুলের সরলতা, কল্লোলে অনুপস্থিত- অনুপস্থিত তাঁর অবিচল সমাজনিষ্ঠার বাইরে থেকে নজরুলকে বোহেমিয়ান এবং রোমান্টিক মনে হলেও জীবনের গভীরতার সত্যে তিনি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন- তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সে যুগের জাতীয় মানসকে অভিভূত করা।

নজরুলের 'সর্বহারা' শৈলজানন্দের খনি-মজুরের গল্প, প্রেমেন্দ্রমিত্রের 'প্রথমা' একই যন্ত্রনা থেকে উদ্ভূত। বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনার' ভিন্ন জাতের হলেও তা নজরুলের প্রভাবজাত। নজরুলের সমাজনিষ্ঠার রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে কল্লোলের পার্থক্য ছিল না এমন নয় তবু নজরুলই কল্লোলের আদর্শস্থানীয়। কেননা সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অমিত প্রগলভতা নজরুলই সঞ্চার করেছিলেন তাদের মনে। তা ছাড়া নজরুলে তারা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রতর জগৎ।

জীবনানন্দের প্রথম পদক্ষেপ নজরুল পদাঙ্ক ধরেই চলেছিল। মোহিতলালের 'নাদির শাহ' 'বেদুইন' 'কালাপাহাড়' জাতীয় কবিতার উৎসে নজরুলের প্রভাব অনস্বীকার্য।

আতাউর রহমানের মতে, নজরুলের আবির্ভাব শিক্ষিত মুসলিম যুবকদিগকে নাড়া দিয়েছিল প্রবলভাবে। এই সময়ের মুসলিম মধ্যবিত্ত স্ব-সমাজের দুর্দশায় পীড়িত হলেও নতুন চেতনায় উজ্জীবিত, তাই নির্মাণের আশায় উদ্দীপ্ত। মুসলিম মধ্যবিত্ত কিন্তু তখন জাগরণের গান রচনা করেছেন। নজরুলকে কেন্দ্র করে একটি গোষ্ঠীগত প্রেরণা এই সময় মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় স্বাধীনতা, চিন্তার মুক্তি, হিন্দু- মুসলিম ঐক্য ছিল এদের মূল লক্ষ্য। মত ও পথের পার্থক্য সত্বেও নজরুলকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল মনসুর আহমেদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আব্দুল কাদির, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, বাহার নাহার, (মুহম্মাদ হাবীবুল্লাহ ও বেগম শামসুন নাহার) আবুল ফজল, আলম পরিবার (মাহ-উল আলম, ওহীদুল আলম, দিদারুল আলম) প্রমুখ উদীয়মান লেখক গোষ্ঠী।

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফা ও শাহাদৎ হোসেনের বহু কবির পিছনে নজরুলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা রয়েছে। নজরুলের বিদ্রোহী প্রেরণায় সাময়িকভাবে উদ্দীপ্ত হলেন বেনজীর আহমদ, মহীউদ্দীন, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

তিরিশের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে জনজীবনকে অবলম্বন করার যে স্পৃহা লক্ষ্য করা যায় নজরুল তার উদগাতা। নজরুলের ১৩৩২ এর 'ফরিয়াদ' রবীন্দ্রনাথে ১৩৩৮ এ 'প্রশ্ন'রূপে উপস্থিত। "বিদ্রোহী কবি তাঁর নারী কবিতা না লিখলে রবীন্দ্রনাথের মহুয়া অতো সহজে মঞ্জুরিত হতো না। -- -- আধুনিক কালে বাংলা কবিতার প্রদর্শক হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম; টি, এস, এলিয়ট নন। বাংলা কবিতায় টি, এস, এলিয়েটর প্রভাবের কাল শুরু হয়েছে, কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের এক দশক পরে।" (রনেশ দাশগুপ্ত-পূবালী জৈষ্ঠ্য-১৩৬৮)

তিরিশের পর নজরুল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তরালে চলে যান। জাতীয় আন্দোলনের উদ্দাম ধারাও আপোষের চোরাবালিতে পথ হারায়। অসহযোগ খেলাফত যুগের বিদ্রোহী তরুণেরা যৌবন পেরিয়ে গেলেন। সমাজ- বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক সূত্র অজ্ঞাত থাকায় তাদের রাজনৈতিক চেতনা হয় স্তিমিত, নয় বিভ্রান্ত। দেখা গেল কেউ নিরাশ, কেউ ধর্মান্ধ, কেউবা অতীত গৌরবে- পদচারণা করেছেন। সন্ত্রাসবাদী ও বামপন্থী অংশের কিছু কারাগারে, দ্বীপান্তরে, কিছু বা জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত।

কবি শিল্পীরা কিন্তু এরপর জন-জীবনের দিকে আকৃষ্ট হলেন। নির্যাতিত মানুষ ভীড় করে এলো সাহিত্যের অঙ্গনে। এই নতুন যুগ ও নব-জীবনের ইঙ্গিত দিয়ে 'ধূমকেতু'র মত অন্তর্হিত হলেন নজরুল ইসলাম।

আতাউর রহমানের মতে, নজরুল একজন নৈরাজ্যবাদী অধ্যায়ে নজরুলের সমগ্র রচনাবলী আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, নজরুল পুরোপুরি মার্কসবাদী ছিলেন না। মুজফ্ফর আহমদ সাহেব তাঁকে কমিউনিস্ট বলে দাবী করেননি। তবে মার্কসীয় তত্ত্ব না জেনে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না, এ ধারণা অমূলক। আমরা একথা আজকাল ভুলেই যাই যে, কোন এক বিশেষ ব্যক্তি কমিউনিজমের আদি এবং একমাত্র প্রবক্তা নন। আর কমিউনিজমের জন্ম শুধু ক্ষুধা থেকেই নয়। মানুষের স্বাভাবিক ন্যায়-নীতি জ্ঞানই কমিউনিজমের সূতিকাগার। নজরুলের সাম্য-প্রেরণার মূলে মার্কস লেনিনের শিক্ষা ছিল, তাঁর চেয়েও বেশী ছিল তাঁর স্বাভাবিক মানবতা বোধ ও ন্যায়- জ্ঞান।

-মার্কসবাদ ভালোভাবে না পড়লেও তাঁর বহু চিন্তা ও চেতনায় বহু উপলব্ধি ও উক্তিতে মার্কসবাদের অনুরণন শোনা যায়। লাঙ্গল-গণবানীর যুগের সমস্ত রচনাই শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী সংগ্রামকে ভিত্তি করে লেখা। 'কৃষকের গান', 'শ্রমিকের গান', 'কুলি-মজুর', 'নারী', 'রাজা-প্রজা' প্রভৃতি কবিতায় যে চেতনা উপলব্ধি ও বিশ্বাস ফুটে উঠেছে তা কোন ক্রমেই মার্কসীয় তত্ত্বের বহির্ভূত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আতাউর রহমানের ভাষায়, নজরুলের কবিতায় বঞ্চিত ও নিপীড়িতের হৃদয় জ্বালার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে বিপ্লবীর উদ্দীপনা, বিদ্রোহীর আক্রোশ- যে আক্রোশের লক্ষ্য মানব-সমাজে যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত অত্যাচার- অন্যায় শোষণ নির্যাতিন- কোন বিশেষ কালের ও বিশেষ দেশের শাসন ব্যবস্থা নয়; অথবা স্থূল অর্থে কোন সাম্রাজ্যবাদ নয়। মানুষ শুধু রাজার শাসন শোষনেই জর্জরিত নয়, সে বহুরকম নিয়মকানুনের দাস; বহু রকম রীতিনীতির বন্ধনে মানুষের স্বাধীন সত্তা যুগ যুগ ধরে অবরুদ্ধ সেই নিপীড়নের বিরুদ্ধে সেই বন্ধনের বিরুদ্ধে চির-স্বাধীন মানবাত্মার বিরামহীন অভিযান যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সেই অভিযানের নায়ক বিদ্রোহী প্রমিথিউস- যাঁর যন্ত্রনাও অশেষ। সর্ব কালের সব দেশের বিদ্রোহীরা এই যন্ত্রণা বহন করে। যে বেদনা রুশোকে বিদ্রোহী করেছে, শেলীকে করেছে ঘর ছাড়া, যে আদর্শের প্রেরণায় টমাস পেইন হয়েছেন দেশত্যাগী, যে যন্ত্রনায় বিদ্রোহীরা মাথা খুঁজেছেন ব্যাস্টিলের কারাকক্ষে, সাইবেরিয়ার উষর প্রান্তরে- সেই প্রেরণায় নজরুল বিদ্রোহী।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্যে নজরুলের কাব্য প্রতিভা বিকশিত হয়। সংবেদনশীল কবিচিত্ত সেই আন্দোলনে সর্বাধিক আলোড়িত হয়েছে সে কথাও সত্য। কিন্তু তাঁর চেতনা সমকালিন রাজনৈতিক চেতনাকে অতিক্রম করেছে। নজরুল তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যে স্বাধীনতার অর্থ শুধু মাত্র বিদেশী শাসনের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া নয়, শ্রেণী শোষণের কবল থেকে মুক্তিও নয়। নজরুলের কাব্যদর্শ্যের পিছনে আরও উচ্চতর জীবনাদর্শের প্রেরণা সক্রিয় ছিল। তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন ও অধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

আতাউর রহমানের মতে, নজরুলের সত্য-প্রীতি গান্ধীজির সত্যাগ্রহের প্রতিধ্বনি অথচ গান্ধীজি ছিলেন অহিংস নীতির দৃঢ়- সমর্থক। পক্ষান্তরে নজরুল রক্তাক্ত বিপ্লবের সোচ্চার প্রচারক এবং শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগে বিশ্বাসী। অহিংস রাজনীতির প্রতি নজরুলের কটাক্ষ ও বিদ্রুপোক্তির কথাও এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে।

টলস্টয়-থরো প্রভাবিত আইন-অমান্যের উদগাতা মহাত্মা গান্ধী বিদ্রোহ বিপ্লবের দর্শনকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। রুশবিপ্লবের তাৎপর্য তখনো অস্পষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর ছিল এদেশের বুদ্ধিজীবির কাছে। এই অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির যুগেও নজরুল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দাবী উথাপন করেছেন।

গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নজরুলের বিদ্রোহের স্বভাব সমাজবাদ সাম্যবাদ অপেক্ষা নৈরাজ্যবাদের পক্ষপাতি। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার উপর অনাস্থা এবং তীব্র ঘৃণা নজরুলকে প্রায় ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তাই তিনি শাসক শ্রেণী ও সমাজের উপরতলার অধিবাসীদের 'ডাকাত' 'ভন্ড' 'ধড়িবাজ' বলে অভিহিত করেছেন। অরাজকতাপূর্ণ সমাজ ও ব্যবস্থায় বিদ্রোহ ঘোষনা করা ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর গত্যন্তর ছিল না। এখানে মুক্তির অর্থ সমাজ বন্ধনকে অস্বীকার করা । তাই তিনি বলেন ''আমি মানিনাকো কোন আইন।'' সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি অসংগতি তাঁকে পীড়িত করেছে তাঁর বিবেককে উদ্দীপ্ত করেছে বিদ্রোহ করার জন্য, এই বিবেকের তাড়নায় কবি নজরুল গভর্ণমেন্টকে অস্বীকার করেছেন, সমাজকে আঘাত করেছেন। তথাকথিত ধর্মীয় মূল্যবোধকে পর্যন্ত ব্যঙ্গ- বিদ্রুপে জর্জরিত করেছেন।

নজরুলের ভাষার ভঙ্গিতে অনেক ক্ষেত্রে প্রধুর মনোভঙ্গি ব্যপ্ত হয়েছে। নজরুল যে আইনকে স্বীকার করতে পারেননি তা প্রকৃতপক্ষে নৈরাজ্যবাদী স্বভাবের বৈশিষ্ট্য,

আমি মানিনাকো কোন আইন ----------
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ (বিদ্রোহী)।
অথবা
মসজিদ আর মন্দির যত শয়তানদের যন্ত্রণাগার
(পথের দিশাঃ ফণীমনসা)
অথবা
কি হবে পূজিয়া পাষাণ দেবতা পুণ্য চোর?
(রক্ত তিলকঃ প্রলয় শিখা)

উপরিউক্ত কয়েকটি পংক্তিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কবি প্রচলিত নীতিবোধকে নির্মমভাবে আঘাত করেছেন। ভগবান ধর্ম মন্দির মসজিদ মোল্লা- পুরো টিকি দাড়ি প্রভৃতির প্রতি নজরুলের বিদ্রুপোক্তি নৈরাজ্যবাদীদের বেপরোয়া মনোবৃত্তির পরিচায়ক। প্রচলিত নৈতিকতার প্রতি আস্থা নজরুলের ছিল না বলেই 'পাপ', 'বারাঙ্গনা', 'মিথ্যাবাদী', 'ধূমকেতু' প্রভৃতি কবিতা তাঁর পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়েছিল।

নজরুলের নৈরাজ্যিক বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে অরাজকতার বিরুদ্ধে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

নজরুল সাহিত্যে প্রেম ও রোমান্টিকতাঃ আতাউর রহমানের মতে, রোমান্টিকতা মানবমনের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। জীবন, পরিবেশ ও প্রকৃতি মাঝে মাঝে মানুষের চোখে রহস্যময় হয়ে ওঠে, রঙিন হয়ে ওঠে, আপাত রূঢ় বস্তুর অন্তরালে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে স্বপ্ন রঙিন কোমলতা।

রোমান্টিকতা সাহিত্য ও শিল্পকলার একটি বিশেষ গুণ। এই গুনে সাহিত্য হয়ে ওঠে সুন্দর হৃদয়স্পর্শী উপভোগ্য।

নজরুলের স্বভাবে এই রোমান্টিকবৃত্তি ছিল অত্যন্ত প্রবল। বেদনাবিলাস রোমান্টিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। নজরুলের প্রেমের কবিতায় ও গানে এবং উপন্যাস-গল্পে বেদনাবিলাস অতিমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অন্যান্য রোমান্টিক কবিদের মহৎ জীবন ও জগতের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। প্রেম ও প্রকৃতির রহস্যময় রাজ্যে তিনি বার বার বেদনা কাতর হয়েছেন, বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। 'প্রিয়ার রূপ', 'প্রিয়ার স্পর্শ' ও হৃদয়ে "ইন্দ্রধুর তুমুল প্রতিধ্বনি" জাগিয়েছে। তিনি বলেছেন,

মৃনাল হাত,
নয়ন পাত,
গালের টোল
চিবুক দোল,
সকল কাজ
করায় ভুল
প্রিয়ার মোর
কোথায় তুল?
কোথায় তুল? (দোদুল দোলঃ দোলন চাঁপা)

প্রেমকে শুধুমাত্র জৈবিক বৃত্তি না জেনে, তাকে বিস্ময় বেদনা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করায় নজরুলের কবিতায় ও গানে প্রেমানুভূতির বৈচিত্র্য ও গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। নজরুলের দৃষ্টিতে "প্রেম চিরকালই পবিত্র দুর্জয় অমর, আর পাপ চিরকালই কলুষ দুর্বল আর ক্ষণস্থায়ী। কামনা আর প্রেম, দুটো হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা, আর প্রেম হচ্ছে ধীর প্রশান্ত ও চিরন্তন।" (ব্যাথার দান)

অতৃপ্তি ও বেদনা প্রেমের কবিতায় সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য। প্রেমানুভূতির প্রায় সর্বত্রই বিরহ-ব্যথায় ম্লান হয়ে থাকে। প্রেমিক চিরদিনই বহন করে এক নীরব বেদনা। মানব মনের এই চিরন্তন অনুভূতি নজরুল কবিতায় গাঢ় হয়ে গভীর হয়ে ধরা দিয়েছে। তাঁর কবিতায় প্রিয়হারা কান্না আছে, বঞ্চনার জ্বালা আছে, ঈর্ষা আছে, প্রতিহিংসা আছে, প্রতিঘাত আছে। প্রেমের কবিতায় নজরুল সীমাহীনভাবে কোমল ও ব্যথাকাতর এবং বহুক্ষেত্রে ঈর্ষাতুর।

নজরুল অতন্দ্র প্রেমের পূজারী। প্রেমের স্মৃতি নজরুলের দৃষ্টিতে অক্ষয় ও অমর। প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন মানব স্বভাবের এক দুর্মর ব্যাপার। নজরুলের কবিতায় এই স্মৃতি রোমন্থন প্রতিমা রূপ ধরে এসেছে, অতীত হয়ে উঠেছে জীবন্ত অশ্রুদীপ্ত।

মনে পড়ে সেদিন তুমি ঘুমিয়েছিলে অঘোর ঘুমে,
এ দীন কাঙাল এসেছিল তোমার পায়ের আঙুল চুমে।
আমার অশ্রুর-আঘাত লেগে
চমকে তুমি উঠলে জেগে
চরণ আঘাত করলে রেগে ----- (ব্যথা গরবঃ দোলন চাঁপা)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল 'বারাঙ্গানা' কে মাতৃত্বের সম্মান দিতে কুণ্ঠিত নন। কিন্তু প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে এলেই নারীর প্রতি তাঁর সন্দেহ, অশ্রদ্ধা ও অনীহা জেগে ওঠে। পূজারিণী কবিতায় নারীকে তিনি 'লোভী', 'অতিলোভী' 'ছলনা' 'মায়াময়ী' ও 'মায়াবিনী' বলে ভৎর্সনা করেছেন। আলতা- স্মৃতি কবিতায় কবি কঠিন ভাষায় আক্রমণ করেছেন প্রণয়িণীকে,

মর্ম্ম মূলে হানলে আমার অবিশ্বাসের তীক্ষ্ম ছুরি
সে খুন সখায় অর্ঘ্য দিলে যুগল চরণ-পদ্মে পুরি।
আমার প্রাণের রক্ত-কমল
নিঙড়ে হ'ল ল ল পদতল,
সেই শতদল দিয়ে তোমার নতুন রাজায় করেছিলে-
আলতা যেদিন পরেছিল। (দোলন চাঁপা)

সমাজ সচেতন নজরুল যখন প্রেম ও প্রকৃতির অঞ্চলতলে ধরা পড়েন, তখন তিনি হয়ে পড়েন ভাবপ্রবণ-তাঁর হৃদয় তখন উদাস হয়ে পড়ে, সেই ঔদাস্য তাঁর একার নয়- সমগ্র বিশ্বের। বেলাশেষে যখন 'গাঢ় বেদনার ধুসর আঁচলখানি পৃথিবীর দিগন্তকে ম্লান করে তোলে তখন কবির চোখে পড়ে,'

আকাশের অস্ত বাতায়নে
অনন্ত দিনের কোন্ বিরহিনী কনে-
আরও চোখে পড়ে,
আদিম কালের বিষাদিনী বালিকার পথ-চাওয়া।
(বেদনা শেষে ঃ দোলন চাঁপা)

এই বিষন্নতা, এই নিঃসঙ্গতা, এই বেদনাবোধ থেকে মানুষের মুক্তি নেই। "ধরে নিতে হবে যে বিষাদ ভাবটি মানবচিত্তে আবহমান -------এবং 'রোমান্টিক বিষাদের চরিত্রলক্ষণ এই যে তা "অহেতু সম্ভব।"

নজরুলের দৃষ্টিতে প্রেম ও নারীঃ আতাউর রহমানের ভাষায়, নজরুলের প্রেমের কবিতায় ও গানে হৃদয়াবেগের তীব্রতা অতিমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। সচেতন মন দিয়ে তিনি প্রেমের বিচার করেন নি। তত্ত্ব নয় প্রেমের অনুভূতিই নজরুলকে আলোড়িত করেছে। প্রেম কোন কবির ব্যক্তিগত ধারণা নয়- বিশ্বজনীন ভাবানুভূতির প্রকাশ। নজরুলের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে এই সর্বজনীন সত্য,

নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি- প্রাণ
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান। (নারী ঃ সর্বহারা)

নজরুলের কবিতা আবেগ নির্ভর এবং তাঁর বিদ্রোহ ও মূলতঃ আবেগ নির্ভর বলেই তাতে স্ববিরোধিতার অভাব নেই। 'অগ্নিবীণায়' একদিকে আছে বীরের অসি- ঝঙ্কার, অন্যদিকে আছে 'কাঁকন- চুড়ির কন কন।'

Dhaka University Institutional Repository

যৌবনের আগমনে জীবনে যে উন্মাদনা ও অতৃপ্তি আসে লরেন্সের কবিতায় তার একটি স্পষ্ট স্বীকৃত লক্ষ্যযোগ্য। নজরুলের কবিতায় এই অশান্ত যৌবনের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই,

খুঁজে ফিরি, কোথা হতে এই ব্যথা- ভারাতুর মদ-গন্ধ আসে
আকাশ, বাতাস, ধরা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর তপ্ত ঘন দীর্ঘশ্বাসে
কেঁদে ওঠে লতা পাতা,
কূল পাখী নদী জল
মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল-
কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন জ্বালায় জাগা অতৃপ্ত বিধাতা।

আদম- সন্তান কবি নজরুল অস্বীকার করতে পারেন না নারীর মায়া। নারীকে স্বীকার করতে হয়- স্বীকার করতে হয় বন্দীত্ব। মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন প্রেমের জয়,

হে মোর রাণি। তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে।

(বিজয়িণীঃ ছায়ানট)

যৌবনের মানুষের জীবনের সবচেয়ে সংবেদনশীল সময়, এই সময়ে তার সত্তায় কাম প্রেম এবং স্বপ্নজাগরণের মেলা বসে। যৌবনের দেবতা অতৃপ্ত। যৌবনে উপস্থিত হয়ে মানুষ অনুভব করে এই অতৃপ্ত বিধাতার সর্বগ্রাসী প্রভাব। এই অতৃপ্তির, পূর্ণ প্রকাশ দেখি নজরুলের 'দোলন চাঁপা' কবিতায়।

মধ্যযুগের অধিকাংশ কবি যেখানে নারীর দেহের বাহ্যিক সৌন্দর্য বর্ণনা মুখ্য মনে করেছেন, নজরুল সেখানে নারীর অন্তর্জীবনকে- তার সমগ্র সত্তাতে প্রকাশ করেছেন।

দৈহিক কামনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ নজরুলের কাব্যে নেই, তাই পরোক্ষে স্মৃতি-চিত্ররূপে এসেছে তাঁর কবিতায়। 'অবেলার ডাক', 'আশান্বিতা', 'অভিশাপ' প্রভৃতি কবিতায় বিরহ মিলনের চিত্রগুলো বেদনার রসে শিশির সজল,

সোহাগে সে ধরতে যেত নিবিড় করে বক্ষে চেপে,
হতভাগী পালিয়ে যেতাম ভয়ে এ বুক উঠত কেঁপে।
রাজভিখারীর আঁখির কালো,
দূরে থেকেই লাগতে ভালো,

আসলে কাছে ক্ষুধিত তার দিঘল চোখের অশ্রুভাবে
ব্যথায় কেমন মুসড়ে যেতাম, সুর হারাতাম মনের তারে।

(অবেলার ডাকঃ দোলন চাঁপা)

প্রেম ও সৌন্দর্য পরস্পর নির্ভরশীল। নারীর রূপ বর্ণনায় নজরুলের বিশেষ দৃষ্টি তার চোখে-চোখের ভুরুতে; চিবুকে, চিবুকের তিলে। নারী নজরুলের দৃষ্টিতে তখনই সবচেয়ে আকর্ষণীয়া যখন সে প্রেমে মুগ্ধা, বিরশা। নওরোজের দৃশ্য অঙ্কন করতে গিয়ে কবির চোখে যারা নেশা ধরিয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

নিকপিক করে ক্ষীণ কাঁকল
পেশোয়াজ কাঁপে টাল মাটাল,
গুরু-উরু ভারে তনু নাকাল
টলমল আঁখি জল বোঝাই।

তাঁর প্রেমের কবিতায় যেমন আছে বেদনা- কাতরতা তেমনি আছে ঈর্ষার জ্বালা। রবীন্দ্রনাথে আছে সহিষ্ণুতা ক্ষমা। প্রেমিকার ছলনা-প্রবঞ্চনা স্বার্থপরতা নীচতা নজরুলের দৃষ্টি এড়ায় না। প্রেমিকের নীচতার কথা স্মরণে এলে নজরুল বলেন,

হিংসা রক্ত- আঁখি মোর অশ্রুরাঙা বেদনার রসে যেতো ছেয়ে।
(পূজারিণীঃ দোলন চাঁপা)

নারীর ঔদাসীন্য ও নির্মমতা কবিকে অবিশ্বাসী করে তুলেছে। নজরুলের নায়ক নারীকে বিদ্রুপ করেছে- সংশয় প্রকাশ করেছে-নারীর সততার প্রেমিকের সমাধির উপর ওঠে নারীর নতুন বাসর- সুখের সংসার, তার হৃদয়- রক্তে নারীর পদ হয়ে অলক্তক- রঞ্জিত,

জানি রাণী, এমনি করে আমার বুকের রক্ত - ধারায়
আমারই প্রেম জন্মে জন্মে তোমার পায়ে আলতা পরায়।
(আলতা স্মৃতি ঃ দোলন চাঁপা)

নজরুলের প্রেমের কবিতায় দেহ- সচেতনতা থাকলেও তা কোথাও তীব্র হয়ে উঠেনি। একমাত্র 'ফাল্গুনী'তে দেহ- যন্ত্রনার প্রকাশ স্পষ্ট।

নজরুল কবিতায়, গানে, গল্পে ও উপন্যাসে অমর প্রেমের জয় ঘোষণা করেছেন। শুধু এই জন্মে নয়, জন্মান্তরেও তিনি প্রেমের স্থায়ীত্ব কামনা করেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে নারী শেষ পর্যন্ত 'কুহেলিকা', প্রেম 'আলেয়া' । প্রেম বেঁচে থাকে কিন্তু প্রেমের পাত্র পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যায়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর কবি যেন দিব্য দৃষ্টি লাভ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে স্পর্শ হয়ে ওঠে প্রেমের স্বরূপ।

আজ মনে হয়
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়------
প্রেম সত্য, প্রেম পাত্র বহু-অগনন,
তাই- চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়।----
যে পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশা হয়।------
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়।
(অ-নামিকাঃ সিন্ধু হিন্দোল)

শেষ পর্যন্ত নজরুলের প্রেমানুভূতি সংসার ও সময়ের সংকীর্ণ গন্ডী অতিক্রম করে- সীমাকে ছেড়ে অসীমের, রূপকে ছেড়ে অরূপের- দিকে যাত্রা করেছে, এক জীবনের প্রিয়া চির- জনমের প্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে; এবং তারি উদ্দেশ্যে কবিপ্রাণের অঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসার ছলে আমায় তোমার নামে গান গাওয়ালে।
চাঁদের মতন সুদূর থেকে সাগরে মোর দোল খাওয়ালে।
কাননে মোর ফুল ফুটিয়ে উড়ে গেলে গানের পাখী।
যুগে যুগে আমায় তুমি এমনি করে পথ চাওয়ালে।
(বনগীতি)

নজরুল কাব্যে প্রকৃতি অধ্যায়ে পাই, রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের ক্ষীণ-সূত্র অবলম্বন করে প্রকৃতির রহস্যময় রাজ্যে প্রবেশ করেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে।

নজরুলের কবিতায়ও গানে আমরা বিদ্রোহের উদ্দামতা ও প্রেমের ভাব-বিভোরতা সন্ধ্যান করি, প্রকৃতির কোমল স্পর্শটি এড়িয়ে যাই। যেন নজরুল সব সময় বিদ্রোহের কথাই বলবেন- অন্য কোন বক্তব্য নেই তাঁর। কিন্তু নজরুল মূলতঃ কবি এবং অত্যন্ত ভাবপ্রবন কবি। কোন কবি মানস প্রকৃতির প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না। নজরুলের দৃষ্টিতে প্রকৃতির আকর্ষণ কত গভীর ছিল তা বুঝতে পারি বাঁধন- হারার প্রকৃতি বর্ণনায়, যেখানে তিনি একই প্রাকৃতিক দৃশ্যকে দুটি রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়াও তাঁর কবিতায় সন্ধ্যা, রাত্রি বর্ষা- রজনী, শরতের মৃত্তিকা ও আকাশ- শীতের ময়দান- মূর্তি ধরে এসেছে। নজরুলের অনেক কবিতাও গানে প্রকৃতির পরিবেশের মনোরম চিত্র দৃষ্টিগ্রাহ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার করুণতা সন্ধ্যা তারার নিঃসঙ্গ বিষন্নতা-নজরুলের বেদনাকাতর দৃষ্টিকে বার বার আকর্ষণ করেছে সন্ধ্যার আগমণ চিত্র নজরুলের কাছে ক্লান্তির সুরের মতো মায়াময়,

বনের ছায়া গভীর ভালবেসে
আঁধার মাখায় দিগ্ বধুদের কেশে
ডাকতে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে
উদাস পাথিক ভাবে।
(পথহারা ঃ দোলন-চাঁপা)

শীত মনে হয়, নজরুলের প্রিয় ঋতু। একাধিক কবিতায় ও গানে শীত ঋতুর করুণ চিত্র নজরুল ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য ঋতু নিয়েও কবি কবিতা রচনা করেছন।

মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে নজরুল যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে আছে মরু প্রকৃতির ছাপ, যা বাংলা সাহিত্যে প্রায় নতুন। আরবী পার্শি শব্দের মিষ্টতা এই প্রকৃতি চিত্রকে করেছে হৃদয়গ্রাহী। বিদেশী প্রকৃতির চিত্র অংকনে নজরুলের কল্পনা কখনো যাথার্থ্যকে অতিক্রম করেনি। ওয়েসিস, মরীচিকা, লু-হাওয়া, খর্জুর বীথি, উটের সারি, বেদুঈন-বালা-প্রভুতি বিষয়ের চিত্র যথাযর্থভাবে কবি কল্পণায় ধরা পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সিন্ধুকে 'আদি জননী' রূপে কল্পনা করেছেন। নজরুলের দৃষ্টিতে সিন্ধু পৃথিবীর পিতা, 'ধরা তার আদরিনী মেয়ে।'

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্ডসওয়ার্থ- রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাসের মতো নজরুল প্রকৃতি- প্রেমিক নন। তাঁদের মতো তিনি প্রকৃতিতে নিবিষ্ট হননি কখনো। জীবনের চারপার্শ্বের অসমতা, বিকৃতি তাঁকে আঘাত করেছে। সেই বেদনায় তিনি হয়েছেন বিদ্রোহী। শিল্প জীবনের প্রয়োজনের বাইরে নিয়ে যাওয়ার মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না তাই প্রকৃতিকে তিনি আলতো ভাবে ছুয়ে গেছেন, তার গভীরে কখনো প্রবেশ করেননি। তবু আকাশ-প্রান্তর- ঝড়- সমুদ্র তাঁর তুলিকায় কখনো কখনো সুন্দর ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে এবং তা কোনদিন মুছে যাবার মতো নয়।

নজরুলের আধ্যাত্মিকতা ঃ আতাউর রহমানের মতে, নজরুল-কাব্যে এক রহস্যময়ীর আবির্ভাব ঘটলো। বিদ্রোহী কবি সহসা মুখ ফেরালেন ভক্তির দিকে। তাঁর এই পরিবর্তন অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। কিন্তু নজরুল চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি বিদ্রোহী, যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ; কিন্তু যথার্থ বস্তুবাদী নন। স্রষ্টাকে বিশ্বাস করার মূলে বস্তুবাদীরা দেখেছেন মানুষের অজ্ঞতা, অসহায়তা, দুর্বলতা ও ভীতি। নজরুল ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে কখনো কখনো স্রষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেও তাঁকে অস্বীকার করেননি। জীবন-মৃত্যু তথা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা মানুষের মনে স্রষ্টার ধারণা নিয়ে এসেছে।

নজরুল বস্তুবাদী নন, নাস্তিকও নন। তবু বস্তুবাদ ও নাস্তিকতার বহু চিহ্ন তাঁর রচনায় ছড়িয়ে আছে। নজরুল অবশ্যই সাধারণ অর্থে আস্তিক নন। ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-প্রথা-তাঁর কাছে বিদ্রুপের বিষয়। মোল্লা-পুরুত, টিকি-দাঁড়ি, মসজিদ মন্দির প্রভৃতির প্রতি তিনি সময় সময় চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। ধর্মের নৈতিক দিক-যা বিশ্বজনীন মানবতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত-নজরুল তারই উপাসক। যারা মসজিদ-মন্দিরে অরণ্যে কাননে তপস্যা করে স্রষ্টাকে পাবার জন্য- তাঁদের উদ্দেশ্যে কবি বলেন,

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ-পাতাল- জুড়ে
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে কে তুমি পাহাড়-চুড়ে?
হায় ঋষি দরবেশ,
বুকের মানিককে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ।
(ঈশ্বর ঃ সাম্যবাদী)

নজরুলের আধ্যাত্মিক কবিতা এই বন্ধুর সঙ্গে প্রেমালাপের কবিতা, অনুরাগ-বিরাগ-বিরহ মিলনের কবিতা। বৈষ্ণবরা দেবতাকে প্রিয়-করেছেন, প্রিয়াকে করেছেন দেবতা। নজরুলের শেষ পর্যায়ের কবিতা এই প্রিয় দেবতার স্মরণে রচিত। নজরুলের প্রথম যৌবনের ভগবান 'রুদ্র'-কুরুক্ষেত্রের সারথি, উত্তর যৌবনে ভগবান প্রেমময়, বৃন্দাবনের বংশধারী। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেম-সম্পর্কের ইঙ্গিত বহু ধর্মেই আছে। পারস্যের সুফী-সাধক, কবি এবং বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রেমলীলার চরম প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের শেষ পর্যায়ের কবিতা বৈষ্ণবীয় ও শক্তিলীলার প্রকাশ কিছু নয়। তাঁর আরাধ্য পরম সুন্দর কখনো 'চির-জনমের প্রিয়া শক্তি- রূপিনী-রাঁধা বা পার্বতী, কখনো বা বৃন্দাবনের বংশী ধারী'। চিরজনমের প্রিয়ার উদ্দেশ্যে কবি যা বলেছেন, তাতে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে স্রষ্টারূপে।

নজরুলের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা শেষ পর্যন্ত সফল পরিণতিতে পৌছেনি। তিনি আজীবন বাস্তবতা ও অলৌকিকতা এই দুয়ের মধ্যে দোদুল্যমান ছিলেন। কবির একদিকে ছিল সুতীব্র জীবন-পিপাসা অন্যদিকে অত্যুচ্চ আদর্শবোধ। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে তিনি সর্বদাই জর্জরিত হয়েছেন। অত্যুচ্চ আদর্শ-বোধের জন্য বাস্তব জীবনের নোংরামি তিনি সইতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর পক্ষে পৃথিবী ও মানুষ্য ভুলে পরম সুন্দরের প্রেমে মগ্ন থাকা সম্ভব ছিল না। মাটির পৃথিবী, মাটির মানুষ তাকে বার বার ফিরিয়ে এনেছে সংগ্রামের মুখে। শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার উপর জয়ী হয়েছে মর্ত-প্রীতি।

সাম্যবাদী নজরুলঃ আতাউর রহমানের ভাষায়, 'লাঙ্গল' পত্রিকা নজরুল ইসলামের পরিচালনাধীন আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর। বিদ্রোহী কবি এই পত্রিকায় ঘোষণা করলেন,

গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান
গাহি সাম্যের গান।

নজরুল কাব্যের এই 'নবীনতর সুর' অবশ্যই সাম্যের সুর। নজরুলে 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কাব্যের ভাবসত্য মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির বহু লক্ষণ বহন করেছে। কাজেই 'সাম্যের গান' রচনার সময় নজরুলের মনে মার্কসীয় বা রুশীয় সাম্যবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরদের গান', 'কৃষাণের গান', 'রাজা-প্রজা', 'চোর-ডাকাত', 'কুলি-মজুর', 'ফরিয়াদ' প্রভৃতি কবিতা সমাজ ব্যবস্থার আর্থিক অসাম্যকে ভিত্তি করেই রচিত। এছাড়া অসংখ্য কবিতায় গানে, গদ্য রচনায়, নজরুল নির্বিত্ত ও নিঃস্ব শ্রেণীও দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারার্থে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাঁর কবিতা-গান ও গদ্য ভাষাকে অনেক ক্ষেত্রে মার্কসের 'সাম্যবাদী ইশ্‌তেহারের' প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। নজরুলের সাহিত্যের সর্বত্রই শ্রেণী সচেতনতা এবং সাম্যের চেতনা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন,

(আজ) চারদিকে হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত,
(ওভাই) জোঁকের মতন শুষছে রক্ত কাড়ছে থালার ভাত।
(মোর) বুকের কাছে মরছে খোকা, নাইক আমার হাত।
(আজ) সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল।
(কৃষাণের গান ঃ সর্বহারা)

অথবা

রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট- রক্ত ইটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি- ভিটে।
দিব্যি পেতেছে খল কল্‌ওলা মানুষ-পেষাণো কল,
আখ- পেশা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল।
(চোর-ডাকাতঃ সর্বহারা)

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বৃত্তি কাব্যাংশে কবি নগ্ন ভাষায় ধনিক বণিকদের শোষণ পদ্ধতির স্বরূপ তুলে ধরেছেন। সন্দেহ নেই যে, শ্রেণী সংগ্রামের মূল ভাব নজরুল কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে।

অবশ্য একথা সত্য যে, মার্কসবাদ তাঁর জীবন- দর্শন হয়ে ওঠেনি। মার্কস নির্দেশিত সামাজিক সমতা নজরুল মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্বের ফেলের কবিতা রচনা করেননি তিনি। সমাজ জীবনে সাম্য- স্বাধীনতা- উদারতা প্রতিষ্ঠাই ছিল নজরুলের জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য।

নজরুল- কাব্যের শাশ্বত ও সাময়িক মূল্যঃ আতাউর রহমানের মতে, নজরুল বিদ্রোহী, নজরুল সমাজ সচেতন। তাঁর রচনার বিরাট অংশ মানুষের সমাজ- সংগঠনের দিকে উন্মুখ। কিন্তু তাঁর এই সমাজ সচেতনতাকে আমরা অনেকক্ষেত্রে স্থূল অর্থে গ্রহণ করেছি। আমরা বলে থাকি,-- তিনি ভারতের স্বাধীনতার গান রচনা করেছেন তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, তিনি বিদেশী রাজ-শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। কাজেই তাঁর সাহিত্য-কর্ম সাময়িক। এবং আরো বলা হয় যে সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে নজরুলের বিদ্রোহ, তার অবসান ঘটলে, তাঁর কবি-কর্মের আবেদন শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু 'বিদ্রোহী'তেই কবি এই সাময়িকতাকে সার্থকতার সঙ্গে অতিক্রম করেছেন। সেখানে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন না, বাঙালী, ভারতবাসী বা মুসলমানের দুঃখ- দুর্দশার প্রতিকারার্থে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন না, নিখিলের নির্যাতিত মানুষের কাছে প্রতিশ্রুত হলেন। 'বিদ্রোহী'তে আঙ্গিকের মত কবির চিন্তাধারা সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত। 'বিদ্রোহী'তে জীবন-প্রীতি ব্যাপক। কবিসুলভ চেতনাই সেখানে প্রখর। সংগ্রামের উন্মুক্ত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও কবি ভোলেন না চপল মেয়ের ভালোবাসা, তাঁর, কাঁকন চুড়ির কন্ কন্, 'কুমারীর প্রথম পরশ', 'মরু নির্ঝর', 'শ্যামলিমা ছায়া' এবং 'পথিক কবির গভীর রাগিনী'। 'কামাল-পাশা'র মত সাময়িক কবিতাতেও লক্ষ্য করা যায় নজরুলের ব্যাপক জীবনানুভূতি।

সমকালীন সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও একটি স্থির প্রজ্ঞা নজরুলের দিকদর্শনে সাহায্য করেছে। তাই স্বাদেশিকতার উর্ধ্বে তিনি স্থাপন করেছেন সত্য, ন্যায় ও মানবতাকে। 'বিষের বাঁশী'র সুরে খেলাফত অসহযোগের বিক্ষোভ জ্বালা স্পষ্ট। কিন্তু ভারতবাসী তথা পৃথিবীর পরাধীন ও নির্যাতীত মানুষের বন্দীত্ব ও লাঞ্ছনার মধ্যে তিনি দেখেছেন মানবতা ও সত্যের অবমাননা,

> সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়
> নেই কি রে কেউ সত্য-সেবক বুক ফুলে আজ দাঁড়ায়।
>
> (সেবক- বিষের বাঁশী)

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা অর্থে নজরুল বুঝতেন মানুষের মর্যাদা, সমাজ ও ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ, সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মানুষের অন্তর বাহিরের পূর্ণমুক্তি। নজরুলের মুক্তি কামনার পিছে রয়েছে মানবতা ও নৈতিকতার প্রেরণা। তাই এর আবেদন বিশেষ দেশ, বিশেষ কালে সীমাবদ্ধ নয়। নজরুল ইসলামের স্বাধীনতা জাতির নয়, মানুষের এই স্বাধীনতার কামনা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ধারণ করতে পারে না। ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনা যখন বিদেশী বিতাড়ণ, পল্লী-উন্নয়ন, কুটির শিল্প সংগঠন, অস্পৃশ্যতা নিবারণে সীমাবদ্ধ, তখন নজরুল ইসলাম উচ্চারণ করেছেন বিপ্লবের রণ- যার উদ্দেশ্য মানুষকে সর্বপ্রকার প্রভূত্ব ও অধীনতা থেকে মুক্তি দেয়া। মার্কসীয় সাম্যবাদ, রুশীয় নিহিলিজম, নৈরাজ্যবাদ যা-ই ভাবি না কেন, নজরুল ইসলাম, স্বাধীনতার ধারণাকে প্রসারিত করেছেন, স্বাদেশিকতার স্থান এনেছেন উদার মানবতাবাদ ও সাম্যের চেতনা।

'অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী', 'ভাঙ্গার গান', প্রলয় শিখার প্রতিটি কবিতায় ও গানে সমকালীন চেতনার সঙ্গে সঙ্গে দেশকাল নিরপেক্ষ একটি সত্য-সুন্দর জীবনের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। বিষের বাঁশীর 'তূর্য্য-নিনাদ', 'উদ্বোধন', 'আত্মশক্তি', 'বন্দী-বন্দনা', 'শিকল পরার গান,' 'যুগান্তরের গান' মূলতঃ মুমূর্ষু মানুষের উদ্বুদ্ধ চেতনার উদাত্ত সংগীত। এর সবগুলিই 'সত্য-মন্ত্র' সবগুলিই 'অভয়-মন্ত্র' । যে 'প্রলয় শিখার' কল্পনা কবির চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছে তা বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের ক্রোধবহ্নিজাত শুধু পরাধীন দেশের বেদনাজাত নয়।

নজরুল- মানস সর্বদাই একটা দ্বন্দ্ব- সংঘাতের ভিতর দিয়ে চলছে। এই সংঘাত থেকে যে বেদনা ও বিক্ষোভ জন্ম নিয়েছে, তা কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করেছে। তাই ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে এবং ভারতীয় পুরাণ- প্রতীকে সংকেতিত 'সব্যসাচী', 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী', 'সত্য কবি', 'ইন্দ্র-পতন' 'পথের দিশা' সার্বজনীন জীবন সত্যকে ব্যক্ত করেছে। নজরুলের এই মনন ও দর্শন সমাজ-জীবনের তথা ইতিহাসের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

নজরুলের কবিতা সর্বদাই স্বাধীনতা ও সাম্যের আবেদনে উচ্ছল। মানব-স্বভাব, মানবেতিহাস ও সমাজ-বিধানের কতকগুলো এমন স্ব-বিরোধীতা অসংগতির উল্লেখ তিনি করেছেন, যা প্রাকৃতিক নিয়মের মতো প্রায় অপরিবর্তনীয়।

মানুষেরে ঘৃণা করি,
ও' কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি। ---
পূজিছে গ্রন্থ ভন্ডের দল। মুর্খেরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো
(মানুষ ঃ সর্বহারা)

অথবা

যে যত ভন্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।
(ফরিয়াদ ঃ সর্বহারা)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের কবিতাকে রাজনৈতিক জ্ঞানের মানদন্ডে বিচার করা সম্ভব নয়। মানব-স্বভাবের সঙ্গে সে কবিতার যোগ নিবিড় বলেই তা সফল ও সমাদৃত। মানুষের আদিম হৃদয়াবেগ, আর আকাংখা বিদ্রোহ-বিক্ষোভ গাঢ় হয়ে, গভীর হয়ে ধরা পড়েছে বলেই নজরুলের কবিতা যুগ-চেতনা তথা দেশ-কালের প্রভাবকে স্বীকার করেও কালোত্তীর্ণ হওয়ার গুণ অর্জন করেছে। রাজনৈতিক জ্ঞান ও সামাজিক অভিজ্ঞতাকে নজরুল যান্ত্রিকভাবে কাব্যে প্রয়োগ করেননি। কবির মতো উপলব্ধি করে তাকে রসাত্মক করে তুলেছেন। অত্যাধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক কবিতার সঙ্গে নজরুলের পার্থক্য এখানেই।

সমাজ-সংক্রান্ত কবিতায় নজরুল সীমাবদ্ধ নয়। মানব জীবনের বৈচিত্র্যকে তিনি স্বীকার করেছেন, আর স্বীকার করেছেন, মানুষের মহৎ ঐতিহ্যকে। প্রেম ও প্রকৃতি নিয়ে তিনি বহু কবিতা, গান রচনা করেছেন, যার আবেদন সর্বকালে অব্যাহত থাকবে। তাঁর প্রেমের গানে মানুষের অপরিবর্তনীয় হৃদয়াবেগের জোয়ার- ভাটা খেলা নানা সুরে, নানা রাগে, নানা স্পন্দে স্পন্দিত। কবিতার বিষয় ও দর্শন ছাড়াও, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নজরুল সার্বজনীন ও হৃদয়বেদ্য হয়েছেন। তাঁর লেখায় হৃদয়াবেগের প্রাবল্য স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ ও ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। সুমিত ছন্দ ও সংগীত নজরুল-কাব্যতে শ্রুতিমধুর ও হৃদয়স্পর্শী করেছে। তাই তাঁর অনেক কবিতা ও গান বিষয় এবং বক্তব্যের দিক থেকে গতানুগতিক হয়েও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নজরুল কাব্যের ভাব-প্রবাহ- ১ম তরঙ্গঃ আতাউর রহমান তাঁর 'কবি নজরুল' গ্রন্থে নজরুল-কাব্যের ভাব-প্রভাব ১ম তরঙ্গতে আলোচনা করেছেন অগ্নিবীণা- বিষের বাঁশী- দোলনচাঁপা-ছায়ানট-চিত্তনামা- ভাঙ্গার গান- পূর্বের হাওয়া কাব্য গ্রন্থের।

নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অকটোবর মাসে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি নজরুল প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর মৌলিক কাব্য- প্রতিভা এবং সমগ্র জীবনের ভবিষ্যৎ এ কাব্যে আভাষিত হয়েছিল। প্রতিভার শক্তিতে কবি নিজস্বপথ সৃষ্ট করে নিয়েছিলেন। বাংলা কবিতার কোমল রূপ, ললিত সুরের চিরাচরিত ধারায় 'ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার' নিনাদিত হল তাঁর কণ্ঠে।

নবযুগের নবজাগ্রত মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনায় অনুপ্রাণীত কবি যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তারই ফসল 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙ্গার গান', 'প্রলয় শিখা', 'সর্বহারা'। বিদ্রোহ অন্যায় রাজশক্তির বিরুদ্ধে, অন্যায় বিশ্ব-বিধানের বিরুদ্ধে, অন্যায় সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সর্বপ্রকার বন্ধন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর অভিযান চলবে অশেষকাল পর্যন্ত- এই ইঙ্গিতই করে অগ্নিবীণা- বিষের বাঁশী। এ বিদ্রোহ আজকের হয়েও সর্বযুগের, এক দেশের হয়েও সর্বদেশের।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গসহ 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বর ধারিণী মা', 'আগমনী', 'ধুমকেতু', 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'রণ-ভেরী', 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবাণী', 'মোহররম', এই তেরটি কবিতার সংকলন অগ্নিবীণা।

অগ্নিবীণায় সমকালীন ঘটনার ছায়া অস্পষ্ট। বিষের বাঁশীতে সমকালীন ঘটনার ছায়া প্রবল ও প্রত্যক্ষ। সমকালীন প্রভাব সত্ত্বেও 'চরকার গান', 'জাতের বজ্জাতি', 'যুগান্তরের গান', 'বন্দীবন্দনা', 'শিকল পরার গান', 'মরণ-বরণ' 'সত্য-মন্ত্র', 'বোধন' প্রভৃতি কবিতায় কবিকণ্ঠে বার বার উচ্চারিত হয়েছে অপরাজেয় আশাবাদ, বীর-বাণী এবং সত্যের বরাভয়। 'বোধন' হাফিজের অনুবাদ, জাগৃহি সংস্কৃতি তোটক ছন্দে বাঁধা।

দোলন-চাঁপার প্রকাশ কাল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। এই সময় রাজদ্রোহের অপরাধে কবি বন্দী। এ গ্রন্থে বিশটি কবিতা রয়েছে। লেখক বেশ কয়েকটি কবিতার আলোচনা করেছেন।

'বিজয়নী' শীর্ষক গানটিসহ ১৯২৫ খ্রষ্টাব্দে গীতি কবিতার সংকলন ছায়ানট প্রকাশিত হলো। ছায়ানট প্রেমের কবিতা ও প্রেমের গাণের সঞ্চয়ন। কুমিল্লার দৌলতপুর গ্রামে প্রথম পরিনীতা স্ত্রী কবির জীবনে যে আলোড়ন ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল, ছায়ানটে আছে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব। এই সংকলনের অনেকগুলো কবিতা দৌলতপুরে রচিত।

১৯২৫ খ্রষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর উপলক্ষে নজরুল পরপর কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। এগুলোর সমষ্টি 'চিত্তনামা' নামে প্রকাশিত হয়। চিত্তনামার কবিতাগুলো দেশবন্ধুর ঔদার্য, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সাহস ও মানবপ্রেমের প্রশংসায় কবির ভাষা ও ছন্দ কোন সীমা মানেনি।

'ভাঙার গান', 'অগ্নি-বীণা' ও 'বিষের বাঁশী'র সমগোত্রীয় বিদ্রোহাত্মক গানের সঙ্গে কয়েকটি বিদ্রুপাত্মক গানও এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।' এই গ্রন্থের 'দুঃশাসনের রক্তপান', কবিতাটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। লেখক কবিতাটির বিষদ আলোচনা করেছেন। 'দোলন- চাঁপা' ও 'ছায়ানটে'র সুরে বাঁধা 'পুরের হাওয়া' । এর প্রথম সংস্করণে বারোটি গীতি কবিতা সংকলিত হয়েছে। পূর্বের হাওয়া বর্ষণ-মুখরিত বিরহ- বিধুর দিনের গান।

নজরুল কাব্যের ভাব-প্রবাহ- ২য় তরঙ্গতে লেখক আলোচনা করেছেন 'সর্বহারা' 'ফণি-মনসা', 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থের।

'অগ্নি-বীণা' থেকে 'ভাঙ্গার গান' পর্যন্ত নজরুলের রাজনৈতিক চেতনা একটি মুক্তি কামনায় উন্মুক্ত। এই পর্যায়ে কবি জাতীয়-স্বাধীনতার প্রবক্তা। পরবর্তীতে অধ্যয়ন, মনন ও অভিজ্ঞতায়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের সন্ত্রাসবাদী মনোভাব ধীরে ধীরে সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর রচনায় শ্রেণী চেতনা ফুটে উঠে।

'সর্বহারার' সমাজ-চেতনা বহুদিকে প্রসারিত। এখানে নজরুল যে সাম্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবতা ও সুবিচারের এষনায় তীক্ষ্ম, তীব্র, উজ্জ্বল। এখানে তাঁর কল্পনা কখনো ধর্মীয় উদারতা, কখনো সাম্যবাদ, কখনো-স্বাধীনতা, কখনো মানবতা, কখনো নৈরাজ্যবাদকে স্পর্শ করেছে। সমাজ-বিধানের অসঙ্গতি, স্ববিরোধিতা জাতি-ভেদ, শ্রেণী-বৈষম্য, ধর্মান্ধতা প্রভৃতি সর্বপ্রকারের অসাম্যবোধকে কবি কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন।

নজরুল কাব্যের এই পর্যায় থেকে উচ্ছ্বাস হ্রাস পেতে থাকে। এর ফলে তাঁর কবিতার আঙ্গিকেও পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রথম পর্যায়ে কঠিন শব্দ, সমাসবদ্ধ, সন্ধিবদ্ধ্য পদের ব্যবহারের যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, সর্বহারার যুগে এসে তার পরিবর্তন ঘটেছে। এই যুগ থেকে ভাষা সহজ হয়েছে, অনুপ্রাসের ব্যবহার কমে গেছে, অবশ্য আরবী-পার্শী শব্দের প্রয়োগ প্রয়োজনবোধে সর্বদাই বহুল পরিমাণে করেছেন তিনি। 'ফনি-মনসার' স্মরণীয় কবিতাগুলোর মুলে আছে সাময়িকতার প্রেরণা। 'ফনি মনসা' কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'প্রবর্তকের ঘুর- চাকায়', 'দীপান্তরের বন্দিনী', 'দীল-দরদী', 'সত্য-কবি', 'সব্য সাচী' 'পথের দিশা ও 'সাবধানী ঘন্টা'।

'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্য-গ্রন্থের মূল ভাব-প্রেম-বিরহ। এই গ্রন্থের 'সিন্ধু' 'দারিদ্র', 'অনামিকা' - কবিতাত্রয় নজরুল কাব্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বিশেষভাবে 'অনামিকা'য় রোমান্টিক কবি-মানসের চির অতৃপ্ত তৃষ্ণার প্রকাশ চিরকালের জন্য স্থায়ী হয়ে থাকবে। এই সব কবিতায় নজরুলের প্রচার-মূলক মনোবৃত্তি প্রকাশ ঘটেনি, ঘটেছে নিবিষ্ট জীবন- সমীক্ষার প্রকাশ। সমাজ ও কালের ঊর্ধ্বে চিরন্তন মানব-জীবন-রহস্যকে উপলব্ধি করার কিছু প্রয়াস এখানে উল্লেখযোগ্য। সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে অনামিকা ও দারিদ্র্য গঠনকর্মে নিটোল। উপলব্ধি ও উক্তির এমন সফল সাযুজ্য নজরুল কাব্যে কমই লক্ষ্য করা যায়।

নজরুল কাব্যের ভাবপ্রবাহ ১ম ও ২য় তরঙ্গে রয়েছে কয়েকটি ভালো কবিতার উদ্বৃতিবহুল রসগ্রাহী আলোচনা। লেখক আতাউর রহমান এ গ্রন্থে তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির ব্যাপকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সার্বিক আলোচনায় আতাউর রহমান,

> রবীন্দ্রনাথের পর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো নজরুল থেকে। নজরুল সাহিত্য সাধনার মূলে প্রেরণা দান করেছে সমাজ বিপ্লবের এষণা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছেন প্রার্থনার ভাষা নজরুল দিয়েছেন প্রতিবাদের ভাষা। স্বদেশী নেতারা নিবিত্ত নিঃস্ব জনসাধারণের উপকার করার প্রয়াসী, নজরুল তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী। তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন ও অধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

লেখক আরো বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের কবিতাকে রাজনৈতিক মানদন্ডে বিচার করা সম্ভব নয়। মানব- স্বভাবের সঙ্গে সে কবিতার যোগ নিবিড় বলেই তা সফল ও সমৃদ্দত। কেননা, No political or social doctrin can make much headway in the minds of a people unless it is constantly reinfused with passion and imagination. মানুষের আদিম হৃদয়াবেগ, আশা, আকাংখা বিদ্রোহ-বিক্ষোভ গাঢ় হয়ে, গভীর হয়ে ধরা পড়েছে বলেই নজরুলের কবিতা যুগ-চেতনা তথা দেশকালের প্রভাবকে স্বীকার করেও কালোত্তীর্ণ হওয়ার গুন অর্জন করেছে। রাজনৈতিক জ্ঞান ও সামাজিক অভিজ্ঞতাকে নজরুল যান্ত্রিকভাবে কাব্যে প্রয়োগ করেননি। কবির মতো উপলব্ধি করে তাকে রসাত্মক করে তুলেছেন। অত্যাধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক কবিতার সঙ্গে নজরুলের পার্থক্য এখানেই।

আতাউর রহমান রচিত 'কবি নজরুল' গ্রন্থে নজরুল কাব্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধকারে আলোচনা রয়েছে। আবার নজরুল কাব্যে ভাবপ্রবাহ ১ম ও ২য় তরঙ্গ নামে বিভিন্ন কবিতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি নজরুলের মন-মননের রূপ প্রকটনেও প্রয়াসী হয়েছেন। লেখক সতেরটি প্রবন্ধ নিয়ে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটির ব্যাপক আলোচনার মধ্যে লেখক প্রেম ও রোমান্টিকতা এবং প্রেম ও নারী তথা মানুষের কাম-প্রেম প্রকৃতি সম্বন্ধে, উদ্বৃতি-বহুল আলোচনয় অকুণ্ঠ। বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি নজরুলকে আবিস্কার করার প্রয়াস পেয়েছেন বিশেষতঃ নজরুল কি নৈরাজ্যবাদী বা সাম্যবাদী সে প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজেছেন তিনি। একটি উপনিবেশের কবি হয়েও যে নজরুল স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিলেন তা আতাউর রহমানের আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

শাহাবুদ্দীন আহমেদের নজরুল সাহিত্যের পর্যালোচনা

শাহাবুদ্দীন আহমদ রচিত গ্রন্থ চারখানা (১) শব্দ ধাণুকী নজরুল ইসলাম (১৯৭০), (২) নজরুল সাহিত্য বিচার (১৯৭৬), (৩) ইসলাম ও নজরুল ইসলাম (১৯৭৬) এবং (৪) নজরুল সাহিত্য দর্শন।

শাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর 'শব্দ ধাণুকী- নজরুল ইসলাম' (১৯৭০) গ্রন্থে নজরুলের কাব্যে শব্দ ব্যবহার এবং পাশাপাশি সমসাময়িক কালের কবিদের শব্দের ব্যবহার ও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। নজরুলের কাব্যে শব্দ শুধু শব্দ Word নয়, শব্দ হলো শব্দ Sound , শব্দ হল শব্দ গান, শব্দ হল চিত্র এবং শব্দ হল শিল্প।

আলোচনার সুবিধার্থে লেখক বইটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। এর প্রথম ভাগঃ কাব্যে শব্দের গুরুত্ব কতটা এবং সেই সঙ্গে নজরুল কাব্যে শব্দ- প্রয়োগচাতুর্থ কতটা তারই আলোচনা। ২য় ভাগঃ নজরুলের শব্দৈশ্বর্যের মোটামুটি একটি পরিমাণ নির্দেশ।

কাব্যে শব্দের গুরুত্বঃ শাহাবুদ্দীন আহমেদের মতে, শব্দের দৈন্য কবিতাকে একঘেঁয়ে করে, রুগ্ন করে এবং শব্দেরই অভাবে লেখককে অনেক সময় অব্যক্ত ভাব প্রকাশে ব্যর্থ হতে হয়। তাই দেখা যায় যিনি যত বড় কবি এবং সেই সঙ্গে কুশলী শিল্পী তাঁর শব্দ সম্ভার তত বেশী এবং বলা যেতে পারে মহাকবির কুললক্ষণ হল তাঁর শব্দকোষ। যে কবির ভান্ডারে শব্দের পরিমাণ যত বেশী ভাব প্রকাশে তিনি তত বেশী স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং সবল। যদিও পৃথকভাবে শব্দ জড়পিন্ডমাত্র, তবু উল্লিখিত কারণে প্রতীচ্যের একজন নামজাদা কবি বলেছেন, শব্দই কবিতা।

কবিতায় শব্দের এবং প্রতিশব্দের প্রয়োজন হয়। তার কারণ কবিতা রূপ, ছন্দ, মিল, অনুপ্রাস, সুর এবং ধ্বনির প্রত্যাশী। কবিকে তাই শব্দ প্রতীকের মাধ্যমেই অপরুপের পূজা করতে হয়। এই জন্য কবিকে শুধু বহু ব্যবহৃত শব্দের উপর নির্ভর করলে চলে না। সন্ধানী হতে হয়, পরশ্রমী হতে হয়, প্রয়োজন হলে যেমন তাকে নতুন করে শব্দ গড়ে নিতে হয়, যেমন মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তেমনি দরকার হলে নতুন শব্দ আমদানী করতে হয়।

নজরুল ইসলামের কবিতায় শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে এই কথাগুলো বলার আবশ্যক হল এই জন্য যে তাঁর কবিতার একটা মস্ত মূলধন তাঁর শব্দ। বাঙলা সাহিত্যে প্রচলিত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেনই উপরন্ত তাঁর অনিরুদ্ধ আবেগ প্রকাশের জন্য প্রচলিত অপ্রচলিত দেশী এবং বিদেশী উপভয়প্রকার শব্দ তিনি নিঃসংকোচে ব্যবহার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত নজরুল ইসলাম তাঁর লেখায় যে পরিমাণ বিদেশাগত শব্দ ব্যবহার করেছেন এমন বোধ হয় বাঙলা দেশের আর কোন কবি সাহিত্যিক করেননি। আর নজরুলের কাছে এগুলো ছিল এমন স্বাভাবিক যে এজন্য তাঁকে কোথাও আমরা হাঁপাতে দেখি না।

মধুসূদন দত্ত ও নজরুল ইসলাম ঃ শাহাবুদ্দীন আহমেদের ভাষায়, বাংলা সাহিত্যে বিদেশী শব্দ আমদানী করার অসাধ্য সাধন করেছেন মধুসূদন দত্ত। নজরুল কাব্যে ও এর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত সংস্কৃত শব্দগুলো তমসাময় হবে জেনেও মধুসূদন কোনো পাঠকের মুখাপেক্ষী হননি। তাঁর কাছে পাঠকের দাবীর চেয়ে বড় ছিল সাহিত্যের দাবী, শিল্পের দাবী। মধুসূদনের সামনে ছিল একমাত্র সুশিক্ষিত এবং সাহিত্যবোধ সম্পন্ন পাঠক আর নজরুল ইসলামের সামনে ছিল আপামর জনসাধারণ। শব্দ চয়নে নজরুল ইসলাম তাই প্রতিটি অর্গল, প্রতিটি বাতায়ন খুলে দিলেন সকল দিকের বাতাসের অবাধ আগমণের জন্য। এমন এক সর্বজননিন্দিত ভাষা নির্মিত হল তা দিয়ে যাতে যে কোন ভাব ভাবনা, ইচ্ছা-এষণা, দুঃখ- বেদনা, আনন্দ- উল্লাস, বিক্ষোভ- বিদ্রোহ- অনায়াসে মুক্তি পেতে পারে এবং অনায়াসে শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের মনের আবেগ দোলা দিতে পারে।

উভয়ের মধ্যে মিল ছিল ব্যক্তি সত্তার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের, মিল ছিল অর্ন্তগূঢ় আচার-আচরণের মিল ছিল বিদ্রোহী স্বভাবের, মিল ছিল সাহসের, তেজের, বীর্যের, আত্মমর্যদার। কেবল মিল ছিল না কাব্যকলা সম্বন্ধে উভয়ের ধারণার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নজরুল ইসলামঃ রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের কাব্যে শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ 'শ্যেনবিহঙ্গ বুঝে ভুজঙ্গসনে' এবং 'মত্ত', 'রক্ত', 'গরজন' শব্দ ব্যবহার করা সত্তেও যুদ্ধের তীব্র, হিংস্র, ভয়ঙ্করের রূপটাকে যথাযথ ভাবে ফোটাতে পারেননি। পারেননি যে সেটা রবি-নজরুলের কবিতা দ্বয়ের দুটি লাইন পাশাপাশি তুলে ধরলে বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের "জয় গুরুজীর', হাঁকে শিখবীর সুগভীর নিস্বনে
মত্ত মোগল রক্ত পাগল 'দীন্ দীন্' গরজনে" এবং

নজরুল ইসলামে,
"তবু শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ গমকে শিরায় গমগম
ভয়ে রক্ত-পাগল প্রেত পিশাচেরও শির-দাঁড়া করে চন্-চন্

এর মধ্যে রক্ত-পাগল শব্দটি কমন, ওটা রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে পরে নজরুলের হাতে। কিন্তু নজরুলের হাতে শব্দটি যেন নেচে উঠেছে। অতএব নজরুলের ব্যবহৃত শব্দ ঠিক যে ইমেজটা গড়ে তোলে রবীন্দ্রনাথের শব্দ বিন্যাসে সে ইমেজ গড়ে ওঠেনি। এই মন্তব্যে লেখক রবীন্দ্রনাথকে অসামান্য কবি মনে করেননি। তিনি শুধু দেখাতে চেয়েছেন যে Honest anger বাঙলা সাহিত্যে নজরুলের অতুলনীয় দান।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, ও নজরুল ইসলাম: শাহাবুদ্দীন আহমেদের মতে, অনেকে বলেন বিদেশী শব্দ ব্যবহারে নজরুল ইসলাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মোহিতলাল মজুমদারের অনুসারী। কিন্তু বিদেশী শব্দ ব্যবহারে নজরুল ইসলামের প্রয়োগ-কৌশল মোহিতলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের মত নয়। ঐ শব্দসমুহ ব্যবহারে মোহিতলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ যতটা কৃত্রিম ভাবাশ্রয়ী ছিলেন নজরুল তা ছিলেন না। বিষয়ের সঙ্গে পরিচয়ে, রূপ সৃষ্টির অনন্যতায়, অনুভূতির তীব্রতায়, বাস্তবের সংরাগে এবং প্রত্যক্ষ নিবিড় অভিজ্ঞতার আত্মা নিঙরানো নির্যাসে নজরুল পূর্বসূরীদের অনেক দূরে ফেলে এসেছেন।

বলা বাহুল্য বিলম্বিত লয়ের মাত্রাবৃত্তের এবং কখনও কখনও লাফিয়ে চলা স্বরবৃত্তের কাঁধে চড়ে বেশীর ভাগই বেড়ানোর অভ্যাস নজরুল ইসলামের। কিন্তু এ মাত্রাবৃত্ত কিংবা স্বরবৃত্তের কোনোটা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অথবা মোহিতলাল মজুমদারের আবিস্কৃত ব্যবহৃত ছন্দ নয়। নজরুল ইসলাম আবেগ বলীয়ান স্বভাবের, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে তীব্র গতিশীল তুরঙ্গে পরিণত করতে হয়েছে ঐ একই ছন্দকে। বস্তুত নজরুলের ভাষার জন্যে নজরুলের স্বভাবই দায়ী। কন্তি তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি বরং লাভ হয়েছে, বাঙলা কাব্যে ফাষ্ট মিউজিক ছিল না; যার জন্য ক্রোধ, উত্তেজনা, উচ্ছাস প্রাণচাঞ্চল্য এবং প্রমত্ত আনন্দের যথাযথ প্রকাশ বাঙলায় সম্ভবত সম্ভব হত না। নজরুলই প্রথম কবিতায় ঐ ফার্ষ্ট মিউজিক এনে প্রবেশ করালেন। মস্ত উদাহরণ, 'অগ্নি-বীণার' 'কামাল পাশা' কবিতাটি। লেখক তাঁর শব্দ ধাণুকীতে নজরুল ইসলামের কবিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং গোলাম মোস্তাফার কবিতার চেয়ে চিত্তাকর্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। তার কারণ চেতনার নির্ভুল সংস্থাপন, আবেগের অকম্পন নির্মান। প্রসংগত আরো একটি কথা বলা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অথবা গোলাম মোস্তফার কবিতার সঙ্গে নজরুল ইসলামের কবিতার আকৃতিগত সাদৃশ্য পুরোপুরি নেই। নজরুল ইসলাম এই দুই কবির চেয়ে শব্দ ব্যবহারে ও ছন্দনির্মাণে অনেক বেশী সচেতন কুশলী শিল্পী।

কেবল আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারেই নজরুল ইসলামের কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ নয়। তদ্ভব, তৎসম এবং দেশী শব্দগুলো ও যেন তিনিই প্রথম আমাদের ব্যবহার করতে শেখালেন। বস্তত মধুসূদনের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দকে তিনি যেমন ছোননি তেমনি রবীন্দ্র রীতিকেও, এবং রবীন্দ্র রীতি অনুসরণ করে এক ধরণের কাব্য করার যে রোগ চেপেছিল সেদিনের বঙ্গ কবিচিত্তে নজরুলই প্রথম সারিয়ে তুললেন তা ঘরোয়া শব্দের ব্যবহারে।

শাহাবুদ্দীন আহমদ এর মতে সতেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে শুরু করে আমাদের সর্বাধুনিক সকল কবিদের থেকে নজরুলই অধিক মাত্রায় আরবী- ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, তাঁর সমস্ত কাব্য জরীপ করলে প্রমাণিত হবে যে তৎসম ও তদ্ভব শব্দই তিনি অধিক পরিমানে ব্যবহারে করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'নজরুল সাহিত্য বিচার' (১৯৭৬) মূলত প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ। এতে রয়েছে নজরুল ও নজরুল সাহিত্য সম্বন্ধে পঁচিশটি প্রবন্ধঃ 'নজরুল চর্চা', 'নজরুলের চিঠির ভাষা', 'নজরুল ইসলামের গদ্য', 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও কাজী নজরুল ইসলাম', 'নজরুল ইসলাম ও বুদ্ধদেব বসু', 'নজরুলের বিদ্রোহী ও মোহিতলালের 'আমি', 'নজরুলের গান', 'মৃত্যুক্ষধা', 'যুদ্ধ কবিতা', 'যতি নয় জিজ্ঞাসাঃ পাঠকের জিজ্ঞাসা', 'নজরুল মানস', 'বাঁধন হারা', 'মোসাহেব সমালোচক ও নজরুল ইসলাম' 'অনুবাদক নজরুল', 'নজরুল সাহিত্য বিচার' প্রভৃতি।

এ গ্রন্থের ভূমিকাতেই লেখক নজরুল সম্পর্কে কেন লেখেন, বন্ধুদের এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন-

> তাঁদের কাছে অপচয় আর আমার কাছে অপচয় নয় বলে, নজরুল সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে সব আলোচনা হয়েছে সে-সব আলোচনায় আমি সন্তুষ্ট নই বলে, নজরুল সম্বন্ধে আমি যা জানি সে জানা অন্যে জানে না বলে, আমার জানার কথা আমার প্রকাশ না করে যাওয়া আমার কাছে অপরাধ বলে এবং সর্বশেষে বাংলা সাহিত্যের তুলনায় তাঁর প্রতিভাকে আমি অভ্রংলিহ বলে মনে করি বলে। তাঁর (নজরুলের) মনুষ্যত্বের যে তুলনা নেই সে-কথা বলা বাহুল্য; এবং তাঁর সাহিত্য প্রতিভা ও সংগীত প্রতিভা অসামান্য।

প্রথম প্রবন্ধ 'নজরুল চর্চাঃ দেশে বিদেশে'তে রয়েছে নজরুল সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকারদের স্বমন্তব্য উল্লেখ। লেখকের মতে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের ভাগ্যে অনেক সময় উপেক্ষা অবহেলা এমন কি আক্রমণের আঘাত জুটেছে কিন্তু নজরুলের বেলায় তার রূপ সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। লেখকের মতে তা ছিল নজরুল শুধু সাহিত্যের জন্যে সাহিত্য করেননি এক লক্ষ্যভেদী উদ্দেশ্যমূলক মহৎ ভাবনা প্রণোদিত সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন- যা ভিতরে ছিল সমাজ, দেশ ও কালের সমস্ত কপটতা, ভন্ডামী, অন্যায়, অসাম্য এবং দুরপনেয় অত্যাচার অবিচারের দুর্ভেদ্য দেয়াল চূর্ণ করার গ্রানাইট।

লেখক নজরুলের লেখা ছাপানোর জন্যে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ধন্যবাদ জানিয়েছেন 'বসন্ত' নাটক নজরুলকে উৎসর্গ করার জন্য রবীন্দ্রনাথকেও। এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাসের মতামত। মোদ্দাকথা আলোচিত হয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে নজরুল চর্চার বিশদ আলোচনা।

তাছাড়া নজরুলের কবিতা রুশ, জার্মানী, ইংরেজী, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি ভাষায় এবং উর্দু, ইরানী, আরবী, তুর্কী ভাষাতে অনুদিত হয়েছে।

নজরুলের চিঠির ভাষা প্রবন্ধে চিঠির ভাষায় শব্দ প্রয়োগের ও ভঙ্গির উদ্বৃতিবহুল তারিফ রয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক কবিতার বৈশিষ্ট্য স্বরূপ কয়েকটি জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) একটি চটুল ভঙ্গি (২) আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার (৩) ধনাত্মক শব্দ, (৪) ইংরেজী শব্দের ব্যবহার (৫) পুরাণ প্রয়োগ।

Dhaka University Institutional Repository

এ সব ছাড়াও ওর মধ্যে একটি তোড়ের সৃষ্টি হয়েছে- একটি নিবার্ধ গতির, একটি স্রোততাড়িত বেগের। ইতিপূর্বে ঠিক এ ধরনের বেগবান ভাষা বাংলা সাহিতে দেখা যায়নি।

চিঠির ভাষা প্রবন্ধে লেখক আরো দেখিয়েছেন, নজরুলের কাব্যে ব্যবহৃত অনুপ্রাস, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার সুন্দর ব্যবহার।

'নজরুল ইসলামের গদ্য' প্রবন্ধে ও রয়েছে আরবী-ফারসী শব্দের সুপ্রয়োগের প্রশংসা এবং আবেগ বহুল গদ্যশৈলীর সৌন্দর্য মুগ্ধতা।

'বাংলা জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধে লেখক যথার্থই বলেছেন 'হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ঐক্যসাধনের শ্রেষ্ঠতম ভূমিকা হল নজরুল ইসলামের'। জাতীয়তাবাদী কবি বলতে লেখক বলেছেন, রেনেসাঁসের যুগের কোন শিল্পী- সাহিত্যিকই গ্রীক- পুরাণকে বর্জন করেননি। তার নতুন অর্থ দান করেছিলেন। একইভাবে নজরুল ইসলাম ও সেই ভূমিকা পালন করেছেন। এই নব চেতনা বাঙালী হিসেবে বাঙালীকে দান করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বাঙালী জাতির কবি। এবং ঐক্যবদ্ধভাবে প্রকৃত বাঙালী সংস্কৃতির উদ্বোধন ঘটিয়ে, শ্রেণী বৈষম্যের কাঠামো ভেঙে জাতিগত বৈষম্যের অহংকারের দেয়াল চূর্ণ করে একটি উদার, সাহসী এবং প্রগতিশীল জাতি সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে তাঁকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের কবি বলা যায়। অন্য যে কোন কারণ অযৌক্তিক কেননা নজরুল কবি হিসেবে ধর্ম বর্ণ-জাতির উর্ধ্বে। তাঁর মৌল আদর্শ সৌন্দর্য একমাত্র সৌন্দর্য।

'নজরুল ইসলাম ও বুদ্ধদেব বসু' প্রবন্ধে নজরুল সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর একটি নির্দেশক বা নিন্দাজ্ঞাপক মন্তব্য সম্পর্কে ক্ষুব্ধ শাহাবুদ্দীন বলেছেন 'বুদ্ধদেব বসু নজরুল সম্পর্কে যে সব উক্তি করেছেন তা অনেকখানি অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক। তাঁর অব্যবস্থিত চিত্তের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে অনির্ভরযোগ্য।'

- এভাবে মোটা বইয়ের পঁচিশটি প্রবেন্ধই লেখক নজরুলের কৃতির কীর্তির সমর্থনে, বিরূপ সমালোচকের মত-মন্তব্যের প্রতিবাদে মুখর।

শাহাবুদ্দীন রচিত আর দুটো গ্রন্থ 'ইসলাম ও নজরুল ইসলাম' এবং 'নজরুল সাহিত্যে দর্শন', আলোচনায় লেখক নজরুল ইসলামকে 'অসামান্য প্রতিভা' রূপে অভিহিত করেছেন।

শাহাবুদ্দীন আহমদের 'শব্দ ধানুকী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে লেখক ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছেন,

> নজরুলর কবিতার শব্দ শুধু শব্দ Word নয়, শব্দ হল শব্দ Sound শব্দ হল গান, শব্দ হল চিন্তা, শব্দ হল চিত্র, শব্দ হল শিল্প।

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রন্থে লেখক নজরুলের আরবী-ফারসী শব্দের সুপ্রয়োগ দেখিয়েছেন। পাশাপাশি রয়েছে অন্যান্য লেখকদেরও শব্দ প্রয়োগ। শেষ পরিচ্ছেদে নজরুলের তদ্‌ভব ও দেশী শব্দের শব্দ প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। 'নজরুল সাহিত্য বিচার' গ্রন্থে পঁচিশটি প্রবন্ধ রয়েছে। তার মধ্যেও নজরুলের শব্দের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধে হিন্দু মুসলামনের ঐক্য সাধনের কথা বলা হয়েছে।

'ইসলাম ও নজরুল ইসলাম' এবং 'নজরুল সাহিত্য দর্শনে' তেমন কোন নতুন তত্ত্ব নেই। তবে লেখকের রচনায় নজরুলের অসামান্য প্রতিভার সুস্পষ্ট প্রয়োগ রয়েছে।

শাহাবুদ্দীন আহমদের নজরুল সাহিত্যের সার্বিক মূল্যায়ণ,

> নজরুল ইসলাম সমাজ বিপ্লবে রবীন্দ্রনাথের পথও অনুসরণ করেননি। কারণ রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পরে ঘৃণাভরে নাইট উপাধি ত্যাগ করলেও এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরোক্ষ ঘৃণা প্রকাশ করলেও তিনি প্রকাশ্য রাজবিদ্রোহের ভূমিকা কখনও গ্রহণ করেননি। কিংবা শোষক শ্রেণীর হাত থেকে সর্বহারা শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তির পথও তিনি বাতলে দেননি। তাঁর কবিতায় আমরা ঠিক এই ধরনের বক্তব্য পাই না। "প্রার্থনা করি, যারা কেড়ে যায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস/ যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।" কিংবা "তুমি শুয়ে রবে তেতালার পরে আমরা রহিব নিচে/ অথচ তোমারে দেবতা বলিব সে ভরসা আজ মিছে।--- তারি পদরজ অঙ্করি করি মাথায় লইব তুলি। সকলের সাথে পথে নামি যার পায়ে লাগাইয়াছে ধূলি।" বাংলা সাহিত্যে নজরুলের ভূমিকা যোদ্ধার, সংগ্রামীর, বীরের, উৎপীড়ক রাজার উৎখাতকারী রাজবিদ্রোহীর ও শিল্প-বিপ্লবীর। এদিক থেকে তাঁর সমোত্রের লেখক ও কবি গোর্কি, মায়াকোভস্কি, নাজিম হিকমত কিংবা হয়ত কিছু রোমান্টিক ও শেলী বায়রন এবং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সামঞ্জস্য থাকার জন্য কিয়দংশে হুইর্টম্যান।

শাহাবুদ্দীন আহমদের মূল্যায়ণে 'নজরুলের কবিতায় শব্দ ব্যবহার অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে', অপর কোন সমালোচকের মূল্যায়ণে যা পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়
রফিকুল ইসলামের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা

রফিকুল ইসলামের কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা (১৯৮৪), কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য (১৯৯১) এবং কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সৃষ্টি (১৯৯৭)। আমরা শেষ গ্রন্থটি অবলম্বনে রফিকুল ইসলামের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা বিচার করব। গ্রন্থটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নজরুল- জীবনী কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, গুরুত্ব দেয়া হয়েছে নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের উপরে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে নজরুলের মৌলিক কবিতাবলীর রচনা বা প্রকাশের কালানুক্রমিক, বিষয়ভিত্তিক সামগ্রিক বিশ্লেষণ। তৃতীয় ভাগে নজরুলের গদ্য রচনার অর্থাৎ প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও সঙ্গীতের পর্যালোচনা সন্নিবেশিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গীতে নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীতের মূল্যায়ণ করেছেন। শুধুমাত্র রফিকুল ইসলামের আলোচনাতেই কবিতার কালানুক্রমিক ধারাবহিকতা লক্ষ্য করা যায়। লেখকের গ্রন্থে কবিতার ধারাবাহিকতা ছাড়াও সামগ্রিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। দ্বিতীয় ভাগে লেখক তাঁর কবিতা আলোচনায় কবিতার বিষয়বস্তু অনুসারে কবিতাগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজন করেছেন। তাতে নজরুলের কবিতার বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণের সঙ্গে পাঠক পরিচিত হতে পারেন। নজরুল কবিতার লেখকের শ্রেণী বিন্যাস হচেছ,

প্রথম অধ্যায় ঃ	সমকালীন বাংলা কবিতা-	
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	উদ্দীপনামূলক কবিতা ঃ	প্রথম পর্যায় - বিদ্রোহ
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	উদ্দীপনামূলক কবিতা ঃ	দ্বিতীয় পর্যায়- বিপ্লব
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	উদ্দীপনামূলক কবিতা ঃ	তৃতীয় পর্যায়- সাম্যবাদ
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	উদ্দীপনামূলক কবিতা ঃ	চতুর্থ পর্যায়- ইসলাম
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	উদ্দীপনামূলক কবিতা ঃ	পঞ্চম পর্যায়- যৌবন
সপ্তম অধ্যায় ঃ	উদ্দীপনামূলক কবিতা ঃ	ষষ্ঠ পর্যায়- চারিত্র
অষ্টম অধ্যায় ঃ	প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা ঃ	প্রথম পর্যায়
নবম অধ্যায় ঃ	প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা ঃ	দ্বিতীয় পর্যায়
দশম অধ্যায় ঃ	প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা ঃ	তৃতীয় পর্যায়
একাদশ অধ্যায়ঃ	প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা ঃ	চতুর্থ পর্যায়
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ	প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা ঃ	পঞ্চম পর্যায়
ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ	নজরুল কাব্য।	

'বিদ্রোহ' পর্যায় আলোচনা করতে গিয়ে রফিকুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশে নজরুল 'বিদ্রোহী কবি' খ্যাতি অর্জন করেছেন, সেটা যেমন 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার জন্য তেমনি পরাধীনতা, সামাজিক রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, দারিদ্র ও অসাম্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন লেখনী পরিচালনার জন্যেও। তিনি কেবল লেখনী পরিচালনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, সক্রিয়ভাবে প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদী, ও সংগ্রামশীল রাজনীতি, সংগঠন ও সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহিত্যে যে বাণী উচচারণ করেছেন নিজের জীবনে ও কর্মে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, ফলে নজরুলের ক্ষেত্রে জীবন ও সাহিত্য অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছে। যে সংগ্রামকে তিনি সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন সে অভিজ্ঞতা কাল্পনিক বা তত্ত্বগত ছিল না। তা নজরুলের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। আর সে কারণেই তাঁর উদ্দীপনামূলক কবিতাবলী বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে দীর্ঘকাল ধরে অভূতপূর্ব আলোড়ন জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'বিদ্রোহ' পর্যায় আলোচনা করতে গিয়ে লেখক রচনার কাল অনুসারে নিম্নরূপ কবিতাবলী উল্লেখ করেছেন। যেমন, 'শাত-ইল-আরব', 'আগমনী', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম', 'রণ-ভেরী', 'আনোয়ার', 'কামাল পাশা', 'বিদ্রোহী', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজম', '(তিরোভাব)', 'প্রলয়োল্লাস', 'সতেন্দ্রপয়ান', 'ধুমকেতু', 'রক্তাম্বর ধারিনী মা', 'আনন্দময়ীর আগমনে', 'দুঃশাসনের রক্ত।' উপরোক্ত উদ্দীপনামূলক কবিতাগুলোর মধ্যে 'ফাতেহা-ই-দোয়াজম' (আবির্ভাব ও তিরোভাব) এবং 'আনন্দময়ীর আগমনে' 'দুঃশাসনের রক্ত' ব্যতিত বাকী কবিতাগুলো অগ্নিবীণা কাব্যে সংকলিত হয়েছে। আর অগ্নিবীনা নজরুলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্য সংকলন।

'অগ্নিবীণা' কাব্যের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে' গান থেকে গৃহীত হয়েছিল। এ কাব্যটি 'ভাঙ্গা বাঙ্গালার রাঙ্গা যুগের আদি পুরোহিত', সাগ্নিক বীর শ্রীবারিন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীচরণার বিন্দেষুকে 'অগ্নিঋষি' সম্বোধনে উৎসর্গ করা হয়। এ কাব্যে সংকলিত 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিনী মা', 'আগমনী' ও 'ধূমকেতু' এই পাঁচটি কবিতায় হিন্দু ঐতিহ্য এবং 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'রণী-ভেরী', 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম'- এই সাতটি কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য প্রাধান্য পেয়েছে। তবে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশেষ ঐতিহ্যের পরিচর্যা অপেক্ষা ঐতিহ্যের মিশ্রন প্রবণতা লক্ষণীয়। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় পৌরাণিক কিংবা সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রের মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটনের রূপকে সমাজ, জাতি ও স্বদেশের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা হয়েছে। যেসব কবিতায় কবির আত্মস্ফূর্তি বা প্রকৃতির মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে সেসব কবিতাতেও সমকালীন সংকট উত্তরণের প্রয়াস মুখ্য। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের প্রায় প্রতিটি কবিতাই দীর্ঘ, আবেগপ্রবণ ও নাটকীয়, ছন্দের ক্ষেত্রে সমিল স্বরবৃত্ত বা সমিল মাত্রাবৃত্ত প্রবহমান ব্যবহারে কবির পারদর্শিতা এ কাব্যে লক্ষণীয়। উপমা, উৎপেক্ষা ও চিত্রকল্প নির্মাণে পুরানের ব্যবহার অধিকতর হলেও আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারে কবির সার্থকতা বাংলা সাহিত্যে নতুন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। রফিকুল ইসলাম 'কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি' গ্রন্থে 'অগ্নিবীণা' য় সংকলিত কবিতাবলীর নিম্নরূপ মূল্যায়ণ করেছেন।

'শাত-ইল-আরব' বাংলা সাহিত্যে নজরুলের প্রথম উল্লেখ-যোগ্য কবিতা। 'মেসোপটেমিয়া' নামক ইংরাজী গ্রন্থ থেকে গৃহীত টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর চিত্র পরিচয় লিখতে গিয়ে পশ্চিম এশিয়ার দীর্ঘতম নদী ইতিহাসখ্যাত শত-ইল-আরব নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পাহাড়' গানের মতো মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ৬/৬/৫ চালের কবিতাটি রচিত এবং 'অগ্নিবীণা' কাব্যে সংকিলত। এই কবিতাটি নজরুলের ইতিহাস চেতনা ও পরাধীনতার বেদনাবহ।

'আগমনী' কবিতায় হিন্দু ঐতিহ্য প্রাধান্য পেয়েছে। কবিতাটি ষাম্মাত্রিক সমিল মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এবং কবিতাটির বিভিন্ন স্তবকে পংক্তির অসমানতা ও প্রান্তি পর্ব-সমূহের গঠন বৈচিত্রপূর্ণ। এটি হিন্দু ঐতিহ্য বিষয়ক নজরুলের প্রথম উল্লেখ্যযোগ্য কবিতা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতা 'খেয়াপারের তরণী'। কবিতাটি ঢাকার নওয়াবজাদী মেহেরবানু অঙ্কিত একটি চিত্র অবলম্বনে রচিত। চার মাত্রার চালের মাত্রাবৃত্ত ছন্দের এ কবিতা পাঠ করে বংলা কাব্যের ছন্দ ঝংকারে মোহিতলালের পুনরায় আস্থা ফিরে এসেছিল এবং কবিতাটির অতি প্রাকৃত ভাব কল্পনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তিনি 'কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক' এ কামনা করেছিলেন। কবিতাটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যে সংকলিত এবং ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক নজরুলের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা।

'কোরবানী' কবিতাটি তরিকুল আলমের 'আজ ঈদ' প্রবন্ধের (সবুজ পত্র, শ্রাবণ, ১৩২৭) উত্তরে লিখিত। নজরুল এ কবিতায় তরিকুল আলমের প্রবন্ধের বক্তব্য সমর্থন করেননি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোরবানী বা ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য তার কবিতায় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন ছয়মাত্রার চালে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। বস্তুতঃ 'কোরবানী' কবিতা হযরত ইব্রাহীমের অমর ত্যাগের তাৎপর্য বর্ণনা মাত্র নয় বরং তা সমকালীন বিশ্বের একটি রূপক ও বটে।

'মোহর্‌রম' চার মাত্রা চালের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কারবালার বিষাদান্ত কাহিনী এ কবিতার উপজীব্য। মধ্যযুগের মর্সিয়া সাহিত্য এবং আধুনিক যুগের রচিত মীর মোশর্‌রফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থের আধুনিক সারৎসার 'মোহর্‌রম।'

তুরুস্কের ঘটনাবলী নিয়ে রচিত তিনটি কবিতা 'রণ-ভেরী', 'আনোয়ার' ও 'কামাল পাশা।' তুরুস্কের ঘটনাবলী বিশেষত কামাল আতাতুর্কের অভ্যুদয় ও 'নব্যতুর্কী' আন্দোলন নজরুলকে কি ভাবে আলোড়িত করেছিল- তারই ফলে সৃষ্ট এ কবিতা তিনটি।

নজরুলের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবিতা 'বিদ্রোহী' ১৯২২ খ্রীঃ ৬ই জানুয়ারীতে প্রথম প্রকাশিত। এ কবিতাটি যান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত মুক্তক ছন্দে রচিত। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির আত্ম জাগরণের বিপুল ও বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য কর যায়, কবির ব্যক্তিত্বের প্রবল স্ফুরণ ঘটেছে এ কবিতায়। যদিও বহির্জগতের রাশি রাশি উপমা অলংকারে এর প্রকাশ কিন্তু মূলতঃ এ জাগরণ আত্মগত। তবে 'বিদ্রোহী' কবিতা শুরুতে আত্মগত, কবির আত্ম জাগরণের মধ্যে দিয়ে যার উদ্বোধন শেষের দিকে তা বস্তগত, যেখানে কবি এ পৃথিবীতে উৎপীড়ন ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামীর ভূমিকায় স্থিতিশীল। সব শেষে কবি শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির খামখেয়ালীর বিরুদ্ধে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে চির বিদ্রোহ বীরের এবং চির উন্নত শিরের মহিমা অক্ষুন্ন রেখেছেন।

নজরুলের অন্যতম বিখ্যাত কবিতা 'প্রলয়োল্লাস' ১৯২২ খ্রীঃ কুমিল্লায় রচিত।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শুরুতে রচিত 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ', কবিতার প্রভাব অলক্ষ নয়। তবে নজরুল কালবৈশাখী ঝড় এবং প্রলয়ের উল্লাসকে পৌরণিক প্রতীকে পরিবর্তনের রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবিতাটি সমিল প্রবহমান স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

রফিকুল ইসলাম ঐ কবিতাগুলির বিশ্লেষণ শেষে মন্তব্য করেছেন,

> 'অগ্নিবীণা'র আগের ও পরের বাংলা কবিতা ভিন্ন কবিতা। বাংলা কবিতার ইতিহাসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' কাব্যের মতো কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্য ঐতিহাসিক মাইল ফলক।

'বিদ্রোহ' পর্যায়ে আলোচিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় কবির ভাষ্য বস্তুত এই কবিতায় দুর্গাদেবীর আবাহন উপলক্ষ মাত্র, অহিংস অসহযোগ ও লেখাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পটভূমিকায় সমকালীন রাজনৈতিক হতাশা দূরীকরণের জন্যে সশস্ত্র আন্দোলনের আহ্বান। নজরুলের 'ধুমকেতু' পত্রিকায় ঐ আদর্শই প্রচারিত হচ্ছিল। বিষয়টি ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। ফলে কবিতাটি রচনার জন্যে কিছু দিনের মধ্যেই গ্রেফতার ও কারাবরণ করতে হয়েছিল।

'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় নজরুল যে আবেগকে পৌরাণিক মোড়কে আচ্ছাদিত করে প্রকাশ করেছিলেন, 'ধূমকেতু'র ২৭শে অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায় 'দুঃশাসনের রক্ত' (ভাঙার গান) কবিতায় তা কোন প্রকার রূপক ছাড়া স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছিল। এ কবিতা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান।

বল রে বন্য হিংস্র বীর,
দুঃশাসনের চাই রুধির।
চাই রুধির রক্ত চাই
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই
দুঃশাসনের রক্ত চাই
দুঃশাসনের রক্ত চাই।

এটি একটি সাহসী ও তেজোদৃপ্ত কবিতা, বিদেশী শাসক ও স্বদেশী কাপুরুষতার প্রতি প্রত্যক্ষ আঘাত এ কবিতাটি। এমন কবিতার সংখ্যা সাহিত্যে বিশেষ নেই।

'বিদ্রোহ' পর্যায় আলোচনায় লেখক যে সব কবিতাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন তার প্রায় সব কবিতাই 'অগ্নিবীণা' কাব্যেগ্রন্থের। তবে এ পর্যায়ে অর্থাৎ 'বিপ্লব' পর্যায়ে আলোচনায় এসেছে 'বিষের বাঁশী', 'দোলন-চাপা' 'ভাঙ্গার গান', 'জিঞ্জীর', 'ফণি-মনসা', 'চিত্তনামা', 'সর্বহারা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলী।

'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' (দোলন-চাঁপা) কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার সাদৃশ্য লেখক দেখিয়েছেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে আত্ম উন্মোচন, আলোচ্য কবিতায় নজরুলের তদ্রুপ জাগরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। এই কবিতায় কবি তাঁর চিত্তের জাগরণকে প্রকৃতি, পুরাণ ও অতি-প্রাকৃতিক চিত্তকল্পে উদ্ভাসিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

. 'সেবক' (বিষের বাঁশী) হুগলী জেলে থাকা অবস্থায় রচিত। এ সময় নজরুল অনশন ধর্মঘট করেছিলেন, সে সময় নজরুলের আবেগ দেশাত্মবোধের প্রেরণায় কতটা উদ্দীপিত ছিল, দেশের পরাধীনতার চিন্তা তার মধ্যে কি তীব্র জ্বালা ধরিয়েছিল সে অভিজ্ঞতার রূপায়ন 'সেবক'।

'ঝড়' (পশ্চিম তরঙ্গ- বিশের বাঁশী) আসলে বিপ্লবের লাল ঘোড়ার প্রতীক, ঝড়ের বাঁশীতে তার ডাক শুনেন কবি।

সমকালীন রাজনীতিতে স্বরাজ দাবীকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্য চলছিল, নেতারা স্বরাজের মিথ্যা ভুলিতে লোক ভোলানোর ছলনায় মেতেছিল, প্রকৃত স্বাধীনতার দাবী উত্থাপনের সাহস তাদের ছিল না। তাই কবি 'বিদ্রোহের বাণী' কবিতায় দেশবাসীর প্রতি আত্মপ্রবঞ্চনা পরিহার করে সত্য বলার আকুল আহ্বান জানিয়েছেন।

. 'অভিশাপ' (বিশের বাঁশী) কবিতায় 'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু' কবিতার বিধি এবং ভগবান প্রতি বৈরী মনোভাব এবং স্রষ্টা অপেক্ষা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যে আত্মবিশ্বাস দেখা গিয়েছিল তার স্মৃতি-চারণ ঘটেছে।

'মুক্ত-পিঞ্জর' (বিষের বাঁশী) কবিতায় কারামুক্তির পর নজরুলের যে অনুভূতি তা ধরা পড়েছে এ কবিতায়।

কারা বন্দীর মুক্তির আকাঙ্খা, কারাগারের বদ্ধ অন্ধকারে বাইরের পৃথিবীর আলোর ডাক কবির ব্যক্তি অনুভূতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এ কবিতায় সুর তুলেছে। কিন্তু সমকালীন বাস্তবতা মুক্তির স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিয়েছে তাই ঘূর্ণি হাওয়া রক্ত-অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল আঁধির অপেক্ষায় কবিতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

. 'ভাঙ্গারগান' গ্রন্থের এগারটি রচনার মধ্যে ২টি মাত্র কবিতা যথা- 'দুঃশাসনে রক্তপান' ও 'শহিদী ঈদ'। 'বিদ্রোহ' পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'দুঃশাসনের রক্তপান' কবিতাটি।

এ পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'শহিদী ঈদ' কবিতাটি। এই কবিতাটি আবেগের দিক থেকে 'কোরবানী' কবিতার সঙ্গে মিল রয়েছে। এই কবিতায় কোরবানীর চিরাচরিত বিশ্বাসকে তীব্রভাবে আক্রমন করা হয়েছে এবং তুলে ধরা হয়েছে কোরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য।

'সুবহ্ উম্মেদ' (জিঞ্জির) কবিতাতে নজরুলের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুলের মধ্য প্রাচ্যের বা মুসলিম জগতের জাগরণ চিত্র অঙ্কণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল-স্বদেশে স্বজাতির মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। যেহেতু ভারতীয় মুসলমানেরা ঐতিহ্যগত ভাবে অনুপ্রেরণার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যের মুখাপেক্ষী সে কারণে নজরুল মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের জাগরণের কাহিনী প্রচার করে ভারতীয় মুসলমানের জাগরণ কামনা করেছেন।

'দ্বীপান্তরের বন্দিনী' (ফণি-মনসা) কবিতার ছত্রে ছত্রে পরাধীনতার মর্মবেদনা জ্বালা ধরিয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে নিয়ে রচনা করেছেন অর্ঘ্য', 'অকাল-সন্ধ্যা', 'ইন্দ্র পতন', 'সান্ত্বনা', 'রাজভিখারী' কবিতাগুলো। যা 'চিত্তনামা' গ্রন্থে সংকলিত। এই রচনা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য হলো- চিত্তরঞ্জন দায়ের প্রতি নজরুলের যে আতিশয্য পরিলক্ষিত হয় তা যে অতি উচ্ছ্বাসের ফল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে নজরুলের অতিরিক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার কারণ ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়াও, দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রয়াস। যদিও পরবর্তীতে দেশবন্ধুর 'হিন্দু-মুসলমান চুক্তি' বাতিল করে দেওয়া হয়।

নজরুলের বিয়ের পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাকে নিয়ে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়-তার জবাব দিয়েছেন 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায়। তাছাড়া স্বরাজের নামে সমকালীন দেশ ও সমাজে যে বিভ্রান্তি ছিল সে বঞ্চনার করুণ গাথা নজরুলের 'আমার কৈফিয়ত' কবিতার একাদশ স্তবকে জ্বলন্তভাবে রূপায়িত হয়ে রয়েছে।

সমাজ তাঁর মূল্য না দিলেও রাজ-সরকার তাঁকে বন্দী করে, গ্রন্থ নিষিদ্ধ করে, পেছনে গোয়েন্দা নিয়োগ করে যে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, বড় বেদনার সঙ্গে সেই উপলব্ধিকে তিনি 'চরকার গান' রচনায় প্রকাশ করেছেন।

সর্বোপরি আলোচনায় রফিকুল ইসলামের বক্তব্য হলো- 'অগ্নি-বীণা' তে কবি বিদ্রোহের যে সুর তুলেছিলেন তা রূপক অতিক্রম করে 'বিষের বাঁশী'তে সংগ্রাম রূপ নিয়েছে। কিন্তু রূপক সম্পূর্ণ অপসৃত হয়নি, 'ভাঙ্গার গান' এ সুর বাদ্য থেকে কণ্ঠে তুলে নেয়া হয়েছে কবি স্বকণ্ঠে ভাঙনের গান গেয়েছেন। 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙ্গার গান'- এর অনেক কবিতা কবির বন্দী ও অনশন জীবনের সৃষ্টি, সে অভিজ্ঞতার ছোঁয়া ঐ দুটি সংকলনের কবিতাকে তীব্র, তীক্ষ্ম জ্বালাময় করেছে।

'নবযুগ' পত্রিকার পর্বে নজরুলের বিদ্রোহী ভূমিকার, 'ধূমকেতু' পর্বে বিপ্লবী ভূমিকার এবং পরে 'লাঙ্গল' পর্বে নজরুলের সাম্যবাদী ভূমিকার অর্থাৎ মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধানের সংগ্রামী পরিচয় পাওয়া যায়। 'সাম্যবাদী' কবিতা সমষ্টিতে শ্রেণী বৈষম্য বা শ্রেণী সংগ্রাম অপেক্ষা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমতার বাণী অধিক উচ্চারিত। যে সাম্যের চেতনা বিশেষ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দর্শন থেকে উৎসারিত নয়, যার উৎস সাধারণ মানবিকতাবোধ। নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতা সমষ্টির সঙ্গে চণ্ডীদাসের 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' (লাঙ্গল পত্রিকার শুরুতেই ছাপা থাকত) এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সাম্যসাম' কবিতার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মিল লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

'সাম্যবাদী' কবিতা সমষ্টিতে 'সাম্যবাদী' বা 'সাম্য' ছাড়াও 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ', 'চোর', 'ডাকাত', 'বারাঙ্গনা', 'মিথ্যাবাদী' 'নারী', 'রাজাপ্রজা' ও 'কুলিমজুর' শীর্ষক কবিতা রয়েছে। সর্বহারা গ্রন্থের (অক্টোবর ১৯২৬) 'নাম' কবিতায় সর্বহারাদের কথা বলা হয়েছে। 'অভিমান' কবিতাতেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সর্বহারা গ্রন্থের 'ফরিয়াদ' কবিতাটিও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের হানাহানি নিয়ে রচিত 'পথের দিশা', 'যা শত্রু পরে পরে', 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' কবিতাগুলো 'ফণি-মনসা' গ্রন্থে সংকলিত।

দারিদ্র্য নজরুলের বেদনা বিলাস ছিল না, দুঃখ বিলাস ছিল না, দারিদ্র্যের কঠিন অভিজ্ঞতা নজরুলকে জীবন সচেতন করেছে, তার চেতনাকে সংগ্রামী করেছে, মহৎ করেছে। ঐ অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়েই নজরুলের কবি-সত্তা, শিল্পী সত্তা নিখাদ সোনায় পরিণত হয়েছিল, সেই মহত্তর অভিজ্ঞতার সৃষ্টি নজরুলের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'দারিদ্র্য' (সিন্দু-হিন্দোল)।

'ইসলাম' পর্যায়ের নজরুল ইসলামের ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক কবিতাবলীতে আধ্যাত্মিক চেতনার চেয়ে মুসলিম জগতের ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের 'কামাল পাশা' 'আনোয়ার' ও 'রণ-ভেরী' কবিতায় তুরস্ককে এবং 'শাত-ইল-আরব' কবিতায় ইরাককে অবলম্বন করে নজরুল স্বদেশের পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছিলেন, 'খেয়া-পারের তরণী' 'মোহররম' ও 'কোরবানী' কবিতায় ইসলামের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় সত্যের জয় ঘোষিত হয়েছে।

'বিষের বাঁশী' গ্রন্থে 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম'। (আবির্ভাব ও তিরোভাব) কবিতায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষণে আরব ভূমির আনন্দ ও বেদনার চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে নজরুল ঐ মহাপুরষের আদর্শকে বর্তমানে উজ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'ভাঙার গান' এর 'শহিদী-ঈদ' কবিতায় সত্যের সংগ্রামে সর্বস্ব দানের আহুবান জানানো হয়েছে।

'জিঞ্জির' ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক নজরুলের (কার্তিক ১৩৩৫, নভেম্বর, ১৯২৮) শুধু নয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ইসলাম বিষয়ক কাব্য। এ কাব্যে সংকলিত 'খালেদ' 'চিরঞ্জিব জগলুল', 'আমানুল্লাহ', 'উমর ফারুক', 'ঈদ-মোবারক' প্রভৃতি কবিতাই তার প্রমান।

'খালেদ' ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং 'জিঞ্জীর' কাব্যে সংকলিত। নজরুলের সবচেয়ে বিখ্যাত 'খালেদ' ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক। হিন্দু ঐতিহ্য থেকে অর্জুনকে এবং মুসলিম ঐতিহ্য থেকে খালেদকে নজরুল শৌর্য বীর্যের প্রতীক হিসেবে তাঁর কাব্যে বহুবার ব্যবহার করেছেন। 'খালেদ' কবিতায় খালেদের শৌর্যবীর্যে ও পৌরুষকে জাগ্রত করে বর্তমানকে বীর্যবান করে তোলার আবেগ মুখ্য।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের 'বাংলার আজীজা' ও 'রীফ মর্দার' কবিতা দুটিকে উদ্দীপনামূলক কবিতার অন্তর্ভূক্ত বিবেচনা করে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। কবিতা দুটি 'সন্ধ্যা' গ্রন্থে সংকলিত।

নজরুলের 'ইসলামী' কবিতা বিষয়ক মূল্যায়ণ সম্পর্কে রফিকুল ইসলামের মন্তব্য হচ্ছে,

> নজরুলের মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক কবিতাগুলোতে স্বদেশের পরাধীনতার প্রেক্ষাপটে যে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী আবেগ প্রকাশ পেয়েছে তা নজরুলের আন্তর্জাতিক চেতনা ও ইতিহাসবোধের পরিচায়ক ও বটে। নজরুল বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী কবি। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে তৃতীয় বিশ্বে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারনের সময় নজরুলই প্রথম এক পরাধীন দেশের কবি হয়েও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বার বার তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। নজরুলকে ঐ জন্যেও বাংলা সাহিত্যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রথম কবি বলতে হয়।

'যৌবন' পর্যায়ে লেখক বলেছেন, যৌবন বন্দনা, যৌবনের জয়গান নজরুল মানষের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। নজরুলের কবি জীবনের শুরু থেকেই বিভিন্ন কবিতায় যৌবনের জয় ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু 'মাদারিপুর শান্তি সেনা' র কর শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরনাম্বুজে উৎসর্গীকৃত 'সন্ধ্যা' (প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৩৬, আগষ্ট ১৯২৯) গ্রন্থে সংকলিত বিভিন্ন কবিতায় যৌবনের পরিচর্যা বিশেষ গৌরব ও মহিমাময় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থের প্রথম এবং নাম কবিতায় দীর্ঘ পরাধীনতার আঁধার সন্ধ্যার রূপকে প্রকাশিত। সন্ধ্যার শর্বরীর আঁধার কি কাটবে না? ঊষার আগমন কি ঘটবে না স্বদেশের ভাগ্যে? 'সন্ধ্যা' কবিতায় এ প্রশ্ন উত্থাপন করে কবি এ গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় যৌবনের গান গেয়েছেন।

'সন্ধ্যা' গ্রন্থে 'আমি গাই তারি গান', 'জীবন বন্দনা', 'ভোরের পাখী', 'যৌবন', 'তরুণের গান' ও 'যৌবন-জল-তরঙ্গ' কবিতায় তারুণ্যের ও যৌবনের নিঃশঙ্ক দৃপ্ত রূপ কবি তুলে ধরেছেন, 'অন্ধ-স্বদেশ দেবতা' কবিতায় সে শক্তি মৃত্যু গহন যাত্রী, স্বদেশ দেবতার পথপ্রদর্শক।

'সন্ধ্যা' গ্রন্থের 'শরৎচন্দ্র' কবিতায় কবি ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের জয়গান গেয়েছেন। 'তর্পন' কবিতা দেশবন্ধুর প্রতি নজরুলের যে আবেগ তারই প্রতিশ্রুতি স্বরূপ।

'সন্ধ্যা' গ্রন্থের শেষ কবিতা 'না আসা দিনের কবিতার প্রতি' তে নজরুলের শ্রদ্ধা তর্পন, জবাকুসুম-সংকাশ রাঙা অরুন রবির বেশে যারা উদিত হচ্ছে সে সব কবির উদ্দেশ্যে যে রাঙা প্রভাত দেখার আশায় তিনি জেগেছিলেন- তারই প্রকাশ ও কবিতা। নজরুলের 'প্রলয়শিখা' (১৩৩৭, ১৩৯০ খ্রীঃ) গ্রন্থটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এ গ্রন্থে প্রলয়, যৌবন, রুদ্র, নারী ইত্যাদি বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর ভাব-চিন্তার প্রকাশ ছাড়াও সমকালীণ দেশ-কাল বিশেষতঃ স্বদেশের সমকালীন রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ছায়াপাত করেছে। ১৯৪০ খ্রীঃ প্রকাশিত 'প্রলয়-শিখা' গ্রন্থে 'নব-ভারতের হলদিঘাট' এবং 'যতীন দাস' নামক দুটি কবিতায় বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন)

Dhaka University Institutional Repository

এবং বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে নজরুল পুনরায় সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য 'অগ্নি-বীণার' যে বিদ্রোহের সূত্রপাত সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত শেষ কাব্য 'প্রলয়শিা'য় বিপ্লবের রক্তাক্ত পরিণতিতে তার উপসংহার।

রফিকুল ইসলামের ভাষায়, নজরুল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্যায়ে কবিতার চেয়ে গান রচনা করেছেন বেশী। তবে মাঝে মাঝে যে কবিতা বেরিয়েছে তার অনেকগুলোই আবার সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা বা সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নিয়ে রচিত। যা ষষ্ঠ পর্যায়ে 'চারিত্র' বিষয়ক অধ্যায়ে আলোচিত। তাঁদের মধ্যে 'নবীনচন্দ্র' (১৩৩৭ সাল), 'মাওলানা মোহাম্মদ আলী' (১৯৩১), যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুতে 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের তিরোধানে' (মোহাম্মদী, ভাদ্র ১৩৪০), হাজী মোহাম্মদ মোহসীনকে নিয়ে 'মহাত্ম হাজী মোহাম্মদ মোহসীন', প্যান-ইসলামিক আন্দোলনের উদ্‌গাতা জামালউদ্দীন আল আফগানীর উদ্দেশ্যে 'জামালুদ্দীন' (১৩৩৪ সাল), রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রচিত 'তীর্থ পথিক' (১৩৪২ সাল) 'মৃত তারা', 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলী' 'কিশোর রবি' 'রবি হারা' 'রবির জন্মতিথি', কবিতাগুলো। সমাজের নিপীড়িত মানুষ বিশেষতঃ দরিদ্র, শ্রমিক, কৃষকদের নিয়ে রচনা করেছেন 'ওঠরে চাষী' (নতুন চাঁদ), 'কৃষকের ঈদ' (নতুন চাঁদ), 'শ্রমিক মজুর' কবিতাগুলো।

'প্রেম ও প্রহার', 'দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়' কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে নজরুলের জীবনের আদর্শ। এ পর্যায়েও নজরুল যৌবন বন্দনা সম্পর্কিত কবিতা রচনা করেছেন। এর মধ্যে আছে 'দুর্বার যৌবন', 'মোবারকবাদ', 'জাগো সৈনিক আত্মা' 'উঠিয়েছে ঝড়', 'জীবনে যাহারা বাঁচিল না' ইত্যাদি কবিতায়।

400105

কবি ইসলামের অতীত আদর্শ, ঐহিত্য ও শৌর্যবীর্যের পূর্ণ জাগরণে রচনা করেন 'আজাদ' কবিতাটি। নজরুল ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদের জীবন নিয়ে 'মরু ভাস্কর' (১৯৫১) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনায় ব্রতী হন। যা চারটি স্বর্গে বিভক্ত কাব্যটি অবশ্য অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

শেষ পর্যায়ে কবির যে মনোভাব, যে আবেগ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কবিতাগুলো হচ্ছে 'এক আল্লাই জিন্দাবাদ', 'আল্লা পরম প্রিয়তম মোর' 'জয় হোক' ইত্যাদি।

নজরুলের কবি জীবনের শেষ পর্বে রচিত 'আল্লাহ পরম প্রিয়তম মোর' (নজরুল রচনা সম্ভার) কবিতায় আল্লাহর প্রতি কবির যে মনোভাব, যে আবেগ প্রকাশিত হয়েছে তা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস,

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ পরম প্রিয়তম মোর আল্লাহ ত দূরে নয়।
নিত্য আমারে, জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়।
পূর্ণ পরম সুন্দর সেই, আমার পরম পতি,
মোর ধ্যান, জ্ঞান তনু-মন-প্রাণ, আমার পরম পতি।

নজরুল অসুস্থ হবার, সম্বিৎহারা হবার মাত্র চার মাস আগে রচিত কবিতা 'চির নির্ভয়' 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ তারিখে প্রকাশিত। কবি জীবনের একবারে শেষপর্বে রচিত এই কবিতা নজরুলের আল্লাহর ওপর গভীর বিশ্বাস ও চির নির্ভরতার প্রমাণ্য দলিল। এই কবিতায় কবি তাঁর জীবন কাহিনী ও অভিজ্ঞতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, ফলে কবিতাটির ঐতিহাসিক মূল্য বর্তমান। তাছাড়া নজরুলের কবি জীবনের শেষ পর্বের মানস প্রকৃতি 'চির নির্ভয়' কবিতায় ধরা পড়েছে বিশ্বস্ত রূপে।

প্রেম ও প্রকৃতির কবিতাঃ- প্রথম পর্যায়

রফিকুল ইসলামের ধারনায়, যৌবন ধর্মের বিদ্রোহ আর প্রেম, নজরুলের কবিতায় ঐ দুইটি উপাদানেরই প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। নজরুলের উদ্দীপনামূলক কবিতায় আমরা যে ভিন্ন সুরের, নূতন ভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাই প্রেমের কবিতায় সে লক্ষণ সর্বদা স্পষ্ট নয়। সর্বোপরি প্রেমিক নজরুল বিদ্রোহী, বিপ্লবী বা সাম্যবাদী নজরুলের মতো সর্বদা সমাজ সচেতন নন। প্রেমের যে রোমান্টিক বিষন্নতার শুরু বিহারীলালের অন্তরঙ্গ গীতি কবিতায় আর চরম উৎকর্ষ রবীন্দ্রনাথে-দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, মোহিত লাল মজুমদারের কবিতায় যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেহজ আবেগের উত্তাপ, নজরুলের প্রেমের কবিতা সে ধারারই অন্তর্ভূক্ত। অবশ্য নজরুল বিহারী লালের মতো মিষ্টিক নন। রবীন্দ্রনাথের মতো অধ্যাত্মবাদী নন কিংবা মোহিত লালের মতো নৈতিক শাসনে আচ্ছন্ন নন। বরং 'কল্লোল', 'কালিকলম' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠির মতো দেহগত প্রেমের সঙ্গে কামনা বাসনার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নজরুলে স্বীকৃত। ফারসী কবিতায় বিশেষতঃ হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের ভাবধারার প্রভাব নজরুলের প্রেমের কবিতায় অস্পষ্ট না হলেও প্রেমিক নজরুলে ভাবাবেগ প্রবন ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলে প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা মহৎ প্রেম বা বৃহত্তর সৌন্দর্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়নি। নজরুল প্রেমের কবিতায় কোন আদর্শ প্রিয়াকে, অনামিকাকে, কামনা বাসনার সীমিত গন্ডীর মধ্যে পাওয়ার জন্যে আকুল, বিরহী এবং অভিমানী। এ যেন বৈষ্ণব কবির অরুপকে রূপে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস। প্রকৃতি নজরুলের প্রেমের অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়-কবি নিজের প্রিয়াকে দেখেছেন প্রকৃতির মধ্যে, প্রকৃতি আর প্রিয়া অনেক সময় একাকার হয়ে গিয়েছে নজরুলে।

প্রেম-প্রকৃতি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বাদল প্রাতের শরাব' 'পূর্বের হাওয়া' গ্রন্থে সংকলিত। ১৩২৭ সালে দেওঘরে রচিত এবং 'ছায়ানটে' সংকলিত 'ছলকুমারী' কবিতায় কোন এক অনামিকাকে এঁকেছেন কবি। পাশাপাশি তাকে ছেড়ে আসার বেদনা প্রকাশিত হয়েছে 'প্রতিবেশিনী' কবিতায়। এ কবিতাগুলোর সৌন্দর্য ধরা পড়েছে 'দুপুর' আভিসার' কবিতায়। 'ব্যথা-নিশীথ' কবিতায় কবির অনুভূতি শান্ত, বেদনার্ত, স্মৃতির ভারে মৃহ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

'ছায়ানটে' সংকলিত 'দহনমালা', নিরুদ্দেশের যাত্রী, 'নীল-পরী' (১৩২৭ সালে রচিত), 'আবেলায়' (১৩২৮), 'হার-মানা-হার' (১৩২৮), বিদায় বেলায় (১৩২৮), 'অনাদৃতা', 'পাপড়ি খোলা' (১৩২৮), 'বিধরা পথিক প্রিয়া', (১৩২৮), মানস-বধু (১৩২৮), এই কবিতায় কবির মামসীর মূর্তিটি অত্যন্ত স্পষ্ট। কবিতাগুলোতে উৎপেক্ষা, উপমা ও চিত্রকল্পে এক ব্যাকুল শিহরণের প্রকাশ ঘটেছে।

'হারা-মনি', 'মনের মানুষ', 'পরশ পূজা', (১৩২৮-আষার), 'শেষের গান', 'পলাতকা', 'অকরুন প্রিয়া', 'বাদল দিনে', (১৩২৮-শ্রাবন), কবিতায় আবেগ প্রেম থেকে প্রকৃতিতে সমর্পিত। 'লক্ষীছাড়া' (১৩২৮-ভাদ্র) কবিতায় প্রেমিক নজরুলের, রোমান্টিক নজরুলের প্রেম কবিতার অভিজ্ঞতা ও আবেগের স্বরূপ বিশ্বস্তরূপে ধরা পড়েছে।

'চিরন্তনী প্রিয়া' (১৩২৮-ভাদ্র), প্রমিলার উদ্দেশ্যে রচিত 'বিজয়িনী', 'প্রিয়ার রূপ' (১৩২৮-অগ্রাহয়ন), কবিতায় 'নিশীথ-প্রীতম' কবিতার বিরহের ছাপ বিন্দুমাত্র নেই। 'কার বাঁশী বাজিল' (১৩২৮-চৈত্র), 'শায়ক-বেধাঁ পাখী' (১৩২৯-জ্যৈষ্ঠ), 'চির চেনা' ও 'স্তব্ধ বাদল'/১৩২৯-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) 'ছায়ানট' গ্রন্থে সংকলিত। 'ছায়ানট' গ্রন্থে সংকলিত প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় প্রায়শঃ প্রেম ও প্রকৃতি চেতনা একাকার হয়ে গিয়েছে।

দৌলতপুরে নার্গিসের সঙ্গে মিলন ও বিচ্ছেদ এবং সর্বশেষে কুমিল্লায় প্রমিলার সঙ্গে পূর্বরাগের সুর মিশিয়ে 'ছায়ানটে'র কবিতাগুলোর অভিজ্ঞতা ও আবেগ বড়ই বেদনামধুর।

'দোলন-চাঁপা' গ্রন্থে একাধিক কবিতায় প্রামীলার কিশোর রূপ বা দোলনা মূরতি স্পষ্ট। 'চপল-সাথী' কবিতায় মুগ্ধ প্রেমিকের বিভোর ভাবটি বর্ণিত হয়েছে। সমর্পন কবিতায় কবি নিজেকে আত্মসমর্পনের কথাই বলেছেন। 'দোলন-চাঁপা' পর্বে নজরুলের কবিতার প্রেরণা যে কবির প্রেয়সী তা 'কবি রানী' কবিতায় অত্যন্ত সহজ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

'ছায়ানট' ও 'দোলন-চাঁপা'য় সংকলিত নজরুলের প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক গীতি কবিতার অনেকগুলো একাধারে কবিতা ও গান, কবিতা হিসাবে এগুলো উৎকৃষ্ট গীতি কবিতা, আর যেগুলো গান সেগুলো ভাব সম্পদে উৎকৃষ্ট কবিতা ও বটে। সেসব কবিতা ও গানের আবেগ ও অনুভূতির উৎস ব্যক্তি হৃদয়ে কিন্তু পরিণতি প্রেমের আনন্দ বেদনার সার্বজনীন চেতনার।

প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা ঃ- দ্বিতীয় পর্যায়

রফিকুল ইসলামের ভাষায়, গীতি কবিতার প্রথম পর্যায়ে নজরুলের আবেগ একান্তভাবেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়েছিল। দেওঘর, দৌলতপুর, কুমিল্লায় কবি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন তা 'ছায়ানট' এবং 'দোলন-চাঁপা'র 'ছল-কুমারী', 'প্রতিবেশিনী', 'দুপুর-অভিসার', 'ব্যথা-নিশীথ', 'দহন-মালা', 'নিরুদ্দেশের যাত্রী', 'অবেলায়' 'হার-মানা-হার', 'অনাদৃতা', 'বিধুরা

Dhaka University Institutional Repository

পথিক প্রিয়া', 'মানস-বধূ', 'হারা-মণি', 'মনের মানুষ', 'পরশ-পূজা', 'শেষের গান', 'অকরুণ প্রিয়া', 'লক্ষীছাড়া', 'চিরন্তনী প্রিয়া', 'বিজয়িনী', নিশীত প্রীতম, 'প্রিয়ার রূপ', 'দোদুল দুল', 'চপল সাথী', 'সমপূর্ণ', 'কবি-বাণী' প্রভৃতি কবিতায় আবেগ সঞ্চার করেছে। আলোচ্য পর্যায়ে কবিতা কেবল কবির ব্যক্তি জীবনের রোজনামচা নয় বরং হৃদয়ানুভূতির বিচিত্র ভাবের দ্যোতক, আবেগ ও অভিজ্ঞতা এখানে সম্প্রসারিত গভীর পটভূমিকায়। প্রেমের সূক্ষাতিসূক্ষ অনুভূতি যে বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে, দেহে জ্বালা ধরায় তার অনাবিল প্রকাশ এ পর্বের প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার মধ্যে দেখতে পাই।

'দোলন-চাঁপা'র 'বেলাশেষে' কবিতাটিতে সন্ধ্যার ধরণীর ঘাঢ় বেদনার চিত্রকল্প প্রিয়তম আশে অপেক্ষমান বিরীহিনীর রূপকের মাধ্যমে সার্থক ভাবে অঙ্কিত হয়েছে সমিল অসম মাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে।

'দোলন-চাঁপা'র 'অবেলার ডাক' কবিতায় একদা উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের জন্যে বেদনা ও অতীত স্মৃতির উজ্জীবন মুখ্য আবেগ।

'পূজারিণী' কেবল 'দোলন-চাঁপা' গ্রন্থেবই নয় বরং নজরুলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রেম কবিতা। পদ-স্বচ্ছন্দ পয়ার বা সমিল অসমাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতার পদগুলি অসমান এবং তাদের সংখ্যার ও স্থিরতা নেই। বিভিন্ন চরণের মধ্যে মিল থাকলেও চরণগুলির দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। আবেগের তারতম্যে এ কবিতার বিভিন্ন পদ বা চরণের মাপেও তারতম্য ঘটেছে। আলোচ্য কবিতায় প্রেমিককে পূর্জারিণীর পবিত্র মূর্তিতে কল্পনা করা হয়েছে, যাকে তিনি চিরদিন খুঁজেছেন, যার জন্যে সাধনা করেছেন, তপস্যা করেছেন আর শেষ পর্যন্ত জেনেছেন যে পূজারিণী তাঁর চির পরিচিতা। 'পূজারিনী' কবিতাটি লেখক স্তবক ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

নজরুল এ কবিতায় প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক বর্ণনায় পাষাণ দেবতা এবং পূজারিণীর সম্পর্কের উপমা এবং চিত্রকল্পই ব্যবহার করেছেন,

বিজয়িনী নহ তুমি- নহ ভিখারিনী,
তুমি দেবী চির-শুদ্ধা তাপস-কুমারী, তুমি মম চির-পূজারিণী!
যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছে ভাল,
আপনারে দাহ করি মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো
বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।

'পূজারিণী' কবিতার বিরহ বেদনাকে নজরুল বৈষ্ণব এবং সংস্কৃত কবিতার বিরহের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন।

'পূজারিণী' কবিতাটির শুরুতে পূজারিণীর পরিচয় স্পষ্ট না হলেও কবিতাটি যতই অগ্রসর হয়েছে ততই পূজারিণীর স্বরুপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, প্রথমে যে নারী ভালবেসে পরে উপেক্ষা আর অবহেলা দিয়েছে, সে নারীর পরিচয় নজরুলের জীবনে অস্পষ্ট নয়। একদিন পূণ্য গোমতীর কূলে যে অপরূপ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যথা-গন্ধ-নাভি-পদ্ম-মূলে কেঁদে উঠেছিল-ফলে কবি যে অপার আনন্দ আর অপরিসীম বেদনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন 'পূজারিণী' কবিতায় সে অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে আবেগ সঞ্চার করেছে। সে প্রেমে তিনি হয়েছেন কবি- তাই কবিতার উপসংহারে কবির বক্তব্য,

অমর হইয়া আছে- র'বে চিরদিন
তবে প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা- বিষে নীলকণ্ঠ কবি।

'পূজারিণী' নজরুলের প্রেমিক সত্তার পরিচয়বহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিতা।

'অভিশাপ' কবিতায় উপেক্ষিত প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস বেদনা সঞ্চার করেছে। 'আশান্বিতা' কবিতা ও হতাশ প্রেমিকের কল্পিত সান্ত্বনা বাক্য। 'দোলন-চাঁপা' কাব্যে প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কখনো তা মিলনের আনন্দে উজ্জীবিত, কখনো তা বিচ্ছেদের বেদনায় নিমজ্জিত। মূল সুরটি কিন্তু বিরহের, তাই মূল আবেগ বেদনার। প্রেম তার মানসিক আর দৈহিক সব জ্বালা নিয়ে ও কাব্যে উপস্থিত। 'দোলন-চাঁপা' গ্রন্থের নামহীন শেষ কবিতায় অতি সংক্ষেপে কেবল এ কাব্যেরই নয়- নজরুলের প্রেমানুভূতির নির্যাস ফুটে উঠেছে,

সে যে চাতকই জানে তার মেঘ এত কি,
যাচে ঘন ঘন বরিষণ কেন কেতকী!
চাঁদে চকোরই চেনে আর চেনে কুমুদী
জানে প্রাণ কেন প্রিয়ে প্রিয়- তম চুমু দি'!

চাতক আর মেঘ, চাঁদ আর চকোর এই বুঝি নজরুলের প্রেমিক- প্রেমিকার সম্পর্কের স্বরূপ। 'দোলন-চাঁপা' এই বেদনার কাব্য।

১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসে সমস্তিপূরের পথে নজরুল রচনা করেছিলেন 'রৌদ্র-দগ্ধের গান' কবিতাটি। 'ছায়ানটে' সংকলিত এ কবিতাটিতে 'ধূমকেতুর' বিপ্লবী ভাবধারার কোন ছাপ নেই, আছে এক ক্লান্ত শ্রান্ত প্রাণের আকুতি। এই কবিতার শেষে 'নিশীথ-নিতল শীতল' কালো'র প্রশান্তির কামনার মধ্য দিয়ে কবির একটি বিশেষ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে।

১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বহরমপুর জেলে রচিত এবং 'ছায়ানট গ্রন্থে সংকলিত' 'আলতা-স্মৃতি' কবিতাটি বিচ্ছেদের, বিরহের, স্মৃতির রক্তাক্ত অর্ঘ্য। এই স্মৃতি কিন্তু কুমিল্লার প্রমীলার স্মৃতি নয়। এই স্মৃতি মনে হয়, দৌলতপুরের নার্গিসকে হারানোর স্মৃতি ও বেদনা।

১৩৩১ সালের শ্রাবণ মাসে হুগলীতে রচিত এবং 'ছায়ানটে' সংকলিত 'ঝড়' পূর্ব তরঙ্গ বা 'পূর্বের হাওয়া' ছন্দ বৈচিত্র্যের জন্যে উল্লেখযোগ্য। তিনটি বাংলা ও তিনটি সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহারে কবি ঝড়ের পূর্ব তরঙ্গ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। সংস্কৃত শার্দুল- বিক্রীড়িত ছন্দে চরনের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুদর্শ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও উনবিংশ অক্ষর সুরু হয়

Dhaka University Institutional Repository

আর দ্বাদশ ও সপ্তদশ অক্ষরে যতি পড়ে। কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বেলাশেষের গান' কাব্যের 'বিদ্যুৎ বিলাস' কবিতার ছন্দে রচিত।

১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে বসন্তকালে হুগলীতে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত 'চৈতী হাওয়া' কবিতাটি। কবিতাটি স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত এবং 'ছায়ানটে' সংকলিত। প্রেমের বিচ্ছেদের, বিরহের যন্ত্রণার একটা চিরন্তন বিষাদময় রূপ আছে, 'চৈতী হাওয়া' কবিতাটি আগাগোড়াই সে আবেগে আচ্ছাদিত এবং আবেঘের অকৃত্রিমতায় একটি বিশিষ্ট কবিতা।

প্রেম ও প্রকৃতির কবিতাঃ- তৃতীয় পর্যায়,
রফিকুল ইসলামের মতে, আলোচ্য পর্যায়ে কবির আবেগ ব্যক্তিগত প্রেম ভালবাসার বিচিত্র অনুভূতিকে ছাড়িয়ে আরো ব্যাপকতর হতে দেখি, কবির অন্তরঙ্গ আবেগ ও অভিজ্ঞতা কেবল বিশেষ বিশেষ নারী সম্পৃক্ত নয় বরং জীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে প্রকাশিত। উদাহরণস্বরূপ 'কল্লোল' পত্রিকার সহ-সম্পাদক গোকুল নাগের পরলোকগমনে 'গোকুল নাগ' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। ১৩৩২ সালের ৮ই আশ্বিন তারিখে গোকুল নাগ যক্ষা রোগে দার্জিলিং এ পরলোকগমন করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে নজরুল হুগলীতে ৩০শে কার্তিক রচনা করেছিলেন 'গোকুল নাগ', 'কল্লোল' পত্রিকার অগ্রাহায়ন সংখ্যায় প্রকাশিত ও 'সর্বহারা' গ্রন্থে-সংকলিত কবিতাটি বন্ধুত্বের, প্রীতির অকৃত্রিম আবেগ সমৃদ্ধ। কবিতাটি নজরুল রচনা করেন সমিল চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে,

না ফুরাতে শরতের বিদায় শেফালি,
না নিবিতে আশ্বিনের কমল দীপালি,
তুমি শুনেছিলে বসু পাতা-ঝরা গান
ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায় আহ্বান।
'গোকুল নাগ' একটি সার্থক বেদনার কবিতা।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের কৃষ্ণনগর, চট্টগ্রাম, কলকাতা, ঢাকার স্থায়ী বা অস্থায়ী জীবনে নজরুল অনেকগুলো গীতি কবিতা রচনা করেন। এ সব কবিতায় নজরুল প্রেমও প্রকৃতিকে আপন আবেগ প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৮ খ্রীঃ) ও 'চক্রবাক' (১৯২৯ খ্রীঃ) গ্রন্থের অনেক কবিতায় যে ইন্দ্রিয়ঘন আবেগের রস প্রকাশিত।

প্রেমের কবিতায় নজরুল রবীন্দ্রনাথের মতো আদর্শ অমানবিক রহস্যময়। মানস সুন্দরী বা জীবন দেবীর উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রী নন, কিন্তু কোন আদর্শ প্রিয়াকে, অনামিকাকে কামনা-বাসনার সীমিত গন্ডীর মধ্যে পেতে ক্রন্দরত, চিরবিরহী। এ যেন বৈষ্ণব কবির অপরূপকে রূপে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস, অসীমকে সীমার মধ্যে পাবার আকুলতা। ১৯২৬ খ্রীঃ ৭ই জুলাই চট্টগ্রামে রচিত এবং 'সিন্ধু হিন্দোল' গ্রন্থে সংকলিত 'অ-নামিকা' কবিতায় ঐ ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ করি। 'বলাকা'র মুক্ত বা সমিল অসম মাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতায় কবি-এমন এক 'স্বপ্ন সহচর' 'অনাগত প্রিয়ার'

Dhaka University Institutional Repository

বন্দনা করেছেন যে নারী 'না পাওয়ার তৃষ্ণা', বাসনা সঙ্গিনী, 'অনন্ত যৌবন বালা' অর্থাৎ উর্বশী। এই নারী অসীমা যে সীমার সম্পর্কে ধরা দেয় না। তাই কবির বেদনা,

অসীমা! এলে না তুমি সীমা-রেখা-পারে।
স্বপনে পাইয়া তোম' স্বপনে হারাই বারেবারে।
অরূপ লো! রাত হয়ে এলে মনে,
সতী হয়ে এলে নাক' ঘরে।
প্রিয়া হয়ে এলে প্রেমে,
বধূ হয়ে এলে না অধরে।

'অ-নামিকা' কবিতার শেষে কবি এই সংকল্প ঘোষণা করেন, 'অ-নামিকা' কে শত কামনায়, ভৃঙ্গারে. গেলাসে, পেয়ালায় তিনি পান করবেন। অথাৎ চিরন্তন প্রেমের স্বরূপটি জানা হলেও কামনা-বাসনার উর্ধ্বে- তাকে স্থাপন করার প্রয়াস নেই। রক্তিম বাসনার আরতি নজরুলের প্রেম কবিতার স্থায়ী সুর।

চট্টগ্রামে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই তারিখে রচিত এবং 'সিন্ধু- হিন্দোল' গ্রন্থে সংকলিত স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত 'গোপন-প্রিয়া' কবিতায় প্রিয়া অনমিকা হলেও রহস্যময়ী বা মরীচিকা বা সুদূরিকা নয়। গোপন প্রিয়া কাছের হয়েও দূরের কারণ 'আমি-এ-পার, তুমি ও-পার, মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার'।

১৯২৬ খ্রীঃ জুলাই মাসে নজরুল চট্টগ্রাম সফরের সময়ে ২৭শে ও ২৮শে জুলাই তারিখে যথাক্রমে 'অ-নামিকা' ও 'গোপন-প্রিয়া' কবিতা দুটি ছাড়া তাঁর বিখ্যাত 'সিন্ধু' কবিতা সমষ্টি ও রচনা করেছিলেন। 'সিন্ধু' প্রথম তরঙ্গ ২৯শে, দ্বিতীয় তরঙ্গ ৩১শে জুলাই এবং তৃতীয় তরঙ্গ ২রা আগষ্ট তারিখে রচিত। নজরুল সমিল অসম মাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত 'সিন্ধু' কবিতাত্রয়ীর প্রথম তরঙ্গে সমুদ্রকে বন্ধু, চির বিরহী ও অতৃপ্ত রূপে সম্বোধন করেছেন অর্থাৎ আপন চিত্তের প্রতিফলন তিনি সাগরের অশ্রান্ত কল্লোল ও গর্জনের মধ্যে অবলোকন করেছেন, সাগরের সঙ্গে আপন অশান্ত প্রকৃতির সাদৃশ্য কল্পনা নজরুলের 'সিন্ধু' কবিতার মূল আবেগ।

সমুদ্রের জ্বালা, সমুদ্রের ব্যথা আর ক্রন্দন কবি চিত্তের যন্ত্রণা, বেদনা আর অশ্রুর প্রতিরূপ, তাই 'সিন্ধু' প্রথম তরঙ্গের উপসংহারে কবি অনুভব করেন,

এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি কাঁদে মোর প্রিয়া!

নজরুলের 'সিন্ধু' প্রথম তরঙ্গে সমুদ্রের অশান্ত রূপ আর কবির অশান্ত প্রকৃতি সৃষ্টির আদি রূপ, চন্দ্র ও সাগরের সম্পর্ক এবং কবি ও কবিপ্রিয়ার বিরহ বেদনা একাকার হয়ে গিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'সিন্ধু' দ্বিতীয় তরঙ্গে কবি সমুদ্রকে 'বিদ্রোহী' সম্বোধন করেছেন, অর্থাৎ সাগরের ক্ষুব্ধ রূপের মধ্যে কবি আপন বিদ্রোহী প্রকৃতির স্বরূপ খুঁজে পেয়েছেন। সিন্ধুর সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গ সংলাপ একটিই, 'আমিও বিরহী বন্ধু, তুমিও বিরহী।' 'সিন্ধু' দ্বিতীয় তরঙ্গে সমুদ্র কবির ব্যথার সাথী বিরহী চিত্তের প্রতিফলন, তাই সিন্ধু ও বিরহী রূপে প্রতিভাত।

'সিন্ধু' তৃতীয় তরঙ্গে সমুদ্রকে ক্ষুধিত, তৃষিত, তৃষ্ণার্ত, বুভুক্ষু, দুবন্ত, মহাবাহু এবং রাহু বিশেষণে ভূষিত করে কবি পুণরায় আপন অতৃপ্ত প্রেমিক সত্তার আরশি রূপে সিন্ধুকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং শূন্য পাত্র হাতে মত্ত সাকী রূপে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ জলধির একটি ভৌগোলিক চিত্রকল্প দিয়েছেন,

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি,
এতজল বুকে তব, তবু নাহি তৃষ্ণার অবধি।
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু! তবু কি ভরিল না প্রাণ?
দুরন্ত গো, মহাবাহু,
ওগো রাহু,
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ- এক ভাগ বাকী।
সুরা নাই- পাত্র হাতে কাঁপিতেছি সাকী।

'সিন্ধু' কবিতায় প্রকৃতির রূপকে কবির চিরন্তন বিরহ বেদনার এক অনুপম প্রকাশ। 'সিন্ধু' বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা না হলেও সাগর প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য তার ঐশ্বর্য ও মহিমা নিয়ে এ কবিতায় জাগ্রত। বাংলা কবিতায় উপেক্ষিত সমুদ্র এ কবিতায় কবির বিরহী চিত্তের প্রতীক রূপে উপস্থাপিত হলেও 'সিন্ধু' কবিতা বাংলা রোমান্টিক গীতি কবিতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

১৩৩০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং 'সিন্ধু-হিন্দোল' গ্রন্থে সংকলিত 'মাধবী-প্রলাপ' প্রকৃতির রূপকে অপর একটি কবিতা। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে প্রকৃতি রাজ্যের যে চিত্র কবিতাটিতে তুলে ধরা হয়েছে তাকে এক লীলা নিকুঞ্জের প্রতিচ্ছবি বলা চলে। প্রকৃতির এমন ইন্দ্রিয়ঘন রূপ বাংলা কবিতায় বিরল। কবিতাটি যৌবনলীলার একটি অনবদ্য রূপক। 'মাধবী- প্রলাপের' পাত্র পাত্রীরা যদিও প্রকৃতি রাজ্যের কিন্তু তাদের আচরণ যৌবনের উন্মত্ততায় চঞ্চল।

'সিন্ধু-হিন্দোল' গ্রন্থে আরো দুটি কবিতা আছে 'বাসন্তী' ও 'ফাল্গুনী'। 'বাসন্তী' কবিতায় শীতের কুহেলী ভেদ করে বসন্তের আগমন চিত্র বর্ণিত হয়েছে, কুহেলীর দোলায় চড়ে, সময়ের কেতন উড়িয়ে শিমুলের হিঙ্গুল বনে নব বসন্তের আগমন। ফাল্গুনের এমন বিচিত্র চিত্র বাংলা প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় বিরল। মিষ্টি ও ঝাল মেশা বসন্ত বায় শরাবের মত নেশা ধরানো মলয় আর 'কাবাব করিতে বেঁধে কলিজাতে শিক' এর উৎপ্রেক্ষায় কোকিলের ডাকে বক্ষ বেদনার প্রকাশ নজরুলের কবিতাতেই সম্ভব, কিন্তু বসন্ত পূর্ণিমার যে চিত্রকল্প নজরুল সৃষ্টি করেছেন তা অভিনব,

Dhaka University Institutional Repository

এল আলো রাধা ফাগ ভরি' চাঁদের থালায়,
ঝরে জ্যোছনা আবীর সারা শ্যাম সুষমায়।

আলোচ্য কবিতায় কথ্য রীতির প্রয়োগে বসন্তের জ্বালা বর্ণনায় সখীর কাছে নায়িকার সংলাপে এক অভিনব রীতির প্রয়োগ করেছেন,

যত বিরহিনী নিম্-খুন কাটা ঘায়ে নুন।

-এ কবিতাটি যেমন কথ্য রীতির প্রয়োগ কৌশলে উপভোগ্য তেমনি বিচিত্র শব্দ ব্যবহার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণীয়।

'ফাল্গুনী' কবিতায় ব্রজ গোপীদের হোরি খেলার আদলে বসন্ত প্রকৃতি আর মানবের বসন্ত লীলা রূপায়িত হয়েছে।

'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যে সাগর ও বসন্ত প্রকৃতি একটা প্রধান অংশ জুড়ে আছে, তবে শরৎ প্রকৃতিও উপেক্ষিত নয় একেবারে। 'রাখীবন্ধন' কবিতায় আকাশ ধরনীর সখ্য বা রাখী বন্ধনের চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি বাঙলার শরৎ প্রকৃতিকে তার বসন্ত রস রূপ গন্ধ সহ জীবন্ত করে তুলেছেন।

'সিন্ধু-হিন্দোল' গ্রন্থের 'চাঁদনীরাতে' কবিতায় চাঁদনী রাতে আকাশের সৌন্দর্য বর্ণনাতে 'রাখীবন্দন' কবিতার মতোই আকাশের নীল নীলিমা আকাশ গাঙ বা গগনের নীল গাঙ ও আকাশ দরিয়া রূপে কল্পিত। চাঁদনী রাতে আকাশের রূপ বর্ণনায় নজরুল আকাশ গাঙের বা দরিয়ার যে চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন তা অভিবন,

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে।
হাবুডুবু খায় তারা বুদ্বুদ, জোছনা সোনায় রাঙে।
তৃতীয়া চাঁদের 'শাম্পানে' চড়ি চলিছে আকাশ প্রিয়া
আকাশ-দরিয়া উতলা হল গো পুতলায় বুকে নিয়া।

আকাশ দরিয়ায় তৃতীয় চাঁদের সাম্পানে কল্পনা চট্টগ্রামের কর্ণফুলির স্মৃতিবহ।

'দোলন-চাঁপা' ও 'ছায়ানট' কাব্যের প্রকৃতি চেতনা থেকে 'সিন্ধু-হিন্দোল' গ্রন্থে প্রকৃতি চেতনা স্পষ্টতর। এ কাব্যে প্রকৃতি কবির আবেগ রূপায়নের মাধ্যমই শুধু নয়। প্রকৃতি আপন মহিমায় ভাস্বর, যেমন 'সিন্ধু', 'বাসন্তী', 'ফাল্গুনী', 'রাখীবন্ধন' 'চাদঁনীরাতে', 'মাধবী প্রলাপ' কবিতাসমূহ। যদিও এসব কবিতায় প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য উপভোগ নিরবিচ্ছিন্ন নয় তবুও প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই কবির মানস নির্ভর নয় বরং প্রকৃতির বৈচিত্র কবির চিত্ত ও চেতনাকে করেছে প্রভাবিত।

নজরুলের সৌন্দর্য চেতনা বাংলাদেশ বা ভারতীয় ঐতিহ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নিয়ত-মধ্যপ্রাচ্যে রসাভিসারী হয়েছে। ফারসী কবিতা বিশেষতঃ হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে নজরুলের সৌন্দর্য চেতনা বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছিল। ফলে বাংলা কবিতায় বৈচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

এসেছিল, বাংলা গীতি কবিতার একঘেয়েমী ও গতানুগতিকতা মোচনে সহায়ক হয়েছিল নজরুলের মধ্যপ্রাচ্য তথা আরবের রূপকথার রাজ্যে অভিসার। নজরুলের এই বিচিত্র ঐতিহ্য চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত 'সওগাত' পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যার জন্যে রচিত 'বার্ষিক সওগাত' কবিতাটিতে। এ কবিতার যে সওগাত তার উপমা দীর্ঘ বিরহের পর প্রিয় মিলনের রাতের আনন্দ, যে আনন্দের উপাচার সংগ্রহে কবি মানস ভ্রমণ করেছেন গুলিস্তান, ইস্পাহান, নৈশাপুর, ইস্তাম্বুল, বসরা বাগদাদের স্বপ্ন রঙিন দিনগুলিতে। গুলিস্তান থেকে এসেছে বুলবুল পাখি, ইস্পাহান থেকে হেনা মাখা হাত, নৈশাপুর থেকে গুলবদনী, ইস্তাম্বুল থেকে আখি, বসরা থেকে গুল। কবি ফিরে গিয়েছেন বাগদাদে আলিফ লায়লার দিনগুলিতে শাহজাদীর গল্পের রাজ্যে। 'বার্ষিক সওগাত' কবিতায় নজরুলের রোমান্টিক অভিসার যেমন বিচিত্র, তেমনি রঙীন ও রসাল।

বাংলা কবিতার সঙ্গে ফারসী ও আরবী কবিতার পরিচয় নূতন নয়, কিন্তু নজরুলের মতো আর কোন কবি, কোন অনুবাদক মধ্যপ্রাচ্যের রস ও রূপ এমন সার্থক ও জীবন্তভাবে বাংলা কবিতার দেহে সঞ্চার করতে পারেন নি। কবিতাটি পরবর্তীতে 'জিঞ্জীর' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'বার্ষিক সওগাত' কবিতাটিতে বাংগালী মুসলমানের গার্হস্থ্য জীবনের আতিথেয়তার চিত্রকল্পে নজরুল কবিতার শেষে পরিতৃপ্তি খুঁজেছেন,

> চোখের পানির ঝালর ঝুলানো হাসির খাঞ্চাপোশ,
> যেন অশ্রুর গড়খাই ঘেরা দিল্‌খোস ফেরদৌস
> ঢাকিও বন্ধু তব সওগাতী রেকাবী তাহাই দিয়ে,
> দিবসের জ্বালা ভুলে যেতে চাই রাতের শিশির পিয়ে,

বাংগালী মুসলমান সমাজ কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতার ঐতিহ্যবহ। তাই বাংগালী মুসলমান কৃষকের ঘরের সামাজিক আনন্দ উৎসব ফসল ওঠার সঙ্গে জড়িত। অগ্রাহয়ণ পৌষ মাসে ঘরে ফসল উঠলে কৃষকের ঘরে আনন্দ উৎসবের সাড়া পড়ে যায়।

'অঘ্রানের সওগাত' কবিতার শেষ দিকে আমরা বাঙালী মুসলমানের গার্হস্থ্য শোভার যে আভাস পেয়েছি, ১৩৩৩ সালের ১০ই কার্তিক তারিখে কলকাতায় রচিত এবং 'জিঞ্জীর' কাব্যে সংকলিত 'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতায় আমরা তারই পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাই। এ কবিতায় বাংগালী মুসলমান কৃষকের ঘরের আনন্দ তার সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে ধরা পড়েছে।

'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতার বৈশিষ্ট্য এর শব্দ ব্যবহার ও চিত্রকল্প। নজরুল এ কবিতায় বাংগালী মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিছু আরবী, ফারসী ও আঞ্চলিক শব্দ এবং বাংগালী মুসলমানের গার্হস্থ্য জীবনের সৌন্দর্য থেকে চয়ন করা কিছু অভিনব চিত্রকল্প উপহার দিয়েছেন। যেমন-

> ধান ভানে বৌ, দু'লে দু'লে ওঠে রূপ তরঙ্গে বান!
> বধূর পায়ের পরশে পেয়েছে কাঠের ঢেঁকিও প্রাণ,

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের 'বার্ষিক সওগাত' ও 'অঘ্রাণের সওগাত' তার ঐতিহ্য চেতনার দুটি দিকের সুন্দর উদাহরণ। নজরুলের কবিতায় কল্পনা ও বাস্তব উভয় সৌন্দর্যের পাশাপাশি ব্যবহার লক্ষ্য করি, যেমন 'বার্ষিক সওগাত' কবিতায় কবি কল্পনার উল্লসিত অভিসার অতীত বা দূরাগত সৌন্দর্যের বিস্তৃতপ্রায় বিস্ময়ের রাজ্যে আর 'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতায় পরিচিত ভুবনের সৌন্দর্যে। দ্বিতীয়টির স্থিতি নিকট ও পরিচিত জীবনে হলেও সে আনন্দ আজ বিস্তৃতপ্রায় শহরবাসী কবির চেতনায়।

প্রেম ও প্রকৃতির কবিতাঃ- চতুর্থ পর্যায়

রফিকুল ইসলামের ভাষায়, আলোচ্য পর্যায়ের কবিতাসমূহ ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এ পর্বের উল্লেখযোগ্য গীতি কবিতাগুলি 'চক্রবাক' কাব্যে সংকলিত। আলোচ্য সময়ে সৃষ্ট সজল গান ও গীতি কবিতা সমূহে নজরুলের যে আবেগ ও অভিজ্ঞতা রূপায়িত হয়েছে তা যেন হৃদয়ের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ তেমনি অনুভূতির সূক্ষ্মতায় বিশিষ্ট। নজরুলের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতা এ সময়ে রচিত। 'চক্রবাক' কাব্যের প্রথম কবিতা 'তোমারে পড়িছে মনে'-তে ধরা পড়েছে,

- এ পারে ও-পারে মোরা নাই নাই কূল।
তুমি দাও আঁখি- জল, আমি দিই ফুল।

'চক্রবাক' কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা অসমাত্রিক সমিল অক্ষরবৃত্তে রচিত '১৪০০ সাল'। ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তার উত্তরসুরীদের উদ্দেশ্যে '১৪০০ সাল' কবিতাটি। 'চিত্রা' কাব্যে সংকলিত এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ কাব্য রসিক ও অনুরাগীদের জন্যে যে আবেগ ও ইচ্ছা রেখে গিয়েছিলেন তার বত্রিশ বছর ১৩৩৪ সালের ১৭ই বৈশাখ নজরুল তার উত্তর দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,
আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতুহল ভরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

কবি রবীন্দ্রনাথ 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'র উত্তরে নজরুল তার '১৪০০ সাল' কবিতায় লিখেছেন,

আজি হতে শত বর্ষ আগে
হে কবি, স্মরণ করেছিলে আমাদের শত অনুরাগে
আজি হতে শতবর্ষ আগে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এক বসন্ত প্রকৃতিতে এ সুন্দর পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা সঞ্চারিত হয়েছিল। নজরুলের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সে বেদনার জন্যে আছে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মর্তপ্রীতি ও বিচ্ছেদ বেদনা নজরুলের কবিসত্তায় সম্প্রসারিত হয়নি, আজকের বসন্তকে উপভোগ করতে গিয়ে সেদিনের বসন্ত আর সে বসন্তের কবিকে মনে পড়লেও ঐ বিচ্ছেদ বেদনা নজরুলকে আকুল করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে নজরুল ঢাকা এলে কাজী মোতাহার হোসেনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক-বিভাগের ছাত্রী ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে পরিচিত এবং ঘনিষ্ট হন। ঢাকা থেকে কলকাতা গিয়ে ফজিলাতুন্নেসাকে লেখা পত্রের অনুকূল সাড়া পাননি। কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে ফিরে ১৩৩৪ সালের ২৬শে চৈত্র তারিখে 'এ মোর অহংকার' নামে রচিত 'জিঞ্জীর' কাব্যে সংকলিত কবিতাটি থেকে ফজিলাতুন্নেসার পত্রে নজরুলের প্রতিক্রিয়ার সন্ধ্যান পাওয়া যায়,

নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠ হার,
তোমায় আমি করব সৃজন এ মোর অহংকার!
এইতো আমার চোখের জলে,
আমার গানে সুরের ছলে,
কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়,
নিত্যকালের প্রিয়া আমায় ডাকছে ঈশারায়।

১৯২৮ সালের ২০শে মার্চ তারিখে নজরুল লেখেন 'রহস্যময়ী' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটি ১৩৩৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' নামে 'চক্রবাক' কাব্যে সংকলিত। চৌদ্দ মাত্রার সমিল অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত নজরুলের 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' বা 'রহস্যময়ী' কবিতাটি একটি করুণ ও বেদনা বিধুর অভিজ্ঞতার আন্তরিক ও অকৃত্রিম পরিচর্যায় বিশিষ্ট। কিন্তু না পাওয়া প্রিয়ার প্রতি শুধু অভিমান নয়, অভিযোগের ও প্রকাশ করেছেন কবি 'চক্রবাক' কাব্যের 'আড়ালে' কবিতাতে,

আমি কি তোমার দেবতা- পূজার
ছড়ায়ে ফেলেছি ফুল- সম্ভার?

ব্যর্থ প্রেমের বিচিত্র আবেগ 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' এবং 'আড়ালে' কবিতার মতো 'চক্রবাক' কাব্যের 'অপরাধ শুধু মনে থাক' কবিতাটির মৌল আবেগ। যেহেতু প্রেমের আবেগ উৎসারিত হয়েছিল এককভাবে সে জন্যেই বুঝি অপরাধের কথা আসে, কিন্তু প্রেম যে একান্তভাবেই অবুঝ কোন যুক্তি, নীতি, বিধি-নিষেধ মানতে চায় না, প্রেমের কুঁড়ি প্রতিদান না পেলেও ফুল হয়ে ফুটে উঠে ব্যর্থতার বেদনা তাতে রস সিঞ্চন করে, প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেম বৃক্ষ দিনে দিনে বেড়ে ওঠে। উপগ্রহের মতো প্রেমিকের স্মৃতিকে ঘিরে প্রেমিক দিশেহারা হয়ে ঘুরতে থাকে, ব্যর্থ প্রেমের এই অসহায় অবস্থাটি 'অপরাধ শুধু মনে থাক' কবিতায় চিত্রিত হয়েছে। অভিমানী প্রেমিকের বেদনা 'আড়ালে' এবং 'অপরাধ শুধু মনে থাক' এই দুটি কবিতাতে বিশ্বস্তরূপে ধরা পড়েছে। 'হিংসাতুর' কবিতারও মূল আবেগ প্রেমিকের অভিমান কিন্তু নায়িকা ভিন্ন। যৌবনের প্রারম্ভে নজরুল হৃদয়ের সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়েছিলেন কুমিল্লা জেলার দৌলতপুর গ্রামের সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে। নার্গিস খানমের প্রতি নজরুলের বক্তব্য ধরা পড়েছে 'হিংসাতুর' কবিতায়। কবি প্রেমের অপমান সইতে পারেন নি তাই বর সেজেও বাসর হয়নি। কবি এক জনকে পেয়ে হারিয়েছিলেন আর একজনকে তিনি পাননি। এই পেয়ে হারানো এবং না পাওয়ার বেদনা একাকার হয়ে কবির প্রেমিক

Dhaka University Institutional Repository

সত্তাকে করে তুলেছে বিচ্ছেদের, বিরহের, বেদনার প্রতিমূর্তি। জীবনে যার দেখা মেলেনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বুঝি তাকে পাওয়া যায়, রাঙা মৃত্যু রূপে সে রানী ধরা দেয়। 'চক্রবাক' কাব্যের 'সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে' কবিতায় বিরহী কবির ঐ চেতনা মৃত্যুর চিত্রকল্পে ধরা পড়েছে,

দেখা দিলে রাঙা মৃত্যুর রূপে এতদিন কি গো রানী
মিলন- গোধূলী লগনে শুনালে চির বিদায়ের বানী।
যে ধূলিতে ফুল ঝরায় পবন
রচিলে সেথায় বাসর শয়ন,
বারেক কপোলে রাখিয়া কপোল, ললাটে কাঁকন হানি'
দিলে মোর 'পরে সকরুণ করে কৃষ্ণ কাফন টানি।

মরণ ও বিবাহ, মৃত্যু ও বর এর রূপকে নজরুল ব্যর্থ প্রেমের, চিরন্তন বিরহের যে চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন 'সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে' কবিতায় তা এক বেদনা বিধুর ও করুণ আবহের সৃষ্টি করেছে। মরণের মাঝে বিবাহের নহবতের সুর অত্যন্ত বেদনার্ত।

চির বিরহ 'চক্রবাক' কাব্যের মূল সুর। চক্রবাক- চক্রবাকীর সম্পর্কে কবি তাঁর বিরহী প্রেমিক সত্তা ও প্রিয়তমার মধ্যে চির বিচ্ছেদের রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, 'চক্রবাক' কাব্যের নামহীন প্রথম কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

'চক্রবাক' কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতি একাকার, কবি প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া বা না পাওয়া প্রিয়ার অস্তিত্ব অনুভব করতে চেয়েছেন। রজনীর গীত কোলাহল শেষে 'স্তব্ধ রাতে' কবি তার সাথী আঁখি জলকে বুক ছেড়ে অতন্দ্র নয়ন পাতায় নেমে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই স্তব্ধ রাতির এক অবিস্মরণীয় চিত্রকল্প,

আকাশে শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল,
রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল,
কোন গ্রহে কে জড়ায়ে ধরেছে প্রিয়ায়,
উল্কার মানিকছিঁড়ে ঝরে' পড়ে যায়।
আঁখি জলে তুই নেমে আয়
বুক ছেড়ে নয়ন পাতায়।----------

এই অপূর্ব চিত্রকল্প সৃষ্টির জন্যেই নজরুলকে মূলতঃ চিত্রকল্পের কবি বলতে হয়।

'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুরসারি' নজরুলের একটি বিশিষ্ট কবিতা, 'চক্রবাক' গ্রন্থের এ কবিতাটি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী চট্টগ্রামে বাহার-নাহার-দের বাড়িতে রচিত। নজরুল যে পরিবেশে 'অ-নামিকা' ও 'গোপন প্রিয়া' কবিতা দুটি রচনা করেছিলেন সেই একই পরিবেশে 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' রচিত। কবিতার প্রেরণা এক ও অভিন্ন, সেদিনের নামহীনা গোপন প্রিয়াই আজ নির্বাক গুবাক তরুর রূপকে এ কবিতায় উপস্থিত। নিদ্রিত অতিথির ললাটে যার নিশ্বাস লাগে, যে অতিথির শিয়রে বিনিদ্র রজনী তপ্ত ললাটে ব্যজন করে সেই স্বপনচারী নিশীথ রাতের বন্ধু, গুবাক তরুর রূপকে প্রকাশিত। 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতায় এক কিশোরীকে ঘিরে

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষণিকের অতিথির মনে যে স্বপ্ন রচিত হয়েছিল, কিশোরীর মনে তার প্রতিফলন ছিল কিনা কে জানে, কিন্তু কবির মন তো তাকে ভেবেছে। কবি তো তাকে নিয়ে ঘর সাজাতে চান নি, কেবল অমরাবতী সৃজন করেছেন, কবির আশ্বাস,

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিবনা।
কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।
- নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।

প্রেমিক কবি চিরদনিই তো গন্ধ বিধুর ধূপের মতো আপনার মনে একাকী পুড়েছেন, সে গন্ধে সবাই মোহিত হয়েছে কিন্তু কবি পুড়ে ছাই হয়েছেন, কবির নিজের চিত্রকল্প ঐ উদ্ধৃতি।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে চট্টগ্রামে এসে নজরুল সিন্ধুকে পেয়েছিলেন ভরা বর্ষার উদ্দামতায়, ফলে সৃষ্টি হয়েছিল 'সিন্ধু' প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গ কবিতা সমষ্টি। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শীতে চট্টগ্রামে এসে সন্দীপে গিয়ে নজরুল প্রত্যক্ষ করলেন সিন্ধুর শান্ত সমাহিত রূপ যার ফল 'চক্রবাক' কাব্যের 'শীতের সিন্ধু' কবিতাটি।

বেদনার জয়গানে মুখর অনন্ত বিচ্ছেদ ও বিরহের চিত্র 'সিন্ধু'র মতো 'শীতের সিন্ধু' কবিতাতেও চিত্রিত, সঙ্গে সঙ্গে সীমা থেকে অসীমের পথে উল্কার মতো ছুটে চলা এবং গিরিচূড়া হতে দিশেহারা নদীর গতি লক্ষণীয়। অসীমের জন্যে এই বিচ্ছেদ বেদনা, এবং অসীমের প্রতি ছুটে চলার দুর্বার গতিবেগ রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নজরুলের 'সিন্ধু' কবিতা সমষ্টি রচিত হয়েছিল অসম-মাত্রিক সমিল অক্ষরবৃত্তে কিন্তু 'শীতের সিন্ধু' সমিল চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত, বোঝা যায় 'সিন্ধু'তে আবেগ যতটা ছিল অসম 'শীতের সিন্ধু'তে ততটা অসম নয়।

চট্টগ্রামে গুবাক তরু আর শীতের সিন্ধুর মতো কর্ণফুলী নদীকেও কবি বন্ধুত্বে বরণ করে নিয়েছিলেন, নজরুলের কবিতায় চট্টগ্রামের নিসর্গ সৌন্দর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে বিশেষতঃ কবির মানস প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি রূপে। নজরুলের কবিতায় পূর্ববাংলার পদ্মা, মেঘনা, গোমতী নদী পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়েছে, তবে একমাত্র কর্ণফুলী নদীই একটি সম্পূর্ণ কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে, বর্ষার বা শীতের সিন্ধুর মতো 'কর্ণফুলী' ও কবির অশ্রু বির্সজনের সাক্ষী।

'চক্রবাক' কাব্যের 'পথচারী' কবিতায় মুসাফির পথচারী রূপে আপন প্রকৃতির বর্ণনায় কবি নদীর চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, মনে হয় কর্ণফুলির প্রভাব পড়েছে ঐ বর্ণনায়।

কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,
দুধারে দুকূল দুঃখ-সুখের মাঝে আমি স্রোত-বারি।
আপনার বেগে আপনি ছুটেছে জন্ম-শিখর হতে
বিরাম-বিহীন রাত্রি ও দিন পথ হতে আনপথে।

নদীর স্রোত, অবিরাম গতি প্রবাহ ও সাগর পানে ছুটে চলার মধ্যে কবির আপনার ছুটে চলার সাদৃশ্য খুঁজে পান। নদী সাগরে মেশার জন্য যেমন ছুটে চলে কবিও প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন আশে

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি চলেন, 'মিলন- মোহনায়' কবিতাটির মধ্যে কবি ও নদীর সেই সাদৃশ্য, কিন্তু নদী সাগরে মিশে, কবির মিলন হয় না প্রীতমের সঙ্গে, তার ভালবাসার স্রোত বালুচরে পথ হারায়।

বেদনার নিশীথ তমসা তীরে বিরহী চক্রবাক যেমন প্রভাত সূর্যোদয়ের সাথে মিলনের মোহনাতে চক্রবাকীর ডাক খুঁজে ফেরে 'চক্রবাক' কাব্যেও তেমনি বিরহ নিশীর অবসানে প্রভাত সূর্যে মিলন মোহনা কামনা করে আশার আলোক চেয়ে কবি 'চক্রবাক' কাব্যের ইতি টেনেছেন।

নজরুলের 'চক্রবাক' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিবেদিত '১৪০০সাল' বাদে বাকি আঠারটি কবিতায় স্বগত সংলাপে নজরুলের প্রেমিক হৃদয়ের অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'চক্রবাক' গ্রন্থটি নজরুল তাঁর ঢাকার অন্যতম সুহৃদ অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রকে উৎসর্গ করেছেন। 'চক্রবাকে' বিভিন্ন কবিতায় নজরুলের যে আবেগ তার উৎস কুমিল্লার নার্গিস, ঢাকার ফজিলাতুন্নেসা বা চট্টগ্রামের নাহার যে-ই হোক না কেন বিশেষ থেকে সৃষ্ট আবেগ এ কাব্যে নির্বিশেষে আবেগে পরিণত হয়েছে, যে আবেগ অভিজ্ঞতার পরিচর্যা এ কাব্যে যেমন অকৃত্রিম তেমনি গভীর। হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত আবেগের চয়নে নজরুলের 'চক্রবাক' কাব্য অনন্য।

প্রেম ও প্রকৃতির কবিতাঃ- পঞ্চম পর্যায়,

রফিকুল ইসলামের মতে, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে অসুস্থ হবার অব্যবহিত পূর্বে নজরুল যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গীতি কবিতা রচনা করেছিলেন সেগুলি 'নতুন চাঁদ' (১৯৪৫) গ্রন্থে সংকলিত। 'নতুন চাঁদ' গ্রন্থে সংকলিত ছয়টি গীতি কবিতা রোগাক্রান্ত হবার পূর্বে রচিত। ১৯৩২ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারী তারিখে নজরুল 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং গিয়েছিলেন। 'বর্ষবাণী' (১৩৪২) বার্ষিকীতে সংকলিত 'সুখবিলাসিনী পরাবত' কবিতাটি পর্বাহ্নে রচিত। এই কবিতায় জাহান আরার ছায়া পড়েছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'সুখবিলাসিনী পরাবত'-এ কবির অনুভূতি গভীর নয়, লঘু কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে রচিত 'নতুন চাঁদ' গ্রন্থে সংকিলত গীতি কবিতাসমূহে কবির যে বেদনাময় আবেগ ও অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে তা নজরুলের শেষ পর্যায়ের প্রেম কবিতাকে নতুন গভীরতা দান করেছে। নজরুলের কবি জীবনের শেষ পর্বে রচিত কিছু কবিতায় কবি 'চির-জনমের প্রিয়া'র জন্যে আকুল। জীবনে যাকে মেলেনি জীবন প্রদীপ নিভে যাবার আগে তার জন্যে আকুলতা স্বাভাবিকভাবেই তীব্র 'চির-জনমের প্রিয়া' কবিতায়।

আরও কতদিন বাকী?
বক্ষে পাওয়ার আগে বুঝি, হায়, নিভে যায় মোর আঁখি?

'নতুন চাঁদ' গ্রন্থের 'চির-জনমনের প্রিয়া' কবিতায় কবি তাঁর অতৃপ্ত চিত্তকে সাহারা মরুরূপে বর্ণনা করেছেন, তার প্রেম তৃষ্ণা মেটেনি বলে তা মরুভূমির তৃষ্ণারূপে প্রতিভাত হয়েছে, অম্লান হয়ে রয়েছে রৌদ্র-দগ্ধ আকাশ-তল। কিন্তু 'আমার কবিতা তুমি' কবিতায় তিনি যখন কবিতাকে প্রিয় রূপে বরণ করে নিয়েছেন তখন তিনি শান্তি খুঁজে পেয়েছেন, কবির বিশুদ্ধ মরুভূমি চিত্ত মরুদ্যানের মতো শ্যামল ও সরস হয়ে উঠেছে,

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়া-রূপ ধ'রে এতদিনে এলে আমার কবিতা তুমি,
আঁখির পলকে মরুভূমি যেন হয়ে গেল বনভূমি।
জুড়ালে গো তার শত জনমের রৌদ্র-দগ্ধ কায়া
এতদিনে পেল তার স্বপনের স্নিগ্ধ মেঘের ছায়া।

বঞ্চিত প্রেমিককে না পাওয়ার বেদনা, হাহাকার, অভিমান ও ক্ষোভ ও দুরীভূত হয়েছে এ কবিতায়।

কবি প্রেমের জ্বালা যন্ত্রণা ও বিরহের অবসান খুঁজেছেন 'আমার কবিতা তুমি' কবিতায়, যেখানে প্রিয়া ও কবিতা একাকার হয়ে গিয়েছে, যে প্রিয়তমাকে তিনি পাননি তাকে কবিতার মধ্যে দিয়ে খুঁজে পেতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রশান্তি তিনি লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ, তাই 'নতুন-চাঁদ' গ্রন্থের 'নিরুক্ত' কবিতায় পুণরায় তাঁর প্রিয়ার উদ্দেশ্যেই সংলাপ,

আর কতদিন রবে নিরুক্ত তোমার মনের কথা?
কথা কও প্রিয়া, সহিতে নারি এ নিদারুন নীরবতা-
হের গো আমার তৃষিত আকাশ তব অধরের কাছে
যে কথা শোনার তরে শত যুগ আনত হইয়া আছে,

প্রেমিকের ব্যর্থতা, হতাশা, অভিমান ও ক্ষোভ নজরুলের প্রেম কবিতায় সাধারণতঃ এককভাবে উচ্চারিত, প্রেমিক নজরুলের প্রেমের কবিতায় নিষ্ঠুর ও পাষাণ রূপে প্রতিভাত, প্রেমিকা আগাগোড়া নিরুক্ত, 'দোলন-চাঁপা' গ্রন্থে 'অবেলার ডাক' কবিতায় নজরুলের অকরুণ পিয়ার আবেগ ক্ষণকালের জন্যে উন্মোচিত হয়েছিল,

অনেক করে বাসতে ভালো পারিনি মা তখন যারে,
আজ আবেলায় তারেই মনে পড়েছে কেন বারে বারে।।

পুনরায় 'নতুন চাঁদ' গ্রন্থের 'সে যে আমি' কবিতায় তা ব্যক্ত হতে দেখি। কিন্তু এখানেও অভিমান ক্ষুব্ধ প্রেমিকার উদ্দেশ্যে প্রেমিকের প্রশ্ন ও সংলাপে প্রেমিকের স্বরূপটাই মুখ্যতঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

ওগো দুরন্ত সুন্দর মোর 'কার' পরে রাগ করি',
তারার মুক্তা মালিকা 'ছিঁড়িয়া ছড়ালে গগন ভরি?'
কারে তুমি ভালবাসো প্রিয়তম? কার নাহি পেয়ে দেখা
চাঁদের কপোলে মাখাইয়া দিলে কালো কলঙ্ক- লেখা?
সে কি আমি? সে কি আমি?

প্রেমিক-প্রেমিকাকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রত্যক্ষ করে নজরুল অরূপকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন কোন কোন কবিতায়। প্রসঙ্গক্রমে 'নতুন চাঁদ' গ্রন্থের "অভেদম" কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। সৃষ্টির বিচিত্র রূপের মধ্যে তিনি অরূপকে, বহুরূপীর মধ্যে এককে, অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে খুঁজে পেয়েছেন, 'পরম-আমি'কে।

'নতুন চাঁদ' গ্রন্থের 'আর কতদিন' কবিতায় আকাঙ্খিতের আগমনের প্রতীক্ষার চিত্রকল্প ফারসী কবিতার আদলে নির্মিত। তবে 'আর কতদিন' কবিতাটি পরিণতিতে সুফী আবহই প্রাধান্য পেয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোতির মোতির মালা গলে দিয়া সহসা স্বর্ণরথে
কে যেন হাসিয়া ছুঁইয়া আমারে পালাল অলখ-পথে।
'ও কি জৈতুনী রওগন, ওরই পারে জল পাই-বনে
আমার পরম- একাকী বন্ধু খেলে কি গো নিরজনে?-----

'নতুন চাঁদ' গ্রন্থে সংকলিত গীতি কবিতাগুলির নজরুলের সৃষ্টিশীল প্রতিভার শেষ পর্যায়ের গীতি কবিতা সমষ্টি। কবির অসুস্থ হওয়ার পূর্বে রচিত কয়েকটি কবিতা 'শেষ সওগাত' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ কবিতাগুলির সুর হতাশা ও নৈরাশ্যে ভরা। যেমন- 'কেন আপনারি হানি হেলা', 'বন্ধুরা এসো-ফিরে', 'তুমি কি গিয়াছ ভুলে' ও 'আত্মগত' কবিতা সমষ্টি। সমষ্টিগত জীবনে কবির কণ্ঠে আশার গান ধ্বনিত হয়েছে শেষ অবধি, ব্যক্তি জীবনে তাকেই গাইতে হয়েছে বেদনার গান। নজরুলের উদ্দীপনামূলক কবিতা ও গীতি কবিতার আবেগ অভিজ্ঞতার মধ্যে এই পার্থক্য লক্ষণীয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নজরুলের কণ্ঠে হতাশার সুর পরিলক্ষিত হয়নি অথচ যে সব কবিতায় আত্মগত ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে একটা অতৃপ্ত আত্মার আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে, নজরুলের প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা ঐ অশান্ত ও অতৃপ্ত চিত্তের ক্রন্দনরোল।

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা,
রফিকুল ইসলাম নজরুলের বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ করেছেন নিম্নরূপ, 'অগ্নিবীণা' নজরুলের প্রথম উদ্দীপনামূলক কাব্য। এ কাব্যে সংকলিত 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী'. 'রক্তাম্বরধারিনী মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু' এই পাঁচটি কবিতায় হিন্দু ঐহিত্য এবং 'কামাল-পাশা', 'আনোয়ার', 'রণ-ভেরী', 'শত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী' ও 'মোহররম' এই সাতটি কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য প্রাধান্য পেয়েছে। এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় পৌরাণিক, সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রের মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটনের রূপকে স্বদেশ, সমাজ ও জাতির মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা হয়েছে। 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের প্রতিটি কবিতাই দীর্ঘ, আবেগপ্রধান এবং নাটকীয়। স্বরবৃত্তে রচিত 'প্রলয়োল্লাস', 'কামাল-পাশা'। মাত্রাবৃত্তে রচিত 'বিদ্রোহী' 'রক্তাম্বরধারিনী মা', 'আগমনী,' 'ধূমকেতু', 'রণভেরী', 'শত-ইল-আরব', 'আনোয়ার', 'খেয়াপারের তরণী' ও 'মোহররম' চার মাত্রার এবং 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিনী মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু', 'রণ-ভেরী' ও 'কোরবানী' মূলতঃ ছয় মাত্রার চালে রচিত। শুধু 'অগ্নি-বীণা' কাব্যেই নয়, অন্যান্য কাব্যে উদ্দীপনামূলক কবিতাতেও নজরুল প্রধানতঃ মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে উদ্দীপনামূলক কবিতা রচনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নির্দশন 'বিষের বাঁশী', কাব্যের 'মুক্তপিঞ্জর' ও 'ঝড়' (পশ্চিম তরঙ্গ) এবং 'সিন্ধু- হিন্দোল' কাব্যের 'দ্বারে বাজে ঝাঞ্ঝার জিঞ্জীর'। 'বিষের বাঁশী'র 'জাগৃহি' কবিতায় নজরুল সংস্কৃত তোটক ছন্দ আর 'সন্ধ্যা' কাব্যের 'শরৎচন্দ্র' কবিতায় চন্ড বৃষ্টি প্রপাত ছন্দের ব্যবহার করেছেন। 'মরু ভাস্কর' কাব্যে নজরুল তিনটি বাংলা মুল ছন্দেরই ব্যবহার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'অগ্নি-বীণা' বা 'বিদ্রোহী' পর্বে নজরুল পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যার জন্যে স্রষ্টাকে দায়ী করেছেন, তখনও তার বিদ্রোহ ছিল তত্ত্বগত। 'ধূমকেতু' বা 'বিষের বাঁশী'- ভাংগার গান' পর্বে নজরুলের বিদ্রোহ আর তত্ত্বগত নয়, তখন তা বস্তুগত; তাই তখন তিনি বিপ্লবী, রাজবন্দী, অনশনরত।

'সাম্যবাদী' কবিতাসমূহে মানুষের যে ব্যবধান দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে তা মূলতঃ ধর্মীয় ব্যবধান। মানুষের হৃদয়কেই শ্রেষ্ঠ ভজনালয়, শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান ও সাধারণ সাধনার পাদপীঠ রূপে বিবেচনা করা হয়েছে যা বাংলার মরমী ঐতিহ্যের অনুসৃতি। তুলনামূলকভাবে 'সর্বহারা' গ্রন্থে শ্রেণীচেতনা স্পষ্ট; তিনি সেখানে কৃষক, শ্রমিক, ধীবর প্রভৃতি শ্রেণীর জন্যে গান রচনা করেছেন। 'সাম্যবাদী'র মরমী চেতনা 'সর্বহারা'তে সংগ্রামী চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

'ফণি-মনসা' কাব্যে দেশের পরাধীনতা বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভেদ কবির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এই কাব্যের কোন কোন কবিতায় হতাশা ও নৈরাজ্য ছায়াপাত করেছে, যা-নজরুলে আগে দেখা যায়নি। ইসলামের বীর পুরুষদের পরিচয় 'জিঞ্জীর' গ্রন্থে যেমন জীবন্ত, নজরুলের অন্য কোন গ্রন্থে তেমনটি নেই। ইসলামের ঐতিহ্য, গৌরব আর ইতিহাসকে অপর কোন গ্রন্থে নজরুল এমন বিশদ ও বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করেননি। এ কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের যে ঐতিহ্য নজরুল সৃষ্টি করলেন পরবর্তীকালে তা অনুসৃত হয়েছে। 'জিঞ্জীর' আধুনিক বাংলা কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য রূপায়ন ধারার পথপ্রদর্শক।

'প্রলয়-শিখা' গ্রন্থে সমকালীন দেশ-কাল বিশেষতঃ স্বদেশের সমসাময়িক রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ছায়াপাত করেছে। 'সন্ধ্যা' গ্রন্থে নজরুলের যৌবন বন্দনায় যে বিশিষ্ট রূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করি, নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্যায়ে রচিত কিছু কবিতায় সে যৌবন শক্তির পরিচর্যা দেখতে পাই। এ কবিতাগুলি 'নতুন চাঁদ', 'শেষ-সওগাত', 'ঝড়' গ্রন্থে সংকলিত। এ পর্বে নজরুল নদীর স্রোতকে যৌবনের প্রতীক বা রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ উপামা ও চিত্রকল্পের জন্যে নজরুল প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, পুরাণোশ্রয়ী হন নি।

নজরুল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাব ও তিরোভাব নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন, আর কবি জীবনের মধ্য পর্যায়ে রসুলুল্লাহর জীবনী নিয়ে একটি পূর্ণ কাব্য রচনায় ব্রতী হন। 'মরুভাস্কর' কাব্যটি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নজরুলের লেখনী নীরব হয়ে যায়। নজরুলের কবি জীবনের প্রথম পর্বে কোন কোন কবিতায় ঈশ্বরদ্রোহিতার অভিযোগ উঠেছিল কিন্তু শেষ পর্যায়ে রচিত কয়েকটি কবিতায় আল্লাহতায়ালাকে প্রিয়তম, প্রেমময়, পরম সুন্দর, চরম-পতি, ধ্যান-জ্ঞান, তনু-মম-প্রাণ ও পরম গতিরূপে কল্পনা করেছেন। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও পরম বিশ্বাসী রূপে আল্লাতায়ালার জয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্য থেকে বিদায় নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক প্রথম কাব্য 'দোলন-চাঁপা' প্রকাশ কালের দিক থেকে 'ছায়ানট' গ্রন্থের পূর্ববর্তী কিন্তু 'ছায়ানট'-এ সংকলিত অনেক কবিতার রচনাকাল 'দোলন-চাঁপা'র অন্তর্ভূক্ত কবিতাবলীর পূর্ববর্তী। 'ছায়ানট'-এ সংকলিত অনেকগুলি কবিতায় নার্গিসের সংগে নজরুলের সম্পর্ক আর কিছু কবিতায় প্রমীলার সঙ্গে পূর্বরাগ ছায়াপাত করেছে। 'দোলন-চাঁপা'য় প্রমীলা বা দোলনা দেবীর সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক অন্যতম মুখ্য আবেগ। 'ছায়ানট' গ্রন্থের নামকরণে নজরুল সঙ্গীতের আশ্রয় নিয়েছেন আর 'দোলন-চাঁপা'র নামকরণে প্রকৃতির।

প্রেমের পরিণতি ও সার্বজনীন আবেগের পরিচর্যা দেখি 'দোলন-চাঁপা' 'পূজারিণী' কিংবা 'ছায়ানট'-এর 'চৈত্রী হাওয়া' কবিতায়। নজরুলের প্রেম ও প্রকৃতি চেতনা বিচ্ছিন্ন নয় বরং অনেক ক্ষেত্রেই-একাকার, প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি প্রকৃতিতে সমর্পিত। 'দোলন-চাঁপা' ও 'ছায়ানট'-এর কোন কোন কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির এই অবিমিশ্র রূপ ধরা পড়েছে। প্রেমের কবিতায় নজরুল আদর্শ, অমানবিক, রহস্যময়ী, মানস-সুন্দরী বা জীবন দেবীর উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রী নন। কিন্তু কোনো আদর্শ প্রিয়াকে, অনামিকাকে কামনা-বাসনার সীমিত গন্ডীর মধ্যে পাওয়ার জন্য ক্রন্দনরত, চির-বিরহী। 'সিন্ধু-হিন্দোল' গ্রন্থের 'অনামিকা' কবিতায় আমরা এ ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ করি। নজরুলের প্রেমের কবিতায় অতৃপ্ত যৌবন ক্ষুধা আর উদগ্র কামনার দীর্ঘশ্বাস বা রক্তিম অতৃপ্ত আবেশের ছোঁয়া অনুভব করা যায় 'সিন্ধু-হিন্দোল'-এর কোন কোন কবিতায়।

'জিঞ্জীর' গ্রন্থে 'বার্ষিক সওগাত' ও 'অঘ্রাণের সওগাত' নজরুলের সৌন্দর্য চেতনার দুটি দিককে স্পষ্ট করে। নজরুলের কবিতায় কল্পনা ও বাস্তব উভয় সৌন্দর্যই পাশাপাশি ব্যবহার লক্ষ্য করি। 'চক্রবাক'-এর রোমান্টিক বিষন্নতা প্রেমও প্রকৃতিকে অবলম্বন করে উৎসারিত হয়েছে, এ কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতি একাকার। 'চক্রবাক' কাব্যে চট্টগ্রামের নিসর্গ সৌন্দর্য একটা বড় অংশ জুড়ে আছে, 'গুবাক তরুর সারি', 'সিন্ধু', 'কর্ণফুলী', 'গিরি-পাহাড়'এ কাব্যের পটভূমিকা। 'নতুন চাঁদ' গ্রন্থে সংকলিত কয়েকটি গীতি কবিতায় কবির আবেগ ও অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বেদনাময় এবং গভীর। নজরুলর কবি জীবনের শেষ পর্বে রচিত এ সমস্ত কবিতায় কবিকে 'চির-জনমনের প্রিয়া'র জন্যে আকুল দেখা যায়।

রফিকুল ইসলামের ভাষায়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নজরুলের কণ্ঠে হতাশার সুর পরিলক্ষিত হয়নি অথচ আত্মগত কবিতাসমূহে একটা অতৃপ্ত আত্মার আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে। নজরুলের গীতি কবিতা এই অতৃপ্ত চিত্তের ক্রন্দনরোল, নজরুলের উদ্দীপনামূলক কবিতার মতো প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য বিষয়ক কবিতাবলী প্রধানতঃ স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত হলেও কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত যেমন, 'দোলন-চাঁপা', কাব্যের 'বেলাশেষে' ও 'পূজারিণী', 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যের 'সিন্ধু', 'অনামিকা', 'চক্রবাক' কাব্যের 'তোমারে পড়িছে মনে', 'স্তব্ধ বাদল', '১৪০০ সাল', 'শীতের সিন্ধু', 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' প্রভৃতি কবিতা। 'দোলন-চাঁপা'র 'দোদুল-দুল' কবিতায় নজরুল আরবী 'মোতাকারিব' ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। 'ছায়ানট' কাব্যের 'পূর্বের হাওয়া' বা 'ঝড়' (পূর্বতরঙ্গ) কবিতায় তিনটি বাংলা ও তিনটি সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত।

Dhaka University Institutional Repository

রফিকুল ইসলামের গ্রন্থ আলোচনায় আমরা পাই, লেখক নজরুল ইসলামের কবিতা রচনা বা প্রকাশের কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থে নজরুলের কবিতাকে প্রথমে বিষয়ানুগ ভাবে বিভাজন করা হয়েছে। যেমন, 'বিদ্রোহ', 'বিপ্লব' ইত্যাদি। তারপর রয়েছে এসব ধারার ভিত্তিতে বিস্তৃত আলোচনা। একটি অধ্যায় থেকে আর একটি অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনার সামাঞ্জস্য রয়েছে। কবিতা ছাড়াও গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের বিস্তৃত আলোচনা দেখতে পাই। মোদ্দাকথা লেখকের এই গ্রন্থটি নজরুল জীবন ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বহন করে।

নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্য,

রফিকুল ইসলামের মতে, নজরুলের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' (সওগাত, কার্তিক ১৩২৬) করাচি সেনানিবাসে রচিত এবং কলকাতায় প্রকাশিত। এই প্রবন্ধটি একটি প্রতিক্রিয়াজাত রচনা। পরের বছর প্রকাশিত নজরুলের তিনটি প্রবন্ধ, 'জননীদের প্রতি', 'পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব' ও 'জীবন-বিজ্ঞান' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২৭) 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার 'ম্যাগাজিন' স্তম্ভে প্রকাশিত তিনটি রচনার ভাবানুবাদ। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাত-ইল-আরবের পরিচিত টাইগ্রিস' ও ইউফ্রেটিস বা দজলা ও ফোরাত নদীর মিলিত প্রবাহের চিত্র পরিচিতি।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধ 'উদ্বোধন' (বকুল, আষাঢ় ১৩২৭) পরে 'জাগরণী' নামে 'যুগবাণী' (অক্টোবর, ১৯২২) গ্রন্থে সংকলিত। এ প্রবন্ধটি শুরু হয়েছিল বকুল ফুল ফোটাতে তা শাশ্বত বাঙালী প্রাণ এবং যৌবনকে জয়যুক্ত করার আহ্বানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত। 'জাগো যৌবনের জয়টিকা নিয়ে' স্মরণ করিয়ে দেয় যৌবন শক্তিকে জাগ্রত করার জন্যে প্রমথ চৌধুরীর আহ্বান 'যৌবনে দাও জায়টিকা' আর সঙ্গে সঙ্গে তা প্রাবন্ধিক নজরুলের প্রবন্ধাবলীর মৌল-আবেগকে চিহ্নিত করে।

প্রাবন্ধিক নজরুলের বিকাশ ঘটে সাংবাদিক জীবনে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ', (১৯২০) অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু', (১৯২২) সাপ্তাহিক 'লাঙ্গল' (১৯২৫-২৬) এবং সাপ্তাহিক 'গণবাণী' (১৯২৬)তে সমকালীন দেশকাল ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের ঘটনাবলী নিয়ে প্রকাশিত নজরুলের রচনা বা নিবন্ধে। যার মাধ্যমে প্রাবন্ধিক নজরুলের প্রতিভা ফুটে উঠে এবং তাঁর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর ও পরিচয় পাওয়া যায়। 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত কিছু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয় নজরুলের প্রথম প্রবন্ধ সংকলন 'যুগবাণী' ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। গ্রন্থখানি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

'যুগবাণী' গ্রন্থে পূর্বে আলোচিত 'জাগরণী' ছাড়া আরো বিশটি প্রবন্ধ সংকলিত। গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'নবযুগ', লিখিত হয়েছিল 'নবযুগ' পত্রিকা উপলক্ষেই কিন্তু মধ্য দিয়ে পরাধীন

Dhaka University Institutional Repository

দেশসমূহে বিশেষত ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন যে নবযুগের সৃষ্টি করেছিল তার চিত্র উজ্জ্বল। বস্তুতপক্ষে নজরুল 'নবযুগ' প্রবন্ধে বিশের দশকে ভারতের জাগরণের পটভূমিকার বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের পরিচয় দিয়েছেন রাশিয়া, তুরস্ক ও আয়ারল্যান্ডের সংগ্রামের উল্লেখে। বিশের দশকে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতে যে রাজনৈতিক জাগরণ ও সচেতনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার ওপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামের যে প্রভাব পড়েছিল সে তথ্যও ঐ প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যায়।

'গেছে দেশ দুঃখ নাই/ আবার তোরা মানুষহ' এ পংক্তিটিকে শিরোনাম রূপে ব্যবহার করে নজরুল সমকালীন মানুষের হতাশা দূর করার জন্যে আবেগময় প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। পরাধীন মানুষ যখন হতাশা থেকে উদ্ভূত অনিশ্চয়তায় দৈবনির্ভর হয়ে পড়েছিল সে মুহূর্তে নজরুলের এ প্রবন্ধ হতাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' প্রবন্ধে নজরুল জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকান্ডের নায়ক ডায়ারের নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছেন। এ প্রবন্ধে নজরুলের বক্তব্য পরিহাসছলে প্রকাশিত হলেও তার মধ্যে একটি রূঢ় সত্য লুক্কাইত ছিল।

জালিয়ানওয়ালবাগের হতভাগাদের রক্তের উপর দাঁড়াইয়া হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই গলাগলি করে কেঁদেছে। দুঃখের দিনে প্রাণের মিলন সত্যিকার মিলন হয়।

সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় কেবল পরাধীনতার বিরুদ্ধেই নজরুল সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লেখেননি, কৃষকশ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা ও আন্দোলনের সমর্থনেও তিনি লিখেছেন 'ধর্মঘট' প্রবন্ধটি। নজরুল কয়লাখনি শ্রমিকদের বাস্তব চিত্র অংকন করে তাদের ধর্মঘটের সমর্থনে বুরোক্রাসি বা আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখেছেন, তিনি শ্রমজীবীদের সংগ্রাম ও গণতন্ত্রের সংগ্রামকে একসূত্রে গ্রথিত দেখতে চেয়েছেন। আমলাতন্ত্রের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে অভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করার সংকল্প নজরুলের আগে বাংলা সাহিত্যে অপর কোন লেখকের লেখায় প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই।

'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য' প্রবন্ধে স্মৃতিচারণে প্রাধান্য পেয়েছে একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতার প্রয়াণে শোকাতুর মানুষের মিলনের দৃশ্য। শোকাতুর হিন্দু মুসলমান, মাড়োয়ারী, বাঙালী, হিন্দুস্থানীরা যে তাদের ভেদাভেদ ও জাতবিচার ভুলে এক হয়ে গিয়েছিল সেটাই নজরুলকে অনুপ্রাণিত করেছে সর্বাধিক।

বিশের দশকে খেলাফত আন্দোলনের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার একটি ছিল, বহু ভারতীয় মুসলমানদের কাছে আর ভারতবর্ষ বাসযোগ্য বলে বিবেচিত থাকেনি ফলে হিজরাত বা দেশত্যাগ শুরু হয়। ভারতীয় মুহাজিদদের প্রথম দলটি মে

Dhaka University Institutional Repository

মাসে কাবুল পৌছেন, তাঁদের একাংশের উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানে বসবাস করা কিন্তু বেশীর ভাগ মুহাজিরের লক্ষ্য ছিল আনাতোলিয়ায় গিয়ে তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধ করা। নজরুল সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় ভারত ত্যাগ করার সময় ঐ মুহাজিরিনরা কিভাবে নির্যাতিত হয়েছিল তা লিখেছিলেন ''মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে?'' প্রবন্ধে। নজরুলের আলোচ্য প্রবন্ধে মুহাজিরদের ট্রাজেডী জ্বলন্ত ভাবে রূপায়িত হয়েছে। এ প্রবন্ধের জন্য 'নবযুগ' পত্রিকার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত এবং 'নবযুগ' পত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে পরবর্তী সময়ে ঐ প্রবন্ধ 'যুগবাণী' গ্রন্থে সংকলিত হয় এবং সে গ্রন্থও নিষিদ্ধ হয়।

'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং 'যুগবাণী' গ্রন্থে সংকলিত 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধে নজরুলের সাহিত্য চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল আলোচ্য প্রবন্ধে সমকালীন সাহিত্যের সংকীর্ণতা, ভন্ডামী, অসত্য ও ব্যাধির সমালোচনা করেছেন। তাঁর কাছে সাহিত্য, লেখকের প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি, তাঁর মতে লেখকের প্রাণ হবে আকাশের মত উন্মুক্ত উদার, তাতে কোন ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড়-ছোট ভেদাভেদ থাকবে না। নজরুলের ঐ কথাগুলোর মধ্যে নজরুলের সাহিত্যিক আদর্শের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নজরুল একই প্রবন্ধে বিশ্বসাহিত্যের কথাও লিখেছেন, তাঁর ধারণায় সাহিত্য হচ্ছে বিশ্বের, সাহিত্য একজনের হতে পারে না, নজরুল সাহিত্যের জন্য অপরিহার্য সার্বজনীনতার ওপরও গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

'ছুৎমার্গ' প্রবন্ধে (নবযুগে প্রকাশিত ও যুগবাণীতে সংকলিত) জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে প্রধান কারণ রূপে নির্দেশ করেছেন।

'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'যুগবাণী' গ্রন্থে সংকলিত 'মুখবন্ধ' প্রবন্ধটি আমলাতন্ত্রকে ব্যঙ্গ করে লেখা আর 'রোজ কেয়ামত বা প্রলয় দিন' একজন বহুদর্শী বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের পৃথিবী ধ্বংসের দিন সম্পর্কে বক্তব্যের জবাবে লিখিত একটি তথ্যবহুল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। 'বাঙালীর ব্যবসাদারী' প্রবন্ধটিও বৈজ্ঞানিক।

'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?' প্রবন্ধে নজরুল বাঙালীর মনুষ্যত্বহীনতা, ভন্ডামী, অসত্য, ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণ নির্দেশ করেছেন, বাঙালী অধীন ও চাকুরীজীবি এবং ঐ পেশাই বাঙালীর দুর্বলতার কারণ।

'কালা আদমীকে গুলি মারা' প্রবন্ধে নজরুল জালিয়ানওয়ালাবাগ, কালিকট প্রভৃতি হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়ায় দেশবাসীর জাগরণের কথা বলেছেন।

'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' এবং 'লাট-প্রেমিক আলি ইমাম' ব্যঙ্গাত্মক রচনা। প্রবন্ধগুলোতে নজরুল ইংরেজ চাটুকারদের চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং 'যুগবাণী' গ্রন্থে সংকলিত বাকী কয়েকটি রচনা 'ভাব ও কাজ', 'সত্য-শিক্ষা', 'জাতীয়-শিক্ষা' ও 'জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়' শিক্ষামূলক প্রবন্ধ।

'ধূমকেতু' (১৯২২) পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের সম্পাদকীয় নিবন্ধ বা প্রতিবেদনসমূহের অধিকাংশ পরবর্তীতে প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ সংকলন 'দুর্দিনের যাত্রী' (আশ্বিন ১৩৩৩/ অক্টো-১৯২৬), 'রুদ্রমঙ্গল' (১৩৩৩-৩৪/১৯২৭) এবং 'ধূমকেতু' (মাঘ ১৩৬৭/ জানু-১৯৬১) গ্রন্থে সংকলিত। এই পর্বের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে 'ধূমকেতু' সারথী নজরুল ইসলাম 'ধুমকেতু' পত্রিকার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধে বিশের দশকের প্রথমার্ধে অসহযোগ-খেলাফত পরবর্তী যুগে দেশে যে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় রূপকধর্মী রচনায়।

রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা প্রবন্ধের বাইরে নজরুলের তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পর্যালোচনার দাবী রাখে ''বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'' (আত্মশক্তি, পৌষ, ১৩৩৪/ ডিসেম্বর-১৯২৭) ''বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য'' (বুলবুল, পৌষ ১৩৪০/ ডিসে-১৯৩৩) এবং সঙ্গীত বিষয়ক 'সুর ও শ্রুতি'। 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ', শব্দ ব্যবহার নিয়ে বিতর্কজনিত রচনা।

বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে নজরুলের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় 'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য' প্রবন্ধে বিশেষতঃ আধুনিক কালের বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে।

নজরুলের ''সুর ও শ্রুতি'' নবাব আলী চৌধুরীর 'মারিফুন নাগামত' অবলম্বনে রচিত।

প্রাবন্ধিক নজরুল মূলতঃ রাজনীতিক নজরুল কিন্তু অন্য বিষয়ে কম প্রবন্ধ লিখলেও তার মাধ্যমে তিনি সাহিত্যিক এবং সঙ্গীতজ্ঞ নজরুলও বটে। কি সাধু কি চলিত উভয় রীতিকেই তিনি সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সহজ-সরল ভাষায় স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি আবার বিষয়ানুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন। নজরুলের গদ্য অলংকৃত নয়, কি সাধু কি চলতি উভয় রীতিতেই তা সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রয়োজনে সরস। নজরুল মৌলিক কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন হয়তো সে কারণেই তাঁর প্রথম দিককার গদ্য রচনাসমূহ আবেগপ্রবন ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সাংবাদিক প্রাবন্ধিক নজরুলের গদ্য অকারণ আবেগ ও উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে বিষয়ানুগ হয়ে উঠেছিল।

নরুলের কথা সাহিত্য

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস সাহিত্য সম্পর্কে রফিকুল ইসলামের মুল্যায়ণ। নজরুলর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বের বেশ কয়েকটি গদ্যরচনা করাচী সেনানিবাসে রচিত, যেমন 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী', 'স্বামীহারা', 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'মেহের নেগার', 'ঘুমের ঘোরে' গল্প সমূহ। ঐ রচনাগুলো প্রথমে কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং পরে 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' নজরুলের ছেলেবেলার স্মৃতি নির্ভর, সুতরাং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কিশোর নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গী এ রচনায় প্রতিফলিত। কাহিনীটি শুরুতে লঘু ও হাল্কা মেজাজের হলেও শেষে বিষাদান্ত; কিন্তু কাহিনীর ভাষা আগাগোড়া হাল্কা চালের।

'স্বামীহারা' তুলনামূলকভাবে সংযত, সংহত এবং বিষয় উপযোগী।

'হেনা' গল্পে যুদ্ধ আর প্রেমের যেমন সমান্তরাল অবস্থিতি, ভাষারীতি ও তারই অনুগামী, গল্পে যুদ্ধের বর্ণনা।

'ব্যথার দান' রচনা হিসেবে পূর্বোক্ত রচনাগুলো থেকে পরিণত, দেশপ্রেমের যে প্রকাশ এ গল্পে তা অকৃত্রিম যদিও তা গোলেস্তানের রূপকে।

করচীতে বসে লেখা ঝিলম নদীর পটভূমিকায়, 'মেহের-নেগার' গল্পে গল্পে ঝিলাম নদীতে সদ্য স্নাতার বর্ণনা দিতে গিয়ে নজরুল অজান্তে বাঙালী রমনীর চিত্র অঙ্কন করেছেন।

নজরুলের আর একটি গল্প 'বনের পাপিয়া'তে নিঃসন্তান মাতৃহৃদয়ের স্নেহের প্রকাশ রয়েছে একটি বনের পাপিয়াকে কেন্দ্র করে, যে গল্পের উপসংহার দেখান হয়েছে, তার স্বামী যখন বনের পাখীকে দূর করে দিল তখন তার স্ত্রী ও হারিয়ে গেল। নজরুলের গল্প যখন বীরভূম বা ময়মনসিংহ বা ফরিদপুর অর্থাৎ রায় কিংবা পূর্ববাংলার গ্রামজীবনের পটভূমিকায় রচিত হয় তখন তাতে থাকে মাটির গন্ধ, মানুষগুলো জীবন্ত আর তা যখন শহর বানগরের পটভূমিকায় সৃষ্টি করা হয় তখন তা হয়ে পড়ে কৃত্রিম। নজরুলের প্রথম গল্প সংকলন 'ব্যথার দান'-এর 'ব্যথার দান', 'হেনা', 'বাদল-বরিষণে', 'ঘুমের ঘোরে', 'অতৃপ্ত কামনা' বা 'রাজবন্দীর চিঠি', এবং দ্বিতীয় সংকলন 'রিক্তের বেদন' এর 'রিক্তের বেদন', 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী', 'মেহের নেগার', 'সাঁঝের তারা' ও 'সালেক' গল্পের তুলনায় 'রিক্তের বেদন' সংকলনের 'রাক্ষুসী', 'স্বামীহারা', আর তৃতীয় গল্প সংকলন 'শিউলি-মালা'র 'পদ্ম-গোখরা' ও 'জিনের বাদশা' সার্থক ও শক্তিশালী গল্প। গ্রন্থকারে অপ্রকাশিত 'বনের পাপিয়া' গল্পটিকেও এর সঙ্গে যুক্ত করা চলে।

নজরুলের গল্পের নায়ক-নায়িকাদের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে তাদের মধ্যে নজরুলের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া নজরুলের গল্পের নায়িকারা কিন্তু সবাই প্রেমে একনিষ্ঠ এবং পরিণতি তাদের বিষাদান্ত।

উপন্যাস

নজরুলের পত্রোপন্যাস 'বাঁধন-হারা'র কিছুটা অংশ করাচীতে রচিত, ঐ উপন্যাসের প্রথম দিকে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ করাচী শহরের একটি বর্ণনা আছে যা লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ বলে তাঁর গল্পের কল্পনাপ্রসূত বর্ণনা থেকে ভিন্নধর্মী।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বমানবতা ও শাশ্বত সত্যের পথে ঐ সৈনিকের সংগ্রামের পরিচয় নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস 'মৃত্যু-ক্ষুধা' ও তৃতীয় উপন্যাস 'কুহেলিকা'তেও পাই।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের কলকাতায় ক্রীশ্চান আর মুসলমান মেয়েদের ঝগড়ার দৃশ্যটি অবিস্মরণীয়। এ উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতার চিত্র অংকনে নজরুল যে কি অসাধারণ দক্ষ ছিলেন তার পরিচয় খ্রীষ্টান ও মুসলমান মেয়েদের অর্থহীন ঝগড়ায় পাওয়া যায়। তবে তা অত প্রাণবন্ত এবং জীবন্ত হয়েছে নজরুলের ভাষা ব্যবহারের মুন্সীআনায়। শুধু আধুনিক চলতি রীতির ভাষা ব্যবহারে যা কখনো সম্ভব হত না, তা সম্ভব হয়েছে শুধু আঞ্চলিক ভাষা নয়, আঞ্চলিক বোল ও বুলির ব্যবহারে।

বস্তুত 'কুহেলিকা' উপন্যাস বাহ্যত বিপ্লবীদের কাহিনী হলেও এর গভীরে রয়েছে নর-নারীর আদিম প্রবৃত্তির পর্যালোচনা, যে প্রবৃত্তিগুলো কুহেলিকাময় আর তার রহস্যভেদ করার চেষ্টা করেছেন নজরুল এই উপন্যাসে।

নজরুলের মতো তাঁর নায়ক-নায়িকারাও সমকালীন দেশ-কাল-সমাজের দাবী যেমন মিটিয়েছে তেমনি মিটিয়েছে জীবনের দাবী। হৃদয়ের দাবী যেমন তারা স্বীকার করেছে তেমনি দেহের দাবীকে। লেখকের নায়ক-নায়িকারা জাতি, ধর্ম, সমাজকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। নজরুলের মতো তারাও বুঝি এক অভিন্ন মানবজাতি, মানবধর্ম ও মনুষ্য সমাজের সদস্য।

নাটক

নজরুলের যথার্থ পূর্ণাঙ্গনাটক কম। আছে কয়েকটি নাটিকা, ও গীতি-নাটক। নাটিকা সংকলন 'ঝিলিমিলি'তে (অগ্রহায়ণ ১৩৩৭/ নভেম্বর ১৯৩০) রয়েছে 'ঝিলিমিলি', 'সেতুবন্ধ', 'শিল্পী' এবং 'ভূতের ভয়'। গীতিনাট্য 'আলেয়া' (১৩৩৮/ ১৯৩১) নজরুলের সুস্থাবস্থায় কলিকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। 'মধুমালা' রূপকধর্মী গীতিনাট্যটিও কলিকাতার মঞ্চে অভিনীত হয়, রচনা কাল ১৩৩৪ সাল। প্রকাশিত (মাঘ ১৩৬৫/ জানুয়ারী ১৯৬০)। 'পুতুলের বিয়ে' (চৈত্র ১৩৪০/ এপ্রিল ১৯৩০) ছোটদের নাটক। নজরুলের অসুস্থতার পর বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত বা উদ্ধারকৃত বা প্রকাশিত 'দেবীস্তুতি' 'ঈদ', 'গুল-বাগিচা', 'অতনুর দেশ', 'বিদ্যাপতি', 'বিম্বুপ্রিয়া', 'বিজয়া', 'শ্রীমন্ত' প্রভৃতি বেশ কয়েকটি বেতার, গ্রামোফোন ও ছায়াছবির জন্য রচিত।

'ঝিলিমিলি' নাটকে পিতার নিষ্ঠুরতার ও গোয়ার্তুমীর জন্যে একটি ফুলের মতো মেয়ের ঝরে যাওয়ার দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে, যা বাঙালী মুসলমান সমাজের নিত্য ঘটনা। এ নাটকে ফিরোজা ও হাবিবের ট্রাজেডি অবাস্তব নয়। আর নাটকটি তিনটি দৃশ্যে রচিত।

'সেতুবন্ধ' একটি রূপক নাটিকা, যার কুশীলব হল ইট, কাঠ, পাথর, লোহা, যন্ত্র, যন্ত্রী, ভারবাহী পশু ও মানুষ, পীড়িত মানবাত্মা, সেতু, মেঘ, বৃষ্টিধারা, তরঙ্গ ও পদ্ম, ঝড়, বন্যা প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

'শিল্পী' নাটকে নজরুল নর-নারীর সম্পর্ক বিশেষত চিরন্তন নারী ও পুরুষ শিল্পীর সম্পর্কের তত্ত্ব উদঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন।

'ভূতের ভয়' নাটকে নজরুল বিশ ও ত্রিশের দশকে ইংরেজ ভূতের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার লড়াইতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবীদের আত্মদানের মহিমা, দর্শনকে রূপকারে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নর-নারীর হৃদয়ঘটিত নাটক 'আলেয়া' তিন অঙ্কবিশিষ্ট।

'মধুমালা' গীতিনাট্যটিও তিন অঙ্ক বিশিষ্ট এবং নাটকের কাহিনী পূর্ববাংলার লোককাহিনী ভিত্তিক রূপকথা থেকে নেওয়া।

সার্বিক আলোচনায় রফিকুল ইসলাম,

> যৌবন ধর্মের দুটি বিশিষ্ট গুণ, বিদ্রোহ আর প্রেম। নজরুলে দুটিরই উপস্থিতি প্রবল। প্রথমটির পরিচর্যা উদ্দীপনামূলক আর দ্বিতীয়টির প্রেমের কবিতায়। নজরুলের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে প্রভাব মুক্তি তা ভাব ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গীতি কবিতার ক্ষেত্রে নজরুল প্রচলিত কাব্য ঐতিহ্যের অনুসারী। প্রেম প্রকৃতি সৌন্দর্যের যে রোমান্টিক বিষন্নতা বাংলা কবিতার আধুনিক যুগে বিহারীলাল থেকে শুরু হয়ে রবীন্দ্রনাথে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে, গোবিন্দচন্দ্র দাস ও মোহিতলাল মজুমদারে যার সঙ্গে যুক্ত হয় দেহজ আবেগ, নজরুলের গীতি কবিতা সেই ধারাকে আরো অগ্রসর করেছে। প্রেমের শরীরী রূপে বা রক্তিম বাসনার পূর্ণ স্বীকৃতি দান করে নজরুল বাংলা প্রেম কবিতাকে বিহারীলালের মরমী তত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ, মোহিতলালের নৈতিক অনুশাসন থেকে মুক্তি দান করে স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করেছেন। ফলে বাংলা কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে।

লেখক আরো বলেন,

> বর্তমান শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা কবিতা কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দ্বারাই চিহ্নিত ছিল। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবির কাব্যধারাকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরিমন্ডল থেকে আলাদা করে চেনা যেত না। প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যসাধনার প্রয়াস ছিল আধুনিক বাংলা কবিতাকে ঐ গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দান করা। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য সাধনায় সে প্রয়াসের সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়।

রফিকুল ইসলামের আলোচনায় বলা যায় যে, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে সম্ভবত রফিকুল ইসলামই কেবলমাত্র রচনা বা প্রকাশ কাল ধরে নজরুলের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের সার্বিক পর্যালোচনা করেছেন। ফলে বিভিন্ন আঙ্গিকের রচনার মাধ্যমে নজরুল মানসের ক্রমবিকাশের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপর কোন সমালোচক কালানুক্রমিক ভাবে নজরুল রচনাবলীর পর্যালোচনা করেননি। রফিকুল ইসলাম একই সঙ্গেযগ নজরুলের কবিতার বিষয় ভিত্তিক আলোচনা ও করেছেন। যেমন নজরুলের কবিতাকে তিনি প্রথমে উদ্দীপনা ও প্রেমের কবিতা এই

Dhaka University Institutional Repository

দুই প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করে কালানুক্রমিক ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বলা বাহুল্য কোন কবি বা লেখকের রূপান্তর আবিস্কার করার এইটাই পথ। ফলে, রফিকুল ইসলামের আলোচনা থেকে নজরুল সাহিত্যের যথার্থ সামগ্রিক মুল্যায়ণ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

আবদুল মান্নান সৈয়দের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা

আবদুল মান্নান সৈয়দ রচিত 'নজরুল ইসলাম- কবি ও কবিতা' (১৯৭৭) গ্রন্থটি তিন খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডের ছয়টি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম অনুসরণ। সাযুজ্যমালা/ উত্তরপ্রবেশ- এ পরিচ্ছেদে নজরুলের উপর রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দনাথ ও মোহিতলালের প্রভাব ও সাযুজ্য আলোচিত হয়েছে সাক্ষ্য প্রমাণযোগে। এ সঙ্গে নজরুল প্রভাবিত বলে জীবনানন্দ দাশ, ফররুখ আহমদ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বেনজির আহমদ, দিনেশ দাস, বিমল ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, মহীউদ্দীন, (খান মুহম্মদ) মঈনুদ্দীন প্রমুখের নাম উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'সৃজন পদ্ধতিতে' প্রথম স্তরে বিভিন্ন কবিতা ও গান রচনার প্রত্যক্ষ স্থান, কাল ও উপলক্ষ তথা প্রেরণার উৎস বর্ণিত। দ্বিতীয় স্তরে কোনো কোনো কবিতার পরিমার্জনের নমুনা আলোচিত।

আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাও বারবার কালান্তর স্বীকার করে চিন্তা-চেতনায়, অঙ্গে-অন্তরে সমকালীন হবার সচেতন প্রয়াসী হয়েও সম্পূর্ণ নতুন হতে পারেননি, মনোযোগী তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাঠকের চোখে তাঁর আদি-স্বরূপ কখনো আচ্ছাদিত থাকেনি।

-এ পরিচ্ছেদে লেখক নজরুলকে কবি হিসেবে প্রায় দুভাগে বিভক্ত করে নিয়ে আলোচনা করেছেন। একটি সমাজ সত্তায় সমর্পিত, অপরটি ব্যক্তিগত নিঃসরণে। তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতাগ্রন্থগুলো স্পষ্ট দুটি গুচ্ছে বিভক্ত করে ফেলা যায়ঃ

ক. অগ্নি-বীণা (১৯২২); বিষের বাঁশী (১৯২৪); ভাঙার গান (১৯২৪); সাম্যবাদী (১৯২৫); সর্বহারা (১৯২৬); ফণিমনসা (১৯২৭); জিঞ্জীর (১৯২৮); সন্ধ্যা (১৯২৯); প্রলয়শিখা/ (১৯৩০)।

খ. দোলন-চাঁপা (১৯২৩); ছায়ানট (১৯২৫); পূর্বের হাওয়া (১৯২৫); সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৫); চক্রবাক (১৯২৯); ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত উভয় গুচ্ছের কবিতাগ্রন্থগুলোতে স্পষ্ট কবিতার যুগল বিভিন্ন ধারা প্রবাহিত; সমাজসচেতন ও আত্মচেতন ঐ দু-ধরণের কবিতা। নজরুলের গীতিগুচ্ছকে, অতঃপর, সাজিয়ে দিলে দেখা যাবে সেখানেও রয়েছে দ্বিস্রোত এবং প্রেমপ্রকৃতি প্রধান কবিতার শূন্যস্থান যেন তা সম্পূরণ করে দিয়েছে।

- এ তৃতীয় পরিচ্ছেদেই নজরুলের দ্রোহাত্মক কবিতার অলঙ্কার ও ছন্দোগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- চতুর্থ পরিচ্ছেদে নজরুলের কাব্যের সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। লেখকের মতে, নজরুল ইসলামের সংগে সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। তাই বলে নজরুল কাব্যের সংগে সংস্কৃত কাব্যের যে, সাদৃশ্য তা কম তাৎপর্যময় নয়। তাছাড়া নজরুল কাব্যের আস্বাদ গ্রহন করার জন্যেও সংস্কৃত কাব্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদিও সংস্কৃত অলংকার ও ছন্দের প্রভাব নজরুলের ওপর পরোক্ষ ও ঐতিহ্যিক মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে নজরুলের উপর ফারসী কবিতার প্রভাব ও অনুবাদ। নজরুল ইসলাম মূল ফারসি জানতেন, এবং রুমি-হাফিজ-ওমরের অনুবাদ তিনি মূল ফারসি থেকেই করেছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রয়েছে নজরুল গীতি 'নরত্মারোপ, তূলনা/ প্রতিতুলনা/ উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ, মধ্যমিল, কবিপ্রসিদ্ধি, অনুপ্রাস, প্রতিষঙ্গ,' চিত্রকল্প প্রভৃতির আলোচনা।

দ্বিতীয় খন্ডে রয়েছে দশটি পরিচেছদ। এ পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচ্য বিষয় উপক্রমণিকা, শব্দ, কবিপ্রসিদ্ধি, রূপক/ প্রতীক, অনুপ্রাস/ মিল, পূরাণপ্রয়োগ, উপমা/ উৎপেক্ষা, নরত্মারোপ, চিত্রকল্প ও ছন্দ।

উপক্রমণিকাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দের কথায়, নজরুল ইসলাম অলংকার সংস্কৃত কবি। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রোক্ত শব্দালংকার ও অর্থালংকার উভয়কেই উচ্ছিষ্ট করে গেছে তাঁর কবিতাবলি। শব্দালংকারে অর্ন্তভূক্ত অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষ প্রভৃতি; অর্থালংকারে ভূক্ত উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, প্রতীক, সমাসোক্তি, প্রতীপাভাস প্রভৃতি। নজরুল কাব্যে অনুপ্রাস ('আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া'), মধ্য-মিল, মিল বা অন্তানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস ইত্যাদির বৃষ্টি হয়ে গেছে যেন। আরোঃ বাক্প্রতিমা ও নরত্মারোপ, উল্লেখ ও পুরাণপ্রয়োগ, কবিপ্রসিদ্ধি ও সিনেসথেসিয়া, শব্দ ও ছন্দ, প্রতীপাভাস ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

শব্দঃ আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, শব্দ সৃজনে নজরুল ইসলামের স্বকীয় চারিত্র্যচিহ্ন স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর প্রিয় হাইফেন-যোগে তিনি অনেক নতূন শব্দ তৈরী করেছেন। (মোহিতলাল মজুমদারে প্রিয় ছিলো বিস্ময়বোধক চিহ্নটি ও জীবনানন্দ দাশের ছিলে ড্যাশ-চিহ্ন)। নজরুল রচিত এই শব্দাবলিকে আমরা যৌগিক শব্দ বা Compound word বলতে পারি। জেমস জয়েস-প্রভাবিত কবি ডিলান টমাস-এর শব্দসৃজনের সঙ্গে নজরুলের নির্মিত শব্দের একটি আশ্চর্য সাযুজ্য আছে। কবিতা মূলত শব্দোপায়ী-এই শব্দচেতনা-যে নজরুলের পূর্ণমাত্রায় ছিলো-তাঁর নমুনা নিম্নে দেয়া হলোঃ

১. অনুপ্রাস-অন্বিত যৌগিক শব্দঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক. বেদন-বেহাগ, ধূম্র-ধূপ, ব্যথা-পরিধি, পিনাক-পানি, রক্ত-রবি, জোর-জান, কল্যাণ-কেতু, শান্তি-শত্রু, কশাই-কঠিন ইত্যাদি।

খ. মুক্তি-তরবারি, মুক্তি-তোরণ, পরশ-সুধা, শিশির-রাত্রি, আকাশ-সীমা, হিম-মুকুর, জলদ-দ্রব, মন-নিকষ, চরণ-রেনু ইত্যাদি।

গ. ত্রয়ী বা ততোধিকের যৌগিক শব্দঃ

চিত-চুম্বন-চোর-কম্পন, অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল, শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা, পুরুষ-পরশ-সুধা, অস্ত-আকাশ-অলিন্দ ইত্যাদি।

৩. অপরাপর যৌগিক শব্দঃ

ঘুম-সেতু, রণ-ভীতু, মরণ-বধূ, মানুষ-কুঁড়ি, খুন-গৈরিক, আঁধার-পীড়িত, আকাশ-গাঙ, নয়ন-বাঁশী, ব্যথা-লেখা ইত্যাদি।

কবি প্রসিদ্ধিঃ আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায়, কবি প্রসিদ্ধির ব্যবহার নজরুল-কাব্যসাহিত্যে অবিরল; বাংলা কবিতায় যেন শেষবারের মতো কবিপ্রসিদ্ধি সমুচয় তাঁর হাতে উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বহু আচরিত চাঁদ-ফুল-পাখির তিনি শেষ কবি; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতায় যে চাঁদ-ফুল-পাখি-অতিক্রমী কবি ও কবিতার কথা উক্ত হয়েছে, তা নজরুলোত্তর বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছিলো। স্বাভাবিকভাবে এসব তাঁর প্রেমপ্রাসঙ্গিক ও নিসর্গপ্রাসাঙ্গিক কবিতাগুচ্ছেই ভিড় করেছে; বিদ্রোহপ্রধান কবিতায় অনেক কম, তাঁর একটি গ্রন্থের শিরোনামও এই কবিপ্রসিদ্ধি নির্ভরঃ ''দোলন-চাঁপা'', ''বুলবুল'', 'চোখের-চাতক' 'শিউলি-মালা' ইত্যাদি।

রূপক/ প্রতীকঃ আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, নজরুল ইসলামের কল্পনাপ্রতিভা প্রতীক বা রূপকের অনুকূল ছিলো না; কেননা যে-স্থির নিদিধ্যাসে প্রতীক বা রূপকের অবস্থান নজরুলের অস্থির, চঞ্চল, জঙ্গম সৃজনশীলতা তার বিপ্রতীপ ভূমিকা পালন করে। তাই তাঁর রূপক/ প্রতীক রচনার কোনো যত্নবান প্রচেষ্টা নেই। তারপরেও খানিকটা অধো-চেতনভাবে নজরুলের হাত থেকে নির্মাণ স্বীকার করে নিয়েছে। 'ছায়ানট' কবিতাগ্রন্থের 'বেদনা-মণি' একটি চিত্রকল্পে সংহত ও নিশিতে হয়ে উঠে প্রতীকে পর্যবসিত।

'ছায়ানট' এর উপান্ত কবিতা 'রৌদ্র-দগ্ধের-গান' কবিতা হিসেবে অপরূপ, এবং লেখকের ধারণায় নজরুলের শ্রেষ্ঠ প্রতীকী কবিতা।

অনুপ্রাস মিলঃ আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায়, অনুপ্রাস ও মিলের অজস্র বিচিত্রতা নজরুল ইসলামের কবিতা ও গীতিগুচ্ছে রয়েছে। ধ্বনির সমানুপাত ও সন্নিপাতের আনন্দ অনুপ্রাস ও মিলে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতা থেকে অনুপ্রাসের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১. আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার কলরোল-কল-কোলাহল। (বিদ্রোহী, অগ্নি-বীণা)
২. তলোয়ারে তেজ নাই, তুচ্ছ স্বার্থ (আনোয়ার, ঐ)
৩. গহন ধাঁধাঁর আঁধার বাঁধা কারায়, (পথহারা, দোলন-চাঁপা)
৪. নীল নলিনীর নীলম-অনু (নীল পরী, ছায়ানট)

অনুপ্রাসময় একটি সম্পূর্ণ কবিতাঃ 'সুবহ্-উম্মেদ', 'জিঞ্জীর'। মধ্যমিল ও অন্ত্যমিল-দুশ্রেণীর মিলেই নজরুলের খরদৃষ্টির প্রাসাদ পাই। মধ্যমিলের একটি সঞ্চিতা।

১. দহন - বনের গহন-চারী - (উৎসর্গ, অগ্নি-বীণা)
২. দিলওয়ার তুমি জোর তলওয়ার হানো, আর (আনোয়ার, অগ্নি-বীণা)
৩. আজ জল্লাদ নয়, প্রহলাদ সম মোল্লা খুন-বদন। (কোরবানী, অগ্নি-বীণা)

তাঁর কবিতার কোনো-কোনো যুগ্মপঙক্তি তো সম্পূর্ণ মিলের দৃষ্টান্ত একে আমরা বলতে পারি সর্বানুপ্রাস। 'বিষের বাঁশী' কবিতা গ্রন্থের 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' কবিতা থেকে সর্বানুপ্রাসের একটি সঞ্চয়নী তৈরী করা যায়ঃ

১. নাই তা- জ
তাই লা - জ
২. চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
৩. মর মর্মরে
নর ধর্ম রে।

নজরুলের প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা'-তেই মিলের বিচিত্রতা ও ঐশ্বর্যগুচ্ছ দেখে তাঁর এই প্রথম প্রবণতা ধরা পড়ে। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে কমে এসেছে মিলের বিচিত্রিত প্রচুর প্রবণতা, কিন্তু তা কোনো সময়েই একেবারে পর্যবসিত হয়ে যায়নি। বরং মিলের এই বিস্ময়কর বিচিত্রাভা নজরুলের কবিতার একটি বিশিষ্টতা হ'য়ে আছে।

পুরাণ প্রয়োগঃ আবদুল মান্নান সৈয়দের কথায়, নজরুল- কাব্যে পুরাণ প্রয়োগ সুপ্রচুরঃ প্রায় যে-কোনো জায়গা থেকে ছেঁকে তোলা যায়। কবিতায়, গানে, গদ্যরচনায়- সর্বত্র সতত এই প্রয়োগ; তবে স্বাভাবিক ভাবে কবিতাতেই সর্বাধিক।

নজরুলের পুরাণপ্রয়োগের রীতি দ্বিবিধ; একদিকে পুরাণ অবিকলভাবে ব্যবহৃত; অপরদিকে পুরাণের মধ্য দিয়ে কবি অপর এক কেন্দ্রে পৌঁছেছেন। একদিকে পড়ে 'সাম্যবাদী'-র কবিতাগুচ্ছ, যেখানে পুরাণ সাধারণ ও অবিকলভাবে ব্যবহৃত, অর্থাৎ কাহিনী লক্ষ্য; আর এক পাশে পড়ে 'অগ্নি-বীণা'র কবিতাগুচ্ছ, যেখানে কবি পুরাণকে নিজস্ব অর্থে ও অন্তরাখ্যানে দ্যুতিবান করে তুলেছেন। 'বিদ্রোহী' ও 'বারাঙ্গনা' কবিতার পুরাণ প্রয়োগ তুলনা করলেই এই দ্বিচারিতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গত, নজরুলের প্রথম কবিতাগ্রন্থ ''অগ্নি-বীণা''র পুরাণ প্রয়োগের যে-প্রচেষ্টা লক্ষণীয়, পরবর্তীকালে তা কমে এসেছে। কিন্তু একেবারে নির্বাপিত হয়নি কখনো। উক্ত দ্বিচারী পুরাণপ্রয়োগের একটি প্রতিতুলনামূলক নকশা পেশ করা হলো;

Dhaka University Institutional Repository

ক. ১. আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন কবির বিশ্ব।
(বিদ্রোহী, অগ্নি-বীণা)

২. ক্ষ্যাপা মহেশের বিক্ষিপ্ত পিনাক, দেবরাজ-দম্ভোলি
লোকে বলে মোরে, শুনে হাসি আমি আর নাচি বব-বম্ বলি।
(ধূমকেতু, অগ্নি-বীণা)

খ. ১. বেহেশতে সব ফেরেশতাদের বিধাতা কহেন হাসি'-
'হারুতে মারুতে কি করেছে দেখ- ধরণী সর্বনাশী।
(পাপ, সাম্যবাদী)

২. স্বর্গ-বেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হল মহাবীর দ্রোণ,
কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন।।
(বারাঙ্গনা, সাম্যবাদী)

উপমা/ উৎপ্রেক্ষাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, বস্তুত উপমা ব্যবহার একজন কবির ক্ষমতার পরিমাপ। বৃহৎ অর্থে কবিতার প্রধান অলংকারই উপমা; চিত্রকল্প, রূপক, প্রতীক, নরত্বারোপ তার অধীন। উপমা কবিকল্পনার একটি অতিপ্রত্যক্ষ লীলা। অতিব্যবহৃত উপমায় কবির তৃপ্তি নেই; আছে নূতনে, অপ্রত্যাশিতে, আশ্চর্যবিস্ময়ে;

১. চললে একা মরুর পথেও
সাঁঝের আকাশ মায়ের মতন ডাকবে নত চোখে,
ডাকবে বধূ সন্ধ্যাতারা যে।
(বেদনা-অভিমান, ছায়ানট)

নজরুলের অধিকাংশ উপমা শরীরচেতন, তাঁর আনন্দ এই সব ঐন্দ্রিয়িক ও শরীরঘন উপমায় ছারিয়ে গেছে;

১. হে সুন্দর! জল-বাহু দিয়া
ধরনীর কটিতট আছ আঁকাড়িয়া
ইন্দ্রনীলকান্তমণি মেঘলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলার সাথে দোল অনুপম।
(সিন্ধু, সিন্ধু-হিন্দোল)

'সিন্ধু-হিন্দোল' কবিতাগুচ্ছের 'মাধবী-প্রলাপ' কবিতাটিতে উৎপ্রেক্ষার উপুর্যপরি ব্যবহার চোখে পড়ে;

১. বাঁকা পলাশ-মুকুলে কার আনত আঁখি?
ওগো রাঙা-বৌ বনবধূ রাগিল না কি।
২. দূরে শাদা মেঘ ভেসে যায় শ্বেত সারসী,
ওকি পরীদের তরী, অপসরী-আরশী?

Dhaka University Institutional Repository

নিসর্গপ্রকৃতিতে আপন রক্তিম-বাসনা সঞ্চারিত করেছেন যেখানে, সেখানেই নজরুল উপমাউৎপ্রেক্ষার চঞ্চল ঐশ্বর্য ছড়িয়ে গেছে; নিসর্গ মানবে, মানব নিসর্গে স্থানবদল করে নিয়েছে; সেখানে তিনি অলংকার চঞ্চল, ছন্দঝংকৃত, ইন্দ্রিয়সঞ্চারী।

নরাত্বারোণঃ আবদুল মান্নান সৈয়দের কথায়, নিসর্গপ্রকৃতির উপর মানবত্ব আরোপ করে তাকে প্রায়ই কবি জীবিত দীপিত করে তুলেছেন এবং ঐ নরত্বারোপ অধিকাংশ সময়ে দয়িত-দয়িতা-রূপে; প্রেমে বা বাসনারক্তিমতায় তাদের নির্ভর। কবির কাব্যপর্যায় থেকে উল্লেখিতঃ

ক. তোমারে পড়িছে মনে
আজি নীপ-বালিকার ভীরু-শিহরণে,
যূথিকার অশ্রু-সিক্ত ছলছল মুখে
কেতকি-বধূর অবগুণ্ঠিত ও বুকে-
তোমারে পড়িছে মনে।

চিত্রকল্পেঃ আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায়, নজরুল ইসলাম কবি হিসেবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন; - একটি সমাজ-সত্তায় সমর্পিত, অপরটি ব্যক্তিগত নিঃসরণে। তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতাগ্রন্থগুলি স্পষ্ট দুটি গুচ্ছে বিভক্ত করে ফেলা যায়ঃ

ক. অগ্নি-বীণা (১৯২২)
বিষের বাঁশী (১৯২৪)
ভাঙ্গার গান (১৯২৪)
সাম্যবাদী (১৯২৫)
সর্বহারা (১৯২৬)
ফণি-মনসা (১৯২৭)
প্রলয় শিখা (১৯৩৪)

খ. দোলন-চাঁপা (১৯২৩)
ছায়ানট (১৯২৫)
পূবের হাওয়া (১৯২৫)
সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৭) বিমিশ্র
জিঞ্জীর (১৯২৮) বিমিশ্র
চক্রবাক (১৯২৯) ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত সমাজচেতন ও আত্মচেতন এই দুকাব্য-ধারার সার্থকতার কারণ নিহিত তাঁর চিত্রকল্পের ব্যবহারের আশ্চর্য শক্তির সুবর্ণে। শবলিত এই চিত্রকল্পের ব্যবহারে নজরুল ইসলাম পৃথক হয়ে যান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমিত প্রভাবচক্র থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যদিও যাবতীয় কাব্যলংকার উচ্ছিষ্ট করে রেখে গেছেন এবং নজরুলের উপর তাঁর ছায়াসম্পদ অবিসংবাদিত, তথাপি কল্পনার চেয়ে অকল্পনায় তাঁর দখল যেমন প্রবল তেমি চিত্রকল্প রচনা তাঁর কাব্যরচনার প্রধান উপচার নয়। সর্বোপরি, নজরুলের সমাজচেতন তথা সাময়িক প্রসঙ্গ-নির্ভর কবিতাগুচ্ছের সার্থকতার এক প্রধান অন্তকরণঃ চিত্রকল্পের যথাপযুক্তি। নজরুলের পূর্বে ও উত্তরে বহু সাময়িক প্রসঙ্গ নির্ভর কবিতা যে অধঃপতিত হয়েছে তার কারণ ব্যঞ্জনার চেয়ে বক্তব্যের চাপ বেশী, নজরুলের তাঁর স্বকীয় প্রতিভাবলে সেই প্যাটার্ণ নির্মান করেছেন, যা কবিতাতেই সংবৃত।

'অগ্নি-বীণা' ও 'দোলন-চাঁপা'ঃ পর-পর প্রকাশিত এই কবিতাগ্রন্থ- যুগে কেবল নজরুলের দ্বিধাভক্ত কাব্যপ্রবাহেরই নজির দীপ্র নয়, এই যুগল কাব্যধারার মধ্যেই রুক্ষ চিত্রকল্পের পাশাপাশি ললিত চিত্রকল্পের অবস্থান ও প্রয়োগ দ্রষ্টব্য। বস্তত, একেবারে আদিকাল থেকে নজরুল যে

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রকল্পপ্রধান কবি, তা একটি স্বতসিদ্ধ সত্য এবং এই সত্যের প্রমাণ তাঁর কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে পাওয়া যায়। কাব্য প্রসঙ্গের সঙ্গে ব্যবহৃত চিত্রকল্প কিভাবে পরবর্তিত হয়েছে, দুটি ধারাকে বস্পষ্ট ভাবে বিভক্ত করে তা দেখানো যায়ঃ

ক. ১. সন্ধ্যাটা আজ দেখতে যেন সৈনিকেরই বৌ।
শহীদ-সেনার টুকটুকে বৌ লাল- পিরহ্যন-পরা,
স্বামীর খুনের ছাপ-দেওয়া, তার ডগডগে আনকোরা।

। কামাল পাশা ।
(অগ্নি-বীণা)

খ. ১. বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে
আঁধার মাখায় দিগ্‌বধুদের কেশে,
ডাকতে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে-
উদাস পথিক ভাবে।

। পথহারা ।
(দোলন-চাঁপা)

ক- অংশের চিত্রকল্পে রুক্ষ-মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং খ-অংশের চিত্রকল্পে ললিত, কোমল, বিধুর ভাব নিমজিত। অর্থাৎঃ সমস্ত চিত্রকল্পগুলি প্রসঙ্গানুযায়ী কেন্দ্রনীড় সন্ধ্যান করেছে, কোর্থাও নিঃসমর্গ নয়। এমনিভাবে নজরুল ইসলামের সমগ্র কবিতার যুগ্মমতা চিত্রকল্পের যুগল ধারায় অন্বিত।

চিত্রকল্পের প্রধাননির্ভর চোখ। তাই সব কবির রচনায় দৃষ্টিবাহিত চিত্রকল্পরাশি সর্বাধিক। অন্তরিন্দ্রিয় প্রধান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাতেও সাক্ষাৎ পাই ঐ দীপ্তিধারণার। পক্ষান্তরে, নজরুল ইসলাম প্রথমাবধি ইন্দ্রিয়াতনে নির্ভর কবি; উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর পূর্বজ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও অনুজ জীবনানন্দ দাশ উভয়ের মধ্যেই ঐ দৃষ্টিবাহন তুমুলপ্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। এখানে নজরুলের দৃষ্টিময় চিত্রকলেপর উদাহরণ দেওয়া হলোঃ

১. ঘোমটা- পরা কাদের ঘরের বৌ তুমি ভাই সন্ধ্যা তারা?
তোমার চোখে দৃষ্টি জাগে হারানো কোন মুখের পারা?
২. ঘর-দুয়ার আজ বাউল যেন শীতের উদাস-মাঠের মত,
ঝরছে গাছে সবুজ পাতা আমার মনের বনের মত।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নজরুলের কবিতা থেকে দৃষ্টিনির্ভর আরো অনেক চিত্রকলপ উদ্ধার করা যায়।

নজরুলের কবিতার শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্পঃ
১. বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ-
ঐ শোনো, শোনো তার ক্রেষার চিক্কুর,
ঐ তার ক্ষুর-হানা মেঘে!
২. জীবন-মরণ পায়ে বাজে মঞ্জীর
আমরা বাহিনী বিংশ শতাব্দীর
এ উদাহরণ গুলোতে স্বরবৃত্ত

Dhaka University Institutional Repository

ও মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

কখনো আবার দৃষ্টি-শ্রুতি বহু চিত্রকল্প সংমিলিত হয়েছে, অনেক আধুনিক কবির মতো চোখ ও কান স্থানপরিবর্তন করেনি, কিন্তু নয়ন ও শ্রবণ এসে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি। যেমন;

১. বধূর মতন বিধুর হয়ে সুদূর তোমায় দেয় গো ডাক,
তোমার মনের এপার থেকে উঠল কেঁদে চক্রবাক।
২. নিদ্রা-দেবীর মিনার-চূড়ে মুয়াজ্জিনের শুনছি আরাব,-
পান করে নে প্রাণ- পেয়ালায় যুগের আলোর রৌদ্র-শারাব।

নজরুলের মতো আবেগে ও উম্মাতাল কবির পক্ষে শ্রাবণী বাক্-প্রতিমার ব্যবহার দরকার ছিল, এবং নজরুল যথাযোগ্যভাবে শ্রাব্য চিত্রকল্পকে তাঁর ছন্দোবানে বিদ্ধ করেছেন।

নজরুলের শরীরী চৈতন্য কখনো সংবৃত নয়, কাব্যে ও কথকতায় মানুষের অনিবারণ দেহকে তিনি এড়িয়ে যাননি, শরীর চেতনা তাঁর কবিতার অন্যতম লক্ষণ। সুতরাং তাঁর স্পর্শেন্দ্রিয় যে তীক্ষ্ণচেতন হবে- এই তো স্বভাবশোভন।
ঐ স্পর্শবেদিতার কতিপয় দৃষ্টান্তঃ

১. তখন নাই- বা আমার রইলো মনে
কোন্‌খানে মোর দেহের বনে
জড়িয়েছিলে লতার মতন আলিঙ্গনে গো।
২. তখন এ-মন যেমন কেমন-কেমন কোন তিয়াসে কোঙারি?
ঐ শরম-নরম গরম ঠোঁটের অধির মদির ছোঁয়ারি।

ঘ্রাণ ও স্বাধ- নির্ভর চিত্রকল্প পর-পর দেওয়া হলোঃ

১. মোর বেদনার কর্পূর-বাস ভরপুর, আজ দিগ্বলয়ে,
বনের আঁধার লুটিয়ে কাঁদে হরিণটি তার হারায় ভয়ে।
২. সবাই বলে, চিনির চেয়েও শিরীণ জীবন,-হায় কপাল।
পীতম হারা নিম-তেতো প্রাণ কেঁদেই কাটায় সাঁঝ-সকাল।

উপরের উদাহরণের প্রথমটি ঘ্রাণ নির্ভর পরেরটি স্বাদের নিবিতড়ায় স্ফুটিত।

নজরুল ইসলামের কবিতার সফলতার কারণ ও কুললক্ষণ, চিত্রকল্পের সুপ্রযুক্ত ব্যবহার। এখানে উল্লেখ করা দরকারঃ নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত সব চিত্রকল্পই যে সফলতার ঘরে উঠেছে, তা নয়; বলা যায়, যেগুলির মধ্যে নজরুলের চারিত্র্যের ছায়াআতপ সলীল, সেগুলিই অধিক সার্থক। নজরুলের কাব্যে ব্যবহৃত প্রাক্তন, নিষ্প্রভ, দ্যুতিহীন, নিস্তাপ এরকম চিত্রকল্পের উদাহরণঃ

১. ক্রমে নিশিথিনী আসে ধুলায় ছড়াইয়া এলোচুল,
সন্ধ্যাতারা নিবে যায়, হারা হয় দিবসের কূল।
২. আজ হৃদয়ের জাম-ধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও,
রং-করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে নাও।

Dhaka University Institutional Repository

এসব চিত্রকল্পে কোথাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, কোথাও আরো পুরানো কবিতাচেষ্টার, কোথাও বা দিনানুদৈনিক জীবনের শাদামাঠা-উচ্চারণ লক্ষনীয়, হয়তো কোনোদিন এগুলোর ভিতরে ছিল নূতন স্বাদ, জীবনের স্পন্দিত তাপ, কিন্তু অতিশ্রুত, অতিব্যবহৃত বলে চোখে বা হৃদয়ে এর আবেদন হারিয়ে গেছে। কিন্তু নজরুল যেখানে বিশিষ্ট, সেখানে তাঁর আপন দৃষ্টির কোন থেকে আলো এসে পড়েছে, সেখানে কথাপ্রতিমার শরীরে একজন কবি নজরুল ইসলামের স্বয়ম্ভর মুদ্রা চিহ্নিতঃ

১. আসবে আবার পদ্মানদী দুলবে তরী ঢেউ-দোলায়
তেমনি করে দুলব আমি তোমার বুকের পর-কোলায়
দুলবে তরী ঢেউ-দোলায়।
২. দরিদ্র মোর নামাজ ও রোজা, আমার হজ্ব জাকাত,
উহাদেরি বুক কাবাঘর, মহামিলনের আরফাত।

নজরুল ইসলামের রচিত চিত্রকল্পে, সামগ্রিকভাবে তাঁর কবিতায়, কবিপ্রসিদ্ধির ব্যবহার বিপুল, বারংবার ও পৌনঃপুনিক। আলোক সম্ভব ছবি ফোটাননি তিনি, বরং লৌকিক দিকেরই প্রতিচ্ছবি ধারণ করেছে তাঁর দীপ্তিকাব্য। কবিপ্রসিদ্ধি ও লোকজীবন থেকে তাঁর অধিকাংশ অলংকার আহৃত। লোকজ অলংকার গুলি তো বটেই, কবিপ্রসিদ্ধিগুলিও ক্রমাগত ব্যবহারে সাধারণভাবে পাঠক সাধারণের চেনা জিনিষ। নজরুলের লোক-প্রিয়তার অন্যতম কারণ এখানে নিহিত। ফুল, পাখি, চাঁদ- এই সবের কেন্দ্রিক অজস্র কবিপ্রসিদ্ধি তিনি ব্যবহার করেছেন। যেখানে সার্থক কারু শীর্ষে পৌঁছেছে তাঁর কবিতা, সেখানে তিনি প্রাক্তন অলংকার গালিয়ে নূতন গয়না গড়েছেন। ফুল নজরুলের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। ফুলের চিত্রকল্প অনেক; বিশেষ করে পদ্মফুলের চিত্রকল্প বারংবার ফুটেছে; যেমনঃ

১. যক্ষপুরীর রৌপ্য- পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ-কমল?
২. আমার প্রাণের রক্তকমল
নিঙড়ে হলো লাল পদতল
সেই শতদল দিয়ে তোমার নতুন রাঙায় ব'রেছিল
আলতা যেদিন পরেছিলে।

পুষ্পপ্রিয়তা মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাংলা কবিতার সামান্য লক্ষণ হলেও নজরুলের কবিতায় ঐ ঐতিহ্যের আতত ঘূর্ণন দ্রষ্টব্য। নূতন যুগ আহবান ও আনয়নের চিত্রকল্পে এসেছে ঘোড়া-এ প্রসঙ্গে এটিও স্বভাবী; যেমনঃ

১. রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা।

নজরুলের এই ঘোড়া বিষ্ণুদে-র কবিতায় উজ্জীবিত ও পরাক্রান্ত অশ্বের এবং জীবনানন্দ দাশের কবিতায় স্বপ্নাতুর ও বিমর্ষ ঘোড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নলিখিত চিত্রকল্পময় কবিতাগুলো কোনটিই সমাজভাবনায় উদ্দীপিত নয়; কবির ব্যক্তিগত একান্ত আপন চিত্তের ভিত্তিভূমি থেকে এগুলো মঞ্জুরিত, যেমন কখনো কখনো শরীর বেয়ে আনন্দিত মাধবীলতা লতিয়ে ওঠে কারণহীন ব্যাখ্যাতীতভাবে তেমি। নিসর্গদৃষ্টিবান সুন্দরসমীক্ষা এখানে কবিকে পেয়ে বসেছে।

'ছায়ানট' কবিতাগ্রন্থের অন্তর্গত 'চৈতী হাওয়া' কবিতায় কল্পনানির্মুক্তি আশ্চর্য সুন্দর ভূস্বর্গ রচনা করেছে। সেই ভূস্বার্গিকে কল্পনা, নিসর্গ, সুন্দরতা স্থান দখল করেছে পরস্পরের।

পঞ্চদশ স্তবকের যৌগিক মঞ্জুরীতে কল্পনা উতল-উতরোল হয়ে উঠেছে চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্পে- শুধু স্তবকে নয়, ছত্রে-ছত্রে দ্যুতিমান মণিরত্নাবলি পরিকীর্ণ। নিসর্গ এসেছে ভিড় করেঃ-

নীলোৎপল, টগর, চাঁপা, বেলী ইত্যাদিপুষ্প, ডাব, আম, গোলাপজাম ইত্যাদি ফল, বকুল-শাখা, পিয়াল-বন, ঝাউ-শাখা ইত্যাদি গাছঃ কবুতর, বুলবুলি, মাছরাঙা ইত্যাদি পাখি চারিদিকে যেন কোনো উৎসবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই সঙ্গে প্রিয়ার শরীরী সংস্থান সূচীত; কমল-পা, গোলাপ-গাল, মুখ, ভুরু, ডাগর চোখ, বুক ইত্যাদি।

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল?
আঁধার দীঘির রাঙলে মুখ,
নিটোল ঢেউ-এর ভাঙলে বুক-

অথবাঃ

সেই চাহনী নীল-কমল
ভরল আমার মানস-জল,

কমল-কাঁটার ঘা লেগেছে মর্ম-মূলে মোর। প্রভৃতিতে কবির চিত্রকল্পরচনার শক্তি শিখর স্পর্শী। আবার কল্পনার আশ্চর্য নর্মলীলা দ্রষ্টব্যঃ

হঠাৎ জলে রাখতে পা,
কাজলা দীঘির শিউরে গা--
কাঁটা দিয়ে উঠত মৃণাল ফুটত কমল- ঝিল।

অথবাঃ

করেছিলাম চাউনি চয়ন নয়ন হ'তে তোর,
ভেবেছিলাম গাঁথব মালা-পাইলে খুঁজে ডোর!

প্রভৃতির বিভার ভিতরে।

'ছায়ানট'- এরই অর্ন্তভূক্ত 'মানস-বধূ' কবিতায় কবির কল্পপ্রেমিকার রূপ বর্ণিত হয়েছে অনেকগুলো অভিনব চিত্রকল্পের প্রয়োগে।

Dhaka University Institutional Repository

'সিন্ধু-হিন্দোল' কবিতাগ্রন্থের 'বাসন্তী' ও 'মাধবী-প্রলাপ' কবিতাযুগে বসন্তের শোভাবাজারের বাকপ্রতিমা মান্দ্রীভূত ও গুচ্ছীকৃত। 'চৈত্রী হাওয়া', 'বাসন্তী' ও 'মাধবী-প্রলাপ'ঃ চিত্রকল্পবহুল এই তিনটি কবিতারই পটশোভাভূমি বসন্ত।

নজরুলের কবিতায় চিত্রকল্প সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দ এর আলোচনা নজরুলের কবিতার অন্যান্য প্রসঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুত নজরুলের চিত্রকল্প বিষয়ক আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রবন্ধটি বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প পর্যালোচনায় একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা।

ছন্দ আলোচনায় আবদুল মান্নান সৈয়দ

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে অক্ষরবৃত্তের প্রয়োগখুবই কম। সম্ভবত তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুর কারণেই তিনি এই ছন্দ প্রয়োগ করতে পারেননি। তাঁর কবি স্বভাবে আছে সংরাগের উদ্দীপনা দেশসমাজের জন্যেই হোক কি নিসর্গ দয়িতার স্পর্শেই হোক চিত্ত তাঁর উদ্দাম ও চঞ্চল। তাই তাঁর ছন্দও হয়ে ওঠে চঞ্চল ও নৃত্যপর; তাই অক্ষরবৃত্তের পরিবর্তে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দব্যবহারে নজরুলে সম্পূর্ণরকমে নিজেকে সর্ম্পণ করেছেন।

কবির প্রাথমিক কবিতাচয়ের মধ্যে একমাত্র 'কবিতা-সমাধি'-ই রচিত অক্ষরবৃত্তে। ''বিষের বাঁশী''-র 'মুক্ত পিঞ্জর' ও 'ঝড়', ''দোলন-চাঁপা''-র 'বেলাশেষে' ও 'পূজারিণী', ''সিন্ধু-হিন্দোল''-এর 'সিন্ধু' (প্রথম-তৃতীয় তরঙ্গ), 'অনামিকা' ও 'দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর', 'চক্রবাক'-এর 'তোমারে পড়িছে মনে', 'স্তব্ধ রাতে' ও '১৪০০ সাল' কবিতাগুলো সমিল অসমমাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা। এসব কবিতার কোনো-কোনো স্থানে ব্যতিক্রম মাত্রা ব্যবহৃতঃ

> মায়াবী দৈত্য-শিশু আমি
> ছুটে চলি অনির্দেশ অনর্থ সন্ধানে।
> [ঝড়, বিষের বাশী]

সংখ্যায় কম হলেও নজরুলের অনেকুগলো খ্যাতিও সার্থকতা বহ কবিতা অক্ষরবৃত্তে রচিত। যেমনঃ

'সর্বহারার'-র 'গোকুল নাগ,' 'ফণি-মনসা'-র 'অশ্বিনীকুমার', 'সিন্ধু-হিন্দোল'এর 'দারিদ্র', 'চক্রবাক' এর শীতের সিন্ধু ও 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ', 'সন্ধ্যা'-র 'দাড়িবিলাপ' প্রভৃতি কবিতা সমিল চোদ্দো মাত্রার অক্ষরবৃত্তে রচিত।

আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর গ্রন্থে চিত্রকল্পের ব্যবহার সম্পর্কে নিজেই মন্তব্য করেন,

> নজরুলের কাব্যধারার সার্থকতার কারণ নিহিত তাঁর চিত্রকল্প ব্যবহারের আশ্চর্য শক্তির সুবর্ণে। শবলিত ঐ চিত্রকল্পের ব্যবহারে নজরুল ইসলাম পৃথক হয়ে যান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমিত প্রভাবচক্র থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যদিচ যাবতীয় কাব্যলংকার উচ্ছিষ্ট করে রেখে গেছেন এবং নজরুলের উপর তাঁর ছায়াসম্পদ অবিসংবাদিত, তত্রাচ কল্পনার চেয়ে অকল্পনায় তাঁর দখল যেমন প্রবল তেমনি চিত্রকল্প রচনা তাঁর কাব্যরচনার প্রধান উপাচার নয়। সর্বোপরি, নজরুলের সমাজচেতন তথা সাময়িক প্রসঙ্গ নির্ভর

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা গুচ্ছের সার্থকতার এক প্রধান অন্তঃকারণ ঃ চিত্রকল্পের যথাপ্রযুক্তি। নজরুলের পূর্বে ও উত্তরে বহু সাময়িক প্রসঙ্গ-নির্ভর কবিতা যে অধঃপতিত হয়েছে তার কারণ ব্যঞ্জনার চেয়ে বক্তব্যের প্রতি চাপ. নজরুল তাঁর স্বকীয় প্রতিভাবলে সেই প্যাটার্ন নির্মাণ করেছেন. যা কবিতাতেই সংবৃত।

লেখকের গ্রন্থ আলোচনায় আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, আবদুল মান্নান সৈয়দ কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যের শব্দ, রূপক/ প্রতীক, অনুপ্রাস/ মিল, পুরাণপ্রয়োগ, উপমা/ উৎপ্রেক্ষা, নরত্বারোপ, চিত্রকল্প, ছন্দ বিভাজন করে আলোচনা করেছেন।

নজরুলের কবিতায় চিত্রকল্পের যথার্থ আলোচনা প্রথম আবদুল মান্নান সৈয়দই করেছেন। অদ্যাবধি নজরুলের কবিতার চিত্রকল্প বিশ্লেষণে আবদুল মান্নান সৈয়দকে কেউ অতিক্রম করতে পারেননি।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

মোবাশ্বের আলীর নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা

মোবাশ্বের আলীর 'নজরুল প্রতিভা' (১৯৬৯) গ্রন্থে রয়েছে উনিশটি প্রবন্ধঃ 'জীবন-শিল্পী নজরুল', 'নজরুল-কাব্যের পটভূমি', 'নজরুল-মানস', 'নজরুলের রোমান্টিকতা', 'ঐতিহ্য এবং নজরুল কাব্য', 'নজরুল-কাব্যে প্রেম', 'প্রকৃতির কবি নজরুল', 'নজরুল-কাব্যে নারী', 'নজরুলের মরমীবাদ', 'নজরুল কাব্যে মানব প্রত্যয়' 'নজরুল কাব্যে শব্দ', 'ঔপন্যাসিক নজরুল', 'গল্পকার নজরুল', 'প্রাবন্ধিক নজরুল', 'বাংলা গদ্য এবং নজরুল', 'নাট্যকার নজরুল', 'শিশু-সাহিত্যে নজরুল', 'নজরুল প্রতিভা' ও 'নজরুলঃ এক প্রতিভা'।

'নজরুল কাব্যের পটভূমি' প্রবন্ধ আলোচনায় মোবাশ্বের আলী বলেছেন, এক মহাসমর হ'তে আর এক মহাসমর- এরই মধ্যে নজরুল-প্রতিভার বিকাশ ও বলয়। যুদ্ধ, ধ্বংস, রাজনীতিক দ্বিধা, আর্থিক বুনিয়াদে ফাটল, সাংস্কৃতিক সংকট- এই ঐতিহাসিক পটভূমিতেই নজরুলের কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। কিন্তু এর চাইতেও বড় কথা এই যে, তিনি এক বিলীয়মান সংস্কৃতির- যে সংস্কৃতির জয়যাত্রা শুরু হয় উনিশ শতকের মধ্যহ্নে এবং যার মধ্যে ভাটা দেখা দেয় বিংশ শতকের মধ্যাহ্নের পূর্বেই অর্থাৎ প্রায় এক শতক যার স্থায়িত্বকাল- শেষ প্রতিনিধিত্বমূলক কবি। তাঁর মধ্যে সেই সংস্কৃতির যত দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, জটিলতা ও বিরোধিতা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

লেখকের ভাষায়,

> নজরুল ইংরেজ আমলের বাংলা কাব্যে শেষ প্রতিভাধর কবি এবং উনিশ শতকের নবজাগরণের যে প্রধান সুর মানবতাবাদ, তা তাঁর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি মানুষের মনুষ্যত্ব ও মহিমায় অপার বিশ্বাসী। এ দিক দিয়ে তিনি মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক।

নজরুলের রোমান্টিকতা প্রবন্ধ্যে লেখক বলেছেন,

নজরুল মূলতঃ রোমান্টিক অথচ তাঁর কাব্যে কখনও কখনও বাস্তবধর্মিতার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এ-ও স্মর্তব্য যে, রোমান্টিকতা ও বাস্তবধর্মিতা পরস্পরবিরোধী নয়, বরং কখনও কখনও পরস্পরসাপেক্ষ।

মোবাশ্বের আলীর মতে, রোমান্টিক কবি মাত্রেই অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবন, এবং অনুভূতি হৃদয়সঞ্জাত। নজরুল প্রধানত অনুভূতিকে সম্বল করেই কাব্য রচনায় নিয়োজিত হয়েছেন। এর ফলে কখনও কখনও তিনি চমৎকার কবিতা লিখেছেন- যেমন 'কামাল পাশা', 'শত-ইল-আরব', খেয়াপারের তরণী', 'চক্রবাক', 'বাতায়ন পাশে গুবাকতরুর সারি' ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে অনুভূতি বেসামাল হয়েছে, সেখানে সুন্দর কবিতা সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় ঘটেছে- যেমন 'পুজারিণী', 'ঝড়' 'সিন্ধু' ইত্যাদি কবিতার কোন কোন স্তবকে। আবার কোন কোন কবিতায় নিছক জোর করে

Dhaka University Institutional Repository

অনুভূতি সঞ্চারিত করার প্রয়াস করা হয়েছে, যার ফলে তা অনেকখানি প্রানহীন হয়ে উঠেছে- যেমন তাঁর 'শেষ সওগাত' গ্রন্থের প্রচারমূলক কবিতা।

'নজরুল-মানস' পরিচিতি প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, নজরুলের স্বাতন্ত্র্য তাঁর চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা, বেশভূষা, খেয়াল খুশী সব কিছুতেই। এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে রয়েছে নিজেকে বিশেষরূপে জাহির করার প্রয়াস-যাকে ইংরেজীতে Exhibitionism অথবা প্রদর্শনধর্মিতা বলা যেতে পারে।

'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতুর্য'- কবি নজরুল একদিকে বাঁশের বাঁশরীর ললিত সুরে চিরসুন্দরের সাধনা, অপরদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নিসৈনিকরূপে রণতূর্য নিনাদ করেছেন। কিন্তু তাঁর মানস আরও জটিল, দ্বন্দ্ববহুল ও স্ববিরোধী। তিনি কখনও বিদ্রোহী, কখনও প্রেমিক, কখনও প্রকৃতি-পূজারী, আবার কখনো বা মরমী সাধক।

প্রথমত, তিনি একজন বিদ্রোহী, সেখানেও স্ব-বিরোধী। তিনি ইসলামী দৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও সাম্যবাদী। আবার হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রয়াসী এবং জাতীয়তাবাদী হয়েও তিনি মুসলিম নবজাগরণের কবি।

দ্বিতীয়ত, তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। তাই প্রিয়ার পদতলে নিজেকে লুটিয়ে দিয়েছেন--- এই বিরহকে সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যপ্ত করে দিয়ে তাঁর অশান্ত হৃদয় শান্ত বা তৃপ্ত হতে চেয়েছে। পথ তাঁর আত্মার দোসর।

তৃতীয়ত, বিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে যে নবজাগরণ ঘটে, নজরুল কাব্যে তার রূপায়ণ দেখা যায়। শুধু বিষয়বস্তু নির্বাচনে নয়, শব্দ চয়ন ও প্রতীক প্রয়োগেও তিনি ইসলামী ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেছেন এবং এক্ষেত্রে আরবী, ফারসী কাব্য তাঁর বিশেষ সহায় হয়েছে। এ জন্যই তাঁকে মুসলিম নবজাগরণের কবি বলা যায়।

চতুর্থত, কবি 'সুফী-সাধকের ন্যায় ধ্যানমগ্ন হয়েছেন'।

'ঐতিহ্য এবং নজরুল-কাব্য' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, বাংলাদেশে দুই ভিন্ন সমাজ- একটি হিন্দু অপরটি মুসলমান। এবং দুই সমাজে দুই ভিন্ন ঐতিহ্য প্রবাহিত হিন্দু ঐতিহ্যের মূল আশ্রয় বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও নানাবিধ পুরাণ-এবং ব্যাপকভাবে বলতে গেলে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃত সাহিত্য। অপরদিকে ইসলামী ঐতিহ্যের প্রধান অবলম্বন কোরান, হাদিস, তফসির, রসুল ও খলিফাদের কীর্তি-কাহিনী ও কার্যাবলী এবং ব্যাপকভাবে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

মোবাশ্বের আলীর ভাষায়, মুসলমান যুগের বাংলা সাহিত্যে-অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত- এই দুই ভিন্ন ঐতিহ্যই সমান্তরালে প্রবাহিত। শুধু প্রসঙ্গ নয়, প্রকরণে ও এই ব্যবধান লক্ষণীয়। হিন্দু কবি যেখানে তদ্ভব ও তৎসম শব্দকেই অবলম্বন করেছেন, সেখানে মসুলমান কবি আরবী, ফারসী শব্দের ওপর অত্যধিক মাত্রায় জোর আরোপ করেছেন। তবে নজরুলের মধ্যে এসেই ঐতিহ্যের প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল আকারে দেখা দেয়। নজরুলের মধ্যে ঐতিহ্যের প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল, দ্বিধাগ্রস্ত ও সংকটাপন্ন। কেননা, তাঁর কাব্যে হিন্দু এবং ইসলামী এই দুই ভিন্ন ঐতিহ্য ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

মোবাশ্বের আলীর কথায়, জন্মসূত্রেই তিনি ইসলামী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। অপরদিকে হিন্দু ঐতিহ্যের সাথেও তাঁর সংযোগ ঘটে। তা হতে পারে অল্প বয়সে লেটোর দলে পালা বাঁধতে গিয়ে তাঁকে হিন্দু পুরাণের চর্চা করতে হয় এবং হিন্দুর সাহচর্যই তিনি জীবনে লাভ করেছেন অধিক। তাছাড়া, প্রমীলার সাথে দাম্পত্য জীবনও হয়ত হিন্দু-ঐতিহ্য সঞ্চারিত করতে সহায়তা করতে পারে।

নজরুলের কাব্য সাধনা সজ্ঞান ও সচেতন প্রচেষ্টার ফল নয়। এ জন্যই ঐতিহ্যের জটিল প্রশ্নটি সম্পর্কে তাঁর পক্ষে সম্যকরূপে অবগত হওয়া সম্ভবপর হয়নি। এরই ফলে তিনি কাব্য রচনায় পরস্পর বিরোধী ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেছেন এবং অনেকক্ষেত্রে এর অপপ্রয়োগ করেছেন। এর ফল হয়ে উঠেছে শোচনীয় বা মারাত্মক। তিনি বাঙালী মুসলমানের পুনর্জাগরণের কবি হয়েও সম্পূর্ণ বিরোধী হিন্দু ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এই জন্যই তিনি বাংলা কাব্যে যথাযর্থরূপে ইসলামী ঐতিহ্যের দিশারী হতে সক্ষম হলেন না।

লেখকের এ ধারনা ভুল। কোন শাস্ত্র-মানা মানুষই যে ভিন্ন শাস্ত্রানুগত মানুষকে অভিন্ন স্বার্থ বশেও আপন বা স্বজন ভাবতে পারে না, তা নজরুলের অজানা ছিল না, কিন্তু সমস্বার্থে সহাবস্থানের প্রয়োজনে সহিষ্ণুতায় বাস অন্তত রাজনীতির ক্ষেত্রে আবশ্যিক বলেই তিনি মনে করতেন, তাই তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।'

'নজরুল কাব্যে প্রেম' প্রবন্ধ আলোচনায় লেখক বলেন, প্রেম মানুষের একটি মৌল ও প্রবল অনুভূতি। তাই সর্বকালীন কাব্য-সাহিত্যে এর প্রাধান্য এবং নজরুল কাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। তাঁর কাব্যে প্রেম একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। অথচ কৌতুকের বিষয় এই যে, বাঙালী পাঠকের নিকট তাঁর প্রেমের কবিতা অপেক্ষা বিদ্রোহমূলক কবিতাই সমাদৃত।

নজরুল রোমান্টিক। এ- কারণেই তিনি যে মানসীর সন্ধান করেন তা একান্তভাবে কল্পনাপ্রসূত- বাস্তবে তার সন্ধান মেলে না, স্বপ্নলোকেই সাক্ষাৎ মেলে। তাই মানসপ্রিয়া তাঁর স্বপ্নসহচরী।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার বন্দনা করি
স্বপ্ন সহচরি
লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া।

মোবাশ্বের আলীর ভাষায়, তাঁর দৃষ্টিতে প্রেম চিরন্তন বা শাশ্বত। কেননা প্রেমের মধ্যে স্বর্গের অপার্থিব মাধুরী মেশানো রয়েছে। তাই স্বর্গীয় প্রেমের অমর্যাদা করা অপেক্ষা বিরহ অধিকতর শ্রেয় এবং কবি বিরহকে সত্য বলে জেনেছেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় প্রেমের মধ্যে বিরহ-ভাবই প্রকটিত হয়েছে। দোলন-চাঁপা' কাব্যে 'পথহারা', 'বরষা', 'বেদনা-অভিমান', 'বেদনা-মণি', 'বিধূরা পথিক প্রিয়া' ইত্যাদি আর 'ছায়ানট' কাব্যে 'ব্যথা-নিশীথ' এবং 'চক্রবাক' কাব্যের 'ওগো চক্রবাকী', 'তোমারে পড়িছে মনে', 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ', 'মিলন-মোহনায়', 'সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে', 'চক্রবাক' ইত্যাদি কবিতায় এই বিরহভাব ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

নজরুলের উপরোক্ত প্রেমের কবিতাগুলোর মধ্যে একটি ঊর্ধ্বগ আবেগ রয়েছে- যা আমাদের উত্তীর্ণ করে নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর 'প্রিয়াররূপ' ও 'দোদুল দুল' কবিতায় ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার প্রশ্রয় ঘটেছে।

নজরুলের প্রেমের মধ্যে মহৎ ও কুৎসিত, এই দুই-ই ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। যেখানে তিনি আপনাকে আপনি অতিক্রম করে গেছেন যেখানে তাঁর কবিতা অনবদ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু যেখানে তিনি অতিক্রম করতে অসমর্থ হয়েছেন অর্থাৎ তাঁর অবচেতনের নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে সেখানেই বীভৎস রস প্রশ্রয় পেয়েছে।

'প্রকৃতির কবি নজরুল' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে লেখক বলেন, নজরুল কাব্যে প্রকৃতির নানা ঋতু চিত্রিত হয়েছে। বর্ষাকে অবলম্বন করে 'বরষা' 'মাতালহাওয়া', 'বাদলা দিনে', শরৎ অবলম্বনে 'রাখী বন্ধন', হেমন্ত অবলম্বনে 'অঘ্রাণের সওগাত' ও 'সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়', শীত অবলম্বন 'পৌষ' এবং বসন্ত অবলম্বনে 'চৈতী হাওয়া' এবং 'ফাল্গুনী' রচিত হয়েছে। 'সিন্ধু' (তিন তরঙ্গ) ও 'শীতের সিন্ধু' কবিতা দু'টো সমুদ্র অবলম্বনে রচিত এবং 'কর্ণফুলী' ও 'মিলন মোহনায়' প্রসঙ্গত ও সমুদ্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

মোবাশ্বের আলীর মতে, নজরুল মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে প্রভৃতির মধ্যে রূপান্তরিত করেছেন। আপনার বিশিষ্ট অনুভূতি নিয়ে মানুষ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেই অনুভূতি প্রকৃতির মধ্যে প্রসারিত ও পরিব্যপ্ত হলে মানুষ আপনাকে অতিক্রম করে বিশালতা লাভ করে। অবশ্য এর ফলে প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটে। 'দোলন-চাঁপা'র 'ঐ নীল গগনের নয়ন পাতায়', 'অকরুণ প্রিয়া', 'ছায়ানটে'র 'আশা', 'চক্রবাকে'র 'ওগো চক্রবাকী', তোমারি পড়িছে মনে', 'বাদল রাতের পাখী',

Dhaka University Institutional Repository

'চক্রবাক' ইত্যাদি কবিতায় প্রেম বা বিরহ সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও প্রসারিত। 'আশা' কবিতায় প্রকৃতির উদার ও বৃহত্তর পটভূমিতে প্রিয়ার সাথে মিলনের আশা সান্ত্বনা যুগিয়েছে।

হয়তো তোমার গাঁব' দেখা,
যেখানে ঐ নত আকাশ চুমছে বনের সবুজ রেখা।।

'নজরুল-কাব্যে নারী' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে লেখক বলেন, বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের ইতিহাস মাত্র বিগত শতকের। উনিশ শতকে ইংরেজী প্রভাবেই এদেশে সর্বপ্রথম নারী আন্দোলনের প্রয়াস ঘটে এবং তা বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসমাজের হোতাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে। নারী পুরুষের সমানাধিকার ও সমমর্যাদা দেবার প্রয়াস- সমাজ মানসের এই দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে সমসাময়িক সাহিত্যে এবং বিশেষভাবে এর পরিচয় পাওয়া যায় একদিকে শরৎচন্দ্র অপরদিকে নজরুলের মধ্যে। নজরুল বলেন,

নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি প্রাণ
যত কথা তার হইল কবিতা শব্দ হইল গান।

নজরুলের দৃষ্টিতে নারীর কল্যাণী ও মাতৃরূপ বিশেষভাবে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিজীবনে তিনি মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবী ও মিসেস এম, রহমানের অকৃপ্রণ স্নেহলাভ এবং এ দু'জনের মধ্যে মাতৃরূপ অবলোকন করেছেন। এর ফলে নারীর মাতৃরূপ তাঁর নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছে এবং বারাঙ্গনার মধ্যেও তিনি মাতৃরূপের পরিচয় পেয়েছেন।

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুথু ও গায়ে?
হয়তো তোমায় স্তন্য দিয়েছে সীতা সম সতী মায়ে।
না ই হলে সতী, তবু তো তোমরা মাতা ভগনীরই জাতি,
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মত, তারা আমাদের জ্ঞাতি।

নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার ও অধিকার উচ্ছেদ সাধনে নজরুল জেহাদ ঘোষণা করেছেন এবং পুরুষ ও নারীর সমনাধিকার ও সমমর্যাদা দাবি করেছেন। এবং তিনি আশা পোষণ করেছেন যে,

সে-দিন সুদুর নয়-
যে দিন ধরনী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।

পাশাপাশি নজরুল নারীর মধ্যে মহৎ ও কুৎসতি, এই দুইই অবলোকন করেছেন। একদিকে নারী যেমন স্বর্গের সুষমা বহন করে নিয়ে আসে, অপরদিকে তেমনি নারী নরকের পূর্তিগন্ধে ভরপুর। 'নজরুলের মরমীবাদ' প্রবন্ধে লেখক বলেন, নজরুল মরমী কবিতা ও রচনা করেছেন। 'অভেদম' কবিতায় আল্লাহর সাথে কবির একাত্মবোধের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মোরে 'আমি' ভেবে তারে স্বামী বলি দিবাযামী নামি উঠি
কভু দেখি- আমি তুমি যে অভেদ, কভু কভু ব'লে ছুটি।

'কেন জাগাইলি তোরা'? কবিতায় কবির একরূপ মরমী সুপ্তাবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

'আল্লাহর পরম প্রিয়তম মোর' কবিতাটি 'জয় হোক। জয় হোক!' কবিতার মতোই নিছক আল্লার প্রশস্তিমূলক।

নজরুলের মরমীবাদ সম্পর্কে লেখকের মতামত হচ্ছে, মরমী কবিতা নজরুলের অসুস্থতার ফসল।

'নজরুল কাব্যে মানবপ্রত্যয়' প্রসঙ্গে লেখক বলেন, মানবতার প্রতি এক অভ্রান্ত বিশ্বাস নজরুলকে কাব্য সাধনায় নিয়োজিত করেছে। তাই তাঁর কাব্যে মানবপ্রত্যয় দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। শুধু 'মানুষ' নয়, 'সাম্যবাদী', 'ঈশ্বর', 'পাপ', 'বারাঙ্গনা', 'কুলি-মজুর' ইত্যাদি কবিতাও ছন্দের বন্ধন অতিক্রম কবে রসলোকে উত্তীর্ণ হয়নি। অথচ মূলতঃ এই কবিতাগুলোতেই কবি মানুষের জয় ঘোষনায় তৎপর হয়ে উঠেছেন, তাঁর কণ্ঠ আশ্চর্য সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

- তবে এই কবিতাগুলোতে কবি চিত্তের যে নিঃসঙ্কোচ আকুতি, নির্যাতিত মানবাত্মার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, মানুষের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কবি যে উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছেন, এরই মধ্যে কবিতাগুলোর যথার্থ মূল্য নিহিত। নিপীড়িত মানুষের কথা বলতে গিয়ে কবি আপনাকে সংযত রাখতে পারেন নি, নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন। ফলে তা কবিতা হ'ল কি হ'ল না, সে দিকে তাঁর লক্ষ্য করার অবকাশ নেই।

'নজরুল কাব্যে শব্দ' প্রসঙ্গে লেখক বলেন, শব্দই কবিতার মূল উপাদান।
নজরুল বিদ্রোহী, একথা ঘোষণা করতে গিয়ে উচ্চারণ করেছেনঃ

আমি চির দুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।

তাঁর মধ্যে রয়েছে দুর্দমতা, সাইক্লোনের প্রচন্ড গতিবেগ এবং ধ্বংসের প্রবল উন্মাদনা। তাই তিনি হচ্ছেন মহাপ্রলয়ের নটরাজ। কবিতার এ দুটি পংক্তিতে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে শব্দের যথোপযুক্ত প্রয়োগে।

মোবাশ্বের আলীর ভাষায়, কাজী নজরুল ইসলাম ধ্বংসের প্রতীকরূপে দেখেছেন ধূমকেতুকে। এবং তা রূপায়নের জন্যে তিনি 'ধূমকেতু' কবিতায় যে সমস্ত শব্দ নির্বাচন করেছেন তা হ'ল স্রষ্টার শনি, নরক-জ্বালা, ধূম-কুন্ডলী, সাহারা গোবী, অভিশাপ, সর্বনাশ, বিষ-ধূম-বাণ, উল্কা- অশনি বৃষ্টি, চিতাগ্নি, কালনাগ ইত্যাদি। এ সকল শব্দ বিন্যাসের ফলে ধূমকেতু যে প্রচন্ড

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংস বহন করে নিয়ে আসে তা' পাঠকের চোখের সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে উদভাসিত হয়ে উঠে। এ জন্যেই 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু' এ দুটি কবিতাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

শুধু বিদ্রোহীর আবেগ নয়, রণোম্মাদনার অনুভূতিও নজরলই বাংলা কাব্যে সর্বপ্রথম সঞ্চারিত করেন। এ জন্যেই তাঁর কবিতা স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে আমাদের চিত্তে দারুণ উত্তেজনা সঞ্চার করেছে।

"চল্ চল্ চল্ ।
উর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতল' ধরণী তল,"

-- এই মার্চ- সংগীত আমাদের জাতীয় জীবনের চরম দুর্যোগ-লগ্নে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে উন্মুক্ত করে তুলেছে।

রণক্ষেত্রের পটভূমিতে 'কামাল পাশা' ও 'আনোয়ার পাশা' কবিতা দুটি রচিত। এ দু'টি কবিতায় রণক্ষেত্রের আবহ সৃষ্টি করার জন্যে তিনি প্রচুর পরিমাণে আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন।

খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া।
বুজ্ দিল্ ঐ দুষ্মন্ সব বিল্কুল্ সাফ হো গিয়া।
- কামাল পাশা

'আনোয়ার পাশা' কবিতায় আছে,

আনোয়ার ! আনোয়ার !
দিলওয়ার তুমি জোর তলওয়ার হানো আর
নেস্ত-ও-নাবুদ কর মারো যত জানোয়ার।

এই ধরনের আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ প্রয়োগের ফলে কবিতা দু'টিতে প্রচন্ড গতি ও আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। এবং এরই ফলে রণক্ষেত্রের আবহ সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পেরেছে।

'অগ্নিবীণা' কাব্যে 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী', বা 'ধূমকেতু' কবিতায় একটিও আরবী- ফারসী শব্দ নেই। কেননা এই সকল কবিতা একান্তভাবেই হিন্দু ঐতিহ্য অবলম্বনে রচিত। এবং এগুলো রচনার জন্যে তাঁকে হিন্দু ঐতিহ্য বাহী শব্দ প্রয়োগ করতে হয়েছে।

'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় তিনি বলেছেন,-

সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো,
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল-চিতা।

'সিঁথির সিঁদুর' কিংবা 'কাল-চিতা' একান্তভাবে হিন্দু জীবনের পরিচায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল শুধু বিদ্রোহী কবি নন, প্রেমের কবি। প্রেমের কবিতায় কোমল, ললিত, পেলব শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে নজরুল সকল মানবীয় আবেগ অনুভূতিকে সার্থকভাবে রূপদান করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁর প্রেম ও প্রকৃতিমূলক কবিতা পাঠ করে পাঠকচিত্তে একটা বেদনা ও বিষাদের সুর অনুরণিত হয়ে ওঠে।

নজরুল একজন কুশলী শব্দশিল্পী, একথা অনস্বীকার্য।
'ঝড়' (পশ্চিম তরঙ্গ) কবিতায়ঃ

কোলাহল কল্লোলের হিল্লোল হিন্দোল-
দুরন্ত দোলায় চড়ি'- 'দেদোল দেদোল'
উল্লাসে হাঁকিয়া বলি, তালি দিয়া মেঘে
উন্মাদ উন্মাদ ঘোর তুফানিয়া বেগে !

এই চারটি পংক্তির মধ্যে ঝড়ের কোলাহল কল্লোল হিল্লোল হিন্দোল কবিচিত্তে যে উল্লাস ও উন্মাদনা সঞ্চার করেছে, তা চমৎকাররূপে বিধৃত হয়েছে।

ঔপন্যাসিক নজরুলঃ মোবাশ্বের আলীর মতে, কোন কোন কবি মাত্র একটি উপন্যাস রচনা করেই বিশ্ববরেন্য হয়েছেন। কিন্তু অবাক ব্যাপার এই যে, কবি নজরুল উপন্যাস লিখলেও ঔপন্যাসিকরূপে তাঁর মর্যাদা অবহেলিত। এই উপেক্ষার হেতু নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার। অথচ সাহিত্যিক দিক দিয়ে না হলেও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে তাঁর উপন্যাসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সুতরাং নজরুলের উপন্যাসের পর্যালোচনা করা অতীব প্রয়োজনীয় এবং এর হেতু মূলত ত্রিবিধ। ক) কবির মানসস্বরূপ সন্ধানের জন্যে; খ) সমসাময়িক জীবনের আলেখ্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে এবং গ) বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারা নিরূপনের জন্যে।
বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ-মধুসূদনের পরই নজরুলের স্থান। এবং এই কবিকে অন্তরঙ্গ আলোকে জানতে হলে তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলো অপরিহার্য। এখানে একটা কথা উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুল কোন স্মৃতিচারণ করেননি এবং গল্প উপন্যাসের মধ্যে নিজের অলক্ষ্যে তিনি নিজের পরিচয় রেখে গেছেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে নজরুল-মানুষের রোমান্টিকতা বাঁধন-হারায়, বাস্তববোধ ও সমাজ সচেতনতা 'মৃত্যুক্ষুধা'য় এবং রাজনীতিক চেতনা 'কুহেলিকা'য় বিধৃত। তাঁর উপন্যাসে রোমান্টিকতা ও বাস্তবতা এই দুই দিকই সুস্পষ্ট।

'বাধন-হারা' উপন্যাস মূলতঃ কবির আত্মভাবনাজাত। কিন্তু 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা'য় এই শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক জীবনের চিত্র সুস্পষ্ট। 'মৃত্যুক্ষুধা'য় দুঃখী মানুষের চিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'কুহেলিকা'য় দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করবার প্রয়াস এক প্রোজ্জ্বল রূপ লাভ করেছে। যে সকল তরুন দেশমাতৃকাকে বন্ধনমুক্ত করার

Dhaka University Institutional Repository

জন্যে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেল তাদেরই এক উজ্জ্বল চিত্র বিধৃত হয়েছে এই উপন্যাসে।

'বাঁধন-হারা'র আর একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং তা এই যে, এটি বাংলা সাহিত্যে মুসলমান রচিত প্রথম পত্রোপন্যাস।

'মৃত্যুক্ষুধা' নির্জিতদের নিয়ে লেখা বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস এবং এই উপন্যাসেই সর্বপ্রথম সাম্যবাদের সুর উচ্চারিত হয়েছে। শুধু তা নয়, আঞ্চলিক ভাষার সার্থক প্রয়োগ আমরা সর্বপ্রথম এখানেই লক্ষ্য করি। কৃষ্ণনগরের নিম্নবিত্তরা প্রাত্যহিক জীবনে যে ভাষা উচ্চারণ করে, এমনকি কোন্দল করে থাকে, তাও নজরুল হুবহু তুলে ধরেছেন। বাংলা নাটকে দীনবন্ধু 'নীলদর্পনে' আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে যেমন সাফল্য অর্জন করেছেন, নজরুল বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে তেমনি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

'কুহেলিকা' শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র পর পর রচিত। এবং এই উপন্যাসেই সর্বপ্রথম মুসলমান সন্ত্রাসীদের ভূমিকা উল্লিখিত হয়েছে।

স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনী রচনায় কবি নজরুলের প্রবল অনীহা, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি নিজের জীবনের স্মৃতিকথা লিখে গেছেন তাঁর উপন্যাসে। 'বাঁধন-হারা'য় তাঁর প্রথম জীবনের আলেখ্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত। শুধু তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি নয়, ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কেও তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে।

প্রবল আত্মাভিমান, বিষাধময়তা সুদূরের প্রতি আর্কষণ ও প্রচলিত ধর্ম ও সমাজনীতির প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব, ধ্বংসের মধ্যে নিজেকে লীন করে দিয়ে একরূপ তৃপ্তি-কবি নজরুলেই রোমান্টিকধর্মিতার প্রকাশ ঘটেছে 'বাঁধন-হারা'র এবং উপন্যাসের নায়ক নুরুল হুদার মাধ্যমে তিনি আত্মবিকাশ করেছেন।

'বাঁধন-হারা পত্রোপান্যাস অর্থাৎ উপন্যাসটি পত্রাকারে রচিত। উপন্যাসে সর্বমোট আঠারটি পত্র আছে। প্রতিটি চরিত্র নিজেই পত্র রচনা করেছে। তাই কাহিনী বাস্তবানুগ হবার সুযোগ ঘটেছে।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। নজরুল কৃষ্ণনগরে চাঁদ সড়কে বাসকালীন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাই রূপায়িত হয়েছে এই উপন্যাসে। চাঁদ-সড়ক 'ওমান কাথলি' পাড়া আর কলকাতার অদ্ভুত দুনিয়া এই নিয়ে তাঁর যে অভিজ্ঞতা এরই ফলশ্রুতি 'মৃত্যুক্ষুধা'।

বাংলা উপন্যাসের মধ্যে 'মৃত্যুক্ষুধা'তে সর্বপ্রথম বস্তীর মেহনতি মানুষ, মুটে-মজুর মিস্ত্রি, কামার, চামড়ার ব্যবসায়ী, যাত্রাদলের সখের গাইয়ে এই ধরনের সমাজের নীচু স্তরের মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

আবির্ভাব ঘটেছে। বস্তীর জীবনধারা ও জীবন যাত্রার এক বাস্তব চিত্র বিধৃত হয়েছে এ উপন্যাসে। অতি সামান্য সূত্র ধরে বস্তিবাসী একে অপরের প্রতি বিষোদ্‌গীরণ করে; আবার সংকটের মুহূর্তে সকল গ্লানি মুছে ফেলে একে অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্রের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে এবং তা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অভূতপূর্ব।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে নজরুল কেবল দেহের ক্ষুধা নয়, মনের ক্ষুধার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাছাড়া আনসার চরিত্রে নজরুলের আত্মপ্রতিফলন ঘটেছে। আর মেজ-বৌ নজরুলের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম রাজনীতিক উপন্যাস শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' (১৯২৬), তারপরেই নজরুলের 'কুহেলিকা' (১৯২৭)। সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে এই উপন্যাসটি রচিত।

'কুহেলিকা' উপন্যাসে নিবারণচন্দ্র প্রমত্তরূপে এবং দু'কড়িবালা দেবী জয়তীরূপে অমর হয়ে আছেন।

উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর একজন সন্ত্রাসবাদী এবং এই চরিত্রে নজরুলের আত্মসাক্ষাৎ ঘটেছে। ঔপন্যাসিকের মতোই জাহাঙ্গীর দেশপ্রাণ, স্বদেশবৎসল অথচ উদ্দাম ও আবেগপ্রবণ। তাই সে অতি সহজেই বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। জন্মভূমিতে স্বাধীনতার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে সে বদ্ধপরিকর।

উপন্যাসের শিরোনাম 'কুহেলিকা'। এবং উপসংহারে জাহাঙ্গীর বন্ধু হারুণকে বলেছে, "তোমার কথাই সত্য হল কবি, নারী কুহেলিকা"। জাহাঙ্গীরের জীবনে দুই নারী অর্থাৎ ভূনী ও চম্পার অবতারণা করে ঔপন্যাসিক উক্ত প্রতিপাদ্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

সর্বশেষে বলা যায়, কবিরূপে তিনি যে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন ঔপন্যাসিকরূপে ততখানি সার্থক না হলেও তাঁর উপন্যাসগুলো স্বীয় বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত।

গল্পকার নজরুলঃ মোবাশ্বের আলীর ভাষায়, নজরুলের সাহিত্যজীবনের ব্যাপ্তি মোটামুটি বলা যায়, দুই যুগের (১৯১৮-১৯৪২)। এর মধ্যে গল্পগুলো প্রথম যুগে রচিত। 'ব্যাথার দানে'র গল্প রচিত হয়েছে আঠার-উনিশ বছর বয়সে। এই গল্পের 'ব্যথার দান', 'বাদল বরিষণে' ও 'হেনা' এই কয়টি গল্পের প্রথম প্রকাশ কাল ১৯১৯-১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। 'রিক্তের বেদনে'র 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প এবং 'স্বামীহারা' ও'মেহের নেগার' রচিত ১৯১৯ সালে। বেশকিছুদিন পর অর্থাৎ 'শিউলিমালা'র গল্পগুলো ১৯২৮-১৯৩০ সালে রচিত। পরবর্তীতে তিনি আর গল্পের প্রতি মনোনিবেশ করেননি, কবিতা ও গানে নিজেকে সীমিত রেখেছেন।

'ব্যথার দান' গল্পসমূহের শিরোনাম এই আভাস দেয় যে, বিরহ ব্যথা গল্পগুলোর মূল উপজীব্য।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল গল্পে নতুনত্বের আস্বাদ লাভ করা যায় পটভূমির বৈচিত্র্যে। এক নতুনতর পটভূমিতে- যুদ্ধ, ধ্বংস ও অনিবার্য মৃত্যুর মধ্যে গল্পের অবতারণা। যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা হয়েছে 'ব্যথার দান', 'হেনা', ও 'ঘোমের ঘোরে' এই কয়টি গল্প।

নজরুলের প্রায় গল্পই স্বগত বা আত্মগত উক্তিতে রচিত এবং 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থও এর ব্যতিক্রম নয়। 'ব্যথার দান' গল্পে মোট তিনটি চরিত্র- নায়ক, নায়িকা ও ভিলেন। এবং এ তিনজনের উক্তিতে গল্পটি রচিত। 'ঘুমের ঘোরে' গল্পটি নায়ক আজহার এবং নায়িকা পপির স্বগত উক্তিতে বিন্যস্ত। 'হেনা', 'বাদল বরিষণে', 'অতৃপ্ত কামনা', 'রাজবন্দীর চিঠি'- এই গল্পগুলো নায়কের স্বগতোক্তিতে রচিত।

'ব্যথার দানে'র মতো 'রিক্তের বেদনে' ও প্রায় গল্প আত্মকথনের ভঙ্গিতে রচিত। নায়কের জবানীতে রচিত হয়েছে 'রিক্তের বেদন', 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী', 'মেহের নেগার' এবং 'সাঝের তারা'- এই গল্প কয়টি। নায়িকার উক্তিতে বিন্যস্ত হয়েছে 'রাক্ষুসী' এবং 'স্বামীহারা' গল্প দুটি।

'ব্যথার দানে'র মতো 'রিক্তের বেদনে'র গল্পগুলোতে প্রেমই মূল উপজীব্য এবং এই গ্রন্থে প্রেমকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে দেখা হয়েছে- কোন গল্প আছে প্রেম ও কর্তব্যের সংঘাত, কোন গল্পে প্রেম ও ঈর্ষার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

'ব্যথার দান' এবং 'রিক্তের বেদনে'র বেশ কয়েক বৎসর পর লেখা 'শিউলিমালা'। সংযত আবেগের ফলে 'শিউলিমালা'র গল্পগুলো শৈল্পিক মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

'শিউলিমালা'র গল্পগুলো একান্তভাবে দেশজ পটভূমিকায় রচিত। 'ব্যথার দান' এবং 'রিক্তের বেদনে'র মত এখানে বিদেশী পটভূমি নেই। এবং যুদ্ধক্ষেত্রেরও কোন চিত্র অঙ্কন করা হয়নি।

'শিউলমালা' গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি গল্পের মূল উপজীব্য প্রেম। এবং এই প্রেমের পরিণতি লক্ষ্য করা যায় এক বিষাদ করুণতায়। এদিক দিয়ে নজরুলের গল্পের যে চরিত্র তা এ গ্রন্থেও অক্ষুন্ন রয়েছে।

প্রাবন্ধিক নজরুলঃ মোবাশ্বের আলীর মতে, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে নজরুল অনুল্লিখিত। তবু নজরুল প্রতিভা সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করতে হলে তাঁর প্রবন্ধও উপেক্ষণীয় নয়। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের যখন আবির্ভাব, ঠিক সে সময় সারাদেশে এবং সারা বিশ্বে এক দারুণ রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। তিনি স্বপ্নচারী কবির মতো দূর থেকে আন্দোলনকে অবলোকন করেননি। তিনি নিজের জীবনে বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে রাজনীতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে এর গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং একটি

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে, তিনিই প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক যিনি রাজনীতিক কারণে কারারুদ্ধ হন। এবং তাঁকে অশেষ নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়।

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক এই পটভূমিতেই কবি 'নবযুগ' সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব গ্রহন করেন (মে, ১৯২০)।

- এই সময় তিনি 'নবযুগে' যে সকল সম্পাদকীয় রচনা করেনে, এর মধ্যে তাঁর রাজনীতিক চেতনা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব, গণতান্ত্রিক দৃষ্টি, অন্যায়-অত্যাচার- অবিচারের প্রতি তীব্র ও আকুণ্ঠ ঘৃণা, নির্যাতিতের প্রতি সুগভীর দরদ ও অনুকম্পা পরিস্ফুট এবং সর্বোপরি মানুষের মুক্তি তাঁর কাম্য হয়ে উঠেছে। মানুষ যাতে সকল শোষণ ও শাসনের নিমর্ম যাঁতাকল থেকে মুক্ত হয়ে উন্নতশীর্ষ হয়ে সগৌরবে বিরাজ করতে পারে, এ আকাঙ্খাই তিনি পোষণ করেছেন।

তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়িত হয়েছে 'যুগবাণী'তে। এই গ্রন্থে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুখোস উন্মোচন এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অপরদিকে তিনি মানবতার জয় ঘোষণায় তৎপর হয়েছেন। তিনি ধর্ম-বিদ্বেষ, জাতি- বিদ্বেষ, বর্ণ-বিদ্বেষ, আভিজাত্য- অভিমান ভুলে গিয়ে এক নবতর সমাজ প্রতিষ্ঠার আহবান করেছেন।

'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ' প্রবন্ধে তিনি হীনবীর্য মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের উদবোধন করতে চেয়েছেন এবং এজন্যে দেশমাতৃকাকে রুদ্রমূর্তিতে আহবান করেছেন।

মেহনতি চাষী এবং বিশেষতঃ কয়লাখনির কুলিদের এক শোচনীয় শোকাবহ রূপ চিত্রিত হয়েছে 'ধর্মঘটে'। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যাঁতাকলে তাদের জীবন ক্লিষ্ট-পঙ্গু হয়ে উঠেছে। এবং বাঁচার আশায় তারা ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়েছে। এ ধর্মঘট ক্লিষ্ট মুমূর্ষ জাতের শেষ কামড়; ইহা বিদ্রোহ নয়।

তিনি প্রচলিত শিক্ষা বড় একটা লাভ করেননি বটে, কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর একটি সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ইংরেজী নিয়মে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ বর্জন করে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু জাতীয় শিক্ষার মধ্যে যে প্রহসনটুকু নিহিত আছে তা তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়নি। জাতীয় শিক্ষার মধ্যে রয়েছে মস্তবড় ফাঁক এবং এই ফাঁকটুকু তুলে ধরার জন্যেই তিনি কয়েকটি শিক্ষামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

জাতীয় শিক্ষার নামে ইংরেজের ব্যর্থ অনুকরণ করা হয়েছে এ কথা তিনি বলেছেন 'জাতীয় শিক্ষা' প্রবন্ধে। জাতীয় বিদ্যালয়ে সকল অনুপযুক্ত শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে। 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধেও তিনি একই কথা উচ্চারণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'যুগবাণী' গ্রন্থে তাঁর রাজনীতিক মতামত, জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিক চেতনা এবং শিক্ষাগত আদর্শ- একটি সুস্পষ্ট রূপলাভ করেছে। এবং ভাবুক ও চিন্তাবিদ নজরুলের পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

'ধূমকেতু', 'দুর্দিনের যাত্রী' এবং রুদ্রমঙ্গলের প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধ রূপক। এবং এ সকল প্রবন্ধে তিনি রূপকের মাধ্যমে ধ্বংসের কথা বলেছেন। কেননা, ধ্বংস হচ্ছে সৃষ্টির উৎস, ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে নব সৃষ্টির সাধনা করতে হবে। পুরানো পচা ক্ষ'য়ে যাওয়া সমাজটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে, তবেই না এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যে সমাজে মানুষে মানুষে কোন ভেদ থাকবে না এবং মানুষ স্বমহিমায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠবে।

'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দলে' লেখক মনে করেন, অমঙ্গল অভিশাপের মধ্যে বাস লক্ষ্মীছাড়ার দল নবসৃষ্টির সাধনা করবে।

'তুবড়ী বাজীর ডাকে' তিনি লক্ষ্য করেছেনঃ ভাসান উৎসবে মনসার পূজাবেদী হতে নাগ-নাগনীদের ডাক এসেছে।

'মোরা সবাই স্বাধীনঃ মোরা সবাই রাজা' প্রবন্ধে যে ভৃগু নিদ্রিত ভগবানের বুকে লাথি মেরে তাঁকে জাগায় সেই ভৃগুকে তিনি প্রণাম করেছেন। কারণ তা হলেই সমস্ত ভাগ্য পায়ের তলায় এসে লুটোবে।

সংগ্রামী কবি 'আমি সৈনিকে' বলেছেন যে, তাঁর জন্যে আর্তের অশ্রুমোচন নয়, তাঁর জন্যে রণ-তুর্য।

'স্বাগত', 'মেয় ভুখা হুঁ', 'পথিক। তুমি পথ হারাইয়াছ'? এই কয়টি প্রবন্ধেও রূপকের মাধ্যমে ধ্বংসের বাণীই উচ্চারিত হয়েছে।

'রুদ্রমঙ্গলে' তিনি সুন্দর রুদ্রদেবতাকে আহবান করেছেন এই কুৎসিত অসুন্দর সৃষ্টিকে নাশ করার জন্যে।

. 'বিষ-বাণী'তে- দেশ দ্রোহীদের প্রতি বিষ- বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

'যুগবাণী'র 'ছুৎমার্গ' প্রবন্ধে তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথার, তা অনুধাবন করেছেন। এবং হিন্দু সমাজের ছুৎমার্গই যে এর মূল হেতু, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'মন্দির ও মসজিদে' তিনি দারুন ক্ষোভের সাথে বলেছেন, মানুষের পশুপ্রভৃতির সুযোগ নিয়ে ধর্মান্ধদের নাচিয়ে কত কাপুরুষ মহাপুরুষ হয়ে গেল। এদের বলা যায় শকুনি এবং শকুনিদের তাড়াবার জন্যে তিনি তরুণদের আহবান করেছেন।

'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্বৃত করেছেন এবং তা এই যে, বাইরের লেজ কাটা যায়, কিন্তু ভেতরের লেজ কাটা যায় না। এ কথার তাৎপর্য এই যে, মানুষের মধ্যে যে অমানুষটুকু আছে এরই মধ্যে সকল ধর্মান্ধতা প্রশ্রয় পায়। তাকে সকল ধর্মান্ধতার উর্ধ্বে উঠার প্রয়াস পেতে হবে। তবেই না উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রতি সম্ভব।

নজরুলের প্রবন্ধের শিল্পরীতি ও রচনাশৈলী অবশ্য আলোচ্য। বলা হয়েছে, কাব্যে বা কথাসাহিত্যে তিনি কখনো কখনো অযথা বাগ্বহুল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু প্রবন্ধে তাঁর সংযম ও পরিমিতিবোধ বিস্ময়াবহ এবং এদিক দিয়ে সংগীতের সাথেই একমাত্র তুলনা করা সম্ভব।

বাংলা গদ্য এবং নজরুল ঃ মোবাশ্বের আলীর কথায়, বাংলা গদ্যের যে মৌল লক্ষণ কাব্যধর্মিতা কবি নজরুলের গদ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। তাঁর গদ্যরীতি মূলতঃ কাব্যানুসারী। এ জন্যে তাঁর গদ্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও অনুপ্রাসের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

বিষন্ন সন্ধ্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি উপমা প্রয়োগ করেছেনঃ "শ্রীরাগের সুরে সুরমূর্চ্ছিতা মলিনা সন্ধ্যার ঘোমটার কালো আবছায়া যেন সিয়াহ্ কাফনের মত পশ্চিমমুখী ধরণীর মুখ ঢেকে ফেলতে লাগলো" (ঘুমের ঘোরে-রিক্তের বেদন) অনুপ্রাস প্রয়োগেও তিনি সিদ্ধহস্তঃ 'মদির খোশবুর মাদকতায় মল্লিকা-মালতীর মঞ্জুল মঞ্জরীমালা মলয় মারুতকে মাতিয়ে তুলেছিল"। (ঘোমের ঘোরে, রিক্তের বেদন)

নাটকীয় সংলাপেও তিনি উপামার পর উপমা প্রয়োগ করেছেন, যাকে অলংকারশাস্ত্রে বলা হয় মালোপমা। 'আলেয়া' নাটকে মীনকেতু কৃষ্ণাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, "চাঁদে কলঙ্ক আছে বলেই চাঁদ এত আকর্ষণ করে, তোমার কপালের ঐ কালো টিপটাই ত তোমার মুখের সমস্ত লাবণ্যকে হার মানিয়েছে। রামধনু মিথ্যা বলেই ত এত সুন্দর। যৌবন ভুল করে পাপ করে বলেই ত ওর উপর এত লোভ, ও এত সুন্দর।"

উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও অলংকারের বহুল প্রয়োগ তাঁর গদ্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তা'ছাড়া তাঁর গদ্য একদিকে লাভ করেছে চিত্রের সুষমা ও সৌন্দর্য অপরদিকে সংগীতের লয় ও মাধুর্য। তাই তাঁর গদ্য কাব্যের মহিমায় মন্ডিত।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিমের রুচিশীলতা, রবীন্দ্রনাথের শালীনতাবোধ, প্রমথ চৌধুরীর বিদগ্ধ মনোবৃত্তি, এর ফলে বাংলা গদ্য লোকায়ত জীবন থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। বাংলা গদ্য হয়ে উঠেছে কৃত্রিম এবং গণজীবন থেকে বহু দূরবর্তী।

নজরুলের মধ্যে এসে লক্ষ্য করা যায়, শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ শুচিবায়ু তাঁকে পেয়ে বসেনি। এবং তা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, তিনি জানেন শুচিবায়ুগ্রস্ততার ফলে ভাষা পঙ্গু ও ক্লিষ্ট হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেই শক্তিশালী গদ্যশিল্পী। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই, তাঁদের গদ্যে মুসলমানী রূপ একান্তভাবে অবহেলিত। এবং কৌতুকের ব্যাপার এই, কোন কোন মুসলমান লেখক হিন্দুয়ানী রীতিতে লেখাকেই মস্তবড় শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করেছেন।

মীর মোশাররফ হোসেনের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভিন্ন ঐতিহ্য থেকে শব্দ আহরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

দুই ভিন্ন ঐতিহ্য থেকে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নজরুলই সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং আশ্চর্য শিল্প বোধের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কাব্যে হিন্দু জীবনবোধের সাথে মসুলমান জীবনবোধ রূপায়িত করেছেন। কাব্যের মত গদ্যেও তিনি একদিকে হিন্দু ঐতিহ্য থেকে অপরদিকে মুসলমান ঐতিহ্য থেকে শব্দ, উপমা, অলংকার আহরণ করেছেন। এই জন্য মুসলমান জীবনে যে সকল শব্দ বহুল প্রচলিত সেগুলো তিনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন। যেমন-

(ক) সম্বোধনসূচক শব্দ- ভাইজান, আম্মাজান, বাবাজান, বুবু ইত্যাদি

(খ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দ- দাওয়াত, শাদী, তমিজ, আদব, সালাম, দোয়া ইত্যাদি। (গ) ধর্মীয় জীবনে- দোয়া, দরুদ, মোল্লা, ফাফন, খোদা, আল্লাহ ইত্যাদি।

নাট্যকার নজরুল ঃ - এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে নজরুল প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ সংগীতে। এবং তাঁর প্রতিভার এই দিকটি নাটকেও লক্ষনীয়। তাই তাঁর নাটক হয়ে উঠেছে গীতিবহুল ও গীতিধর্মী।

তিনি নাটকে প্রতীকেরও আশ্রয় নিয়েছেন- যেমন, 'আলেয়া', 'সেতুবন্ধ', 'ঝিলিমিলি', 'শিল্পী', 'ভূতের ভয়' প্রতীক ধর্মী নাটক। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর সাদৃশ্য মেলে। রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ ঘটেছে সাংকেতিক নাটকে - যেমন, 'ডাকঘর', 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী'। তেমনি তিনিও নাটক রচনা করতে গিয়ে প্রতীক অবলম্বন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'মধুমালা' ও গীতিবহুল নাটক এবং এ নাটকের সংগীতে নাট্যকার স্বয়ং সুর সংযোজন করেছেন। এ নাটকে রোমান্টিক প্রেমের চিত্র বিধৃত। এবং সেই চিত্র অংকণে নাট্যকার রূপ কথার কাহিনীকেই আশ্রয় করেছেন। তবে নাটকীয় প্রয়োজনে তিনি কাহিনীটিকে নতুন করে বিন্যাস করেছেন।

মানুষের মিথ্যা দম্ভ দু'টি তরুণ-তরুণীর জীবনে যে কি মর্মন্তুদ পরিণতি ঘটতে পারে, তাই 'ঝিলিমিলি' নাটকে রূপায়িত হয়েছে। ফিরোজা প্রতিবেশী তরুণ হাবিবকে প্রাণভরে ভালবাসে। কিন্তু তাদের মিলনে অন্তরায় তার পিতা মির্জা সাহেব। বি, এ, পাশ ছেলে ছাড়া মেয়ের বিয়ে দিবেন না, এই তাঁর পণ।

নজরুল যে মূলতঃ এবং প্রধানতঃ রোমান্টিক তাঁর মানসের এই বৈশিষ্ট্য 'শিল্পী' নাটিকায় রূপায়িত হয়েছে। তাঁর নভোচারী মন অনন্ত আকাশে উদ্দাম বিহার করতে চায়; সংসারের প্রাত্যাহিকতার মধ্যে প্রয়োজনের সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে কখনো বন্দী হতে চায় না।

খরস্রোতা পদ্মার উপর সারা ব্রীজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 'সেতু-বন্ধু' নাটিকার রচনা। এই নাটিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারার' সাদৃশ্য লক্ষনীয়। 'সেতু-বন্ধে' নজরুল প্রকৃতির উপর যন্ত্রের আধিপত্যকে কোন মতেই মেনে নিতে পারেননি।

নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় প্রতীকি নাটক 'ভূতের ভয়ে'। ভূত-দল কর্তৃক স্বর্গরাজ্য অধিকার, দেবতাদের বন্দী এবং তাদের মুক্তিলাভের প্রয়াসের মাধ্যমে বিদেশী শক্তির নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্যে যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থা অবলম্বন করতে হবে, এ কথাই তিনি এ-নাটকে প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

নজরুল দু'টি চরিতমূলক নাটিকা রচনা করেছেন- একটি বিদ্যাপতি, অপরটি বিষ্ণুপ্রিয়া। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি এবং এই কবির জীবন- কাহিনীকে তিনি গ্রামোফোনে নাট্যরূপ দেবার প্রয়াস পান। গ্রামোফোন রেকর্ডের ১৪টি খন্ডে রচিত এ নাটিকা।

নজরুল শুধু রঙ্গমঞ্চত নয়, কলকাতা বেতারের সাথেও অন্তরঙ্গভাবে বিজড়িত ছিলেন। সম্ভবত এই কারণে তিনি বেতার নাটিকাও রচনা করেছেন- যেমন 'জিজয়া' বা 'ঈদ'।

নাটক সম্পর্কে লেখকের সার্বিক মূল্যায়ন হচ্ছে,

> তিনি যদি তাঁর প্রতিভার ধর্মী অনুসরণ করে গীতাভিনয় বা অপেরা রচনায় মনোনিবেশ করতেন তাহলে বাংলা নাট্য সাহিত্য আশ্চর্য সমৃদ্ধ হতো। কেননা তাঁর মত সাংগীতিক প্রতিভা ইতঃপূর্বে আর কোন নাট্যকারের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি- রবীন্দ্রনাথের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রেখেও এ কথা বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু সাহিত্যে নজরুল ঃ মোবাশ্বের আলীর ভাষায়, বাংলা সাহিত্যে মাত্র উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে শিশুদের জন্য গ্রন্থ রচনার প্রয়াস দেখা দেয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা', বিদ্যাসগরের 'বোধোদয়', অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ'। এই সব গ্রন্থ নিছক পাঠ্যপুস্তকরূপে রচিত। এর মধ্যে নীতি, উপদেশ ও আদর্শের কথাই আছে, শিশুদের আনন্দদানের প্রয়াস বিন্দু মাত্র নেই।

বাংলা শিশু সাহিত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের অবস্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম শিশু সাহিত্যকে সাহিত্যের খাস দরবারে ঠাঁই দিয়েছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের স্বরূপ এরূপ যে, তিনি শিশুদের সাথে সহজে অন্তরঙ্গ হতে পারেন না- একটা নির্লিপ্ততা, নিস্পৃহতা ও দার্শনিকতাই অন্তরায় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সাথে নজরুলের ব্যবধান এখানে যে, নজরুল অতি সহজে শিশুদের সাথে অন্তরঙ্গ হতে পেরেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি চির-শিশু, চির-কিশোর'। তাঁর মধ্যে একটা শিশু সুলভ সারল্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর মন শিশুর প্রতি আশ্চর্য সংবেদনশীল। তাই তিনি অতি সহজে শিশুর সাথে একাত্ম হতে পেরেছেন এবং তার মনস্তত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।

তাই শিশুর স্বপ্ন সাধ, আশা- আকাঙ্খা, কীর্তি-কলাপ, খেলা-ধূলা, ঠাট্টা-তামাশা, অনুকরণপ্রিয়তা, স্কুলজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মা-বাবার সাথে মান-অভিমান, বুড়ো দাদুকে নিয়ে হাস্যালাপ, ভবিষ্যৎতের রঙ্গিন স্বপ্ন, কল্পনার রথে চড়ে দুঃসাহসিক অভিযান এ সব তিনি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি এবং সার্থক রূপদান করেছেন।

নজরুল কাব্যে মা ও সন্তানের মধুর সম্পর্ক এক উজ্জ্বল রূপ-লাভ করেছে। শিশুর নিকট তার জন্ম রহস্যজনক এবং এই রহস্যের উন্মোচন না করতে পারলে সে কিছুতেই শান্ত হবে না। তাই অবাক বিস্ময়ে মাকে প্রশ্ন করেঃ

মাগো! আমায় বলতে পারিস
কোথায় ছিলাম আমি
কোন না জানা দেশ থেকে তোর
কোলে এলাম নামি?

- ঘুম জাগানো পাখী, পৃ-২৪

বাৎসল্যরসে উদ্বেলিত মা জবাব দেনঃ

তুই যে আমার, এই ত সেদিন
আমার বুকে ছিলি!

মা-আরো বলেন,

মোদের বুকের কামনায় কি সুপ্ত ছিলি ওরে

Dhaka University Institutional Repository

শিশু হয়ে এলি সকল ইচ্ছা মূর্তি ধরে।

-- আবাহন, নজরুল রচনাবলী, ২য় খন্ড।

শৈশবে নজরুল যে জীবন কাটিয়েছেন তা মুক্ত, স্বাধীন ও অবাধ। বাধাবন্ধনহীন শিশু নজরুলেরই স্বপ্ন-সাধ, আশা- আআঙ্খা ফুটে উঠেছে এ সকল কবিতায়। তরুণ নজরুল স্কুল ছেড়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। তাঁর কবিতাতেও শিশু যুদ্ধে যোগাদানের স্বপ্নই দেখেঃ

মাগো! আমি যুদ্ধে যাব
নিষেধ কি মা আর মানি?
রাত্তিরে রোজ ঘুমের ঘোরে
ডাকে পোলান্ড জার্মানি।

এক গুলিতে উড়িয়ে দিতে
পারি কত মিয়ার কান।

নজরুল শিশুদের জন্য শুধু নাট্যধর্মী কবিতা রচনা করেননি, নাটিকাও রচনা করেছেন- যেমন, 'পুতুলের বিয়ে'। শিশুদের জন্য এ নাটিকাটি খুব উপভোগ্য।

তিনি শিশুকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাসেন বলেই শিশুর প্রতি এই মাঙ্গলিক উচ্চারণ করেছেন। এবং শিশুর প্রতি অন্তরের দরদ তাঁর শিশু-সাহিত্যকে করে তুলেছে প্রাণস্পর্শী ও আবেগময়। এ জন্যে তাঁর শিশু-সাহিত্য হয়ে উঠেছে সার্থক ও অনবদ্য। কিন্তু আফসোসের বিষয়, নজরুল রচিত শিশু-সাহিত্যের সংখ্যা নিতান্ত সীমিতঃ 'ঝিঙেফুল' (১৯২৬), 'সাত ভাই চম্পা' (?), ও 'পিলে পটকা' (১৯৬৪), কাব্যগ্রন্থ; 'সঞ্চয়ণ' (১৯৫৫) ও 'ঘুমপাড়ানী গান' (১৯৬৪) চয়নিকা; 'পুতুলের বিয়ে' (১৯৩৩) নাটিকা ও কবিতা সংকলন।

নজরুলের সার্বিক মূল্যায়ণে মোবাশ্বের আলী,

> এক বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভা নজরুল। তিনি শুধু কবি নন, তিনি ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, শিশু-সাহিত্যিক এবং সর্বোপরি গীতিকার। প্রতিভার বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতায় বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। এবং সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

লেখকের এ গ্রন্থে নজরুল সম্পর্কিত আলোচনায় কোন নতুনত্ব নেই কিংবা কোনো বিশেষ বক্তব্য বা নতুন তথ্য নেই। তবে নজরুলের উপর ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনায় পাঠকসমাজ খুব সহজেই নজরুলের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়

মধুসূদন বসু 'নজরুল কাব্য পরিচয়' (১৯৭০) রাজিয়া সুলতানা 'কথাশিল্পী নজরুল' (১৯৭৫), বাঁধন সেনগুপ্ত 'নজরুল কাব্যগীতিঃ বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ণ' (১৯৭৬), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'নজরুল ইসলাম সাহিত্যজীবন' (১৯৮৮), ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় 'নজরুল ইসলাম: কবি মানস ও কবিতা' (১৯৯২), আতোয়ার রহমান 'নজরুল বর্ণালী' (১৯৯৪), ক্ষেত্রগুপ্ত 'নজরুলের কবিতা: অসংযমের শিল্প' (১৯৯৭), মনোয়ারা হোসেন 'নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্য' (২০০০)। নিম্নে উপরোক্ত লেখকদের আলোচনায় আমাদের মতামত ব্যক্ত করা হলো,

মধূসূদন বসুর নজরুল সাহিত্যের পর্যালোচনা

মধুসূদন বসু রচিত 'নজরুল কাব্য পরিচয়' (১৯৭০) গ্রন্থটির বিষয়সূচী এরূপ- 'নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা', 'নজরুল কাব্যঃ দেশ-কাল', 'বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব', 'নজরুল কাব্যে বিদ্রোহ ভঙ্গী ও বিদ্রোহ বর্জিত-ভঙ্গী', 'নজরুল কাব্যে যৌবনের প্রশস্তি, 'বিদ্রোহী কবি নজরুল', 'নজরুল কাব্যের কয়েকটি দিক', 'ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার', 'নজরুলের গান', 'নজরুলের প্রভাব', তারপর নজরুলের কয়েকটি কাব্য ও কবিতার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা রয়েছে।

'দেশ-কাল' পরিচ্ছেদ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বরে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের কথা দিয়ে শুরু হলেও ধারাবাহিকভাবে রাজনীতির কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনার উল্লেখ অথবা আলোচনা নেই। ১৯৩৪ সনে গভর্ণর স্যার জন এন্ডারসনকে দার্জিলিঙে গুলি করে মারার চেষ্টাতেই দেশকাল পরিচিতি সীমিত এবং কবি জীবনেও ১৯২৬ সন অবধিই দেশকাল প্রভাব নিবন্ধ।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ হচ্ছে, 'বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব' এতে আছে ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বিহারলাল, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্র লাল, রবীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের নতুন চিন্তা-চেতনা সম্পৃক্ত আলোচনা। কাব্যধারার সঙ্গে নজরুল কাব্যের পার্থক্য নির্দেশ সূত্রে দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে মধুসূদন বসু বলেছেন, দেশের প্রতি গভীর অনুরাগের সুর প্রকাশ পেলেও এই সকল কবির দেশাত্মবোধের মনোভাব বিদ্রোহের সুরে ফেটে পড়ে নাই।

অন্যত্র লেখক বলেছেন, নজরুলের পূর্বে মানুষের লাঞ্ছনা-অবমাননায় সহানুভূতির মনোভাব বাংগালী- রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ- কবির কবিতায় প্রকাশ পেলেও তাঁহাদের কবিচিত্তের সেই বেদনার প্রকাশ তাঁহাদের কাব্যের স্থানে স্থানেই কেবল লক্ষণীয়। নজরুলের

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যে মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি এত গভীর যে তাঁর সমসাময়িক বা তাঁর পূর্ববর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের সকল কবিকেই তা অতিক্রম করে যায়।

তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে, 'নজরুল কাব্যে বিদ্রোহ-ভঙ্গী ও বিদ্রোহ-বর্জিত-ভঙ্গী'। এ অধ্যায়ে লেখক বিদ্রোহী কবি নজরুলের বিদ্রোহ-বর্জিত কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে লেখক বিদ্রোহী কাব্য হিসেবে 'অগ্নিবীণা'র কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর পরবর্তী কাব্য 'দোলন-চাঁপা'য় প্রেমমূলক ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা স্থান পেয়েছে। মোদ্দকথা এই অধ্যায়ে লেখক কবির 'বিদ্রোহ ভঙ্গী ও বিদ্রোহ-বর্জিত-ভঙ্গী' আলোচনায় কবির কাব্যগ্রন্থের বিভাজন করেছেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে অর্থাৎ 'নজরুলের কাব্যে যৌবনের প্রশস্তি'তে লেখক বলেছেন, কেবল নজরুলের নয়- আরো অনেক কবিই যৌবনের প্রশস্তি রচনা করেছেন। তবে নজরুল কাব্যে যৌবনের প্রশস্তির কিছু বিশেষ কারণ আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে যখন তাঁর আবির্ভাব হয়, পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ ভারতের মর্মবেদনা তখন তীব্র হয়ে উঠেছে। সে সময়কার বাংলার বিপ্লবী যুবকরা যাতে রাজশক্তির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতে পারে, সেদিকে তাঁর লক্ষ্যছিল। কারণ তিনি জানেন যে, যৌবনই কেবল সর্বপ্রকার মহিমাহীনতা, মালিন্য, জরা ও সংস্কার প্রভৃতিকে দূরীভূত করে পৃথিবীকে সজীব ও নবীন করে রাখতে পারে।

'বিদ্রোহী কবি নজরুল' প্রবন্ধে লেখক কবির রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্যে এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে মুক্তির জন্যে বিপ্লবের, সংগ্রামের ও সংস্কারের আহবান সম্বলিত কাব্য কবিতার আলোচনা করেছেন। এ সূত্রে তিনি 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশনার লক্ষ্যের কথাও বলেছেন।

'নজরুল কাব্যের কয়েকটি দিক' পরিচ্ছেদে লেখক শাস্ত্র, সমাজ, মানুষ, সাম্য, পাপ, নারী প্রভৃতি বিষয়ে নজরুল মানসের বৈশিষ্ট্য ও নজরুলের কাব্যে তাঁর অভিব্যক্তির রূপ উদ্বৃতিযোগে আলোচনা করেছেন।

'নজরুলের কাব্যে সুভাষিত' অধ্যায়ে লেখক, খ্যাতনামা কবিদের ভাবপূর্ণ উক্তিকে সুভাষিত অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ অধ্যায়ে লেখক অন্যান্য লেখকদের ভাবপূর্ণ উক্তির সঙ্গে নজরুলের ভাবপূর্ণ উক্তির আলোচনা করেছেন। লেখকের মতে- নজরুলের সুভাষিতগুলির মধ্যে দেশাত্মবোধক, মানবপ্রীতিমূলক, তারুণ্যের প্রশস্তিমূলক ও মানুষের অপরিমেয় শক্তিতে বিশ্বাসের অভিব্যক্তিমূলক সুভাষিত লক্ষ্য করি। অন্যান্য প্রসঙ্গেও নজরুল- সুভাষিত লক্ষণীয়।

নজরুল কাব্যঃ ভাষা, ছন্দ ও অলংকার নিয়ে ও লেখক আলোচনা করেছেন।

নজরুল সম্পর্কে মধুসূদন বসুর মূল্যায়ণ,

> 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কবিতাটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও এই একটি মাত্র কবিতাই কবি হিসাবে নজরুলকে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত করিয়া তোলে। 'বিদ্রোহী'

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাটি সগৌরবে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আবির্ভাবকে ঘোষণা করে ও সম্ভবতঃ এই কবিতাটির জন্যই তিনি বিদ্রোহী কবিরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন।

রাজিয়া সুলতানার নজরুল সাহিত্যের পর্যালোচনা

রাজিয়া সুলতানার 'কথাশিল্পী নজরুল' (১৯৭৫) গ্রন্থে কথা সাহিত্যিক নজরুলের মানসগঠন, সাহিত্যাদর্শ বা জীবন জিজ্ঞাসার স্বরূপ কি ছিল তা অনুধাবনের প্রয়াস আছে। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়- একজন শক্তিমান সাহিত্য শিল্পীরূপে নজরুলকে লোচন করলে তাঁর উপন্যাসত্রয়ে (বাঁধনহারা- মৃত্যুক্ষুধা-কুহেলিকা) এবং তিনটি গল্পগ্রন্থে (রিক্তেরবেদন- ব্যথার দান- শিউলিমালা) এক বিশেষ সাহিত্যাদর্শ ও অনুধ্যান নজরে পড়ে।

রাজিয়া সুলতানার মতে, কবির সাহিত্য সাধনার প্রাথমিক পর্যায়- বিশ্লেষণ করলে যে তথ্য প্রথমেই নজরে পড়ে- তা হলো গদ্য চর্চায় তাঁর সযত্ন অনুশীলন। ১৯১৯-১৯২০ এই একবছরে প্রকাশিত দশটি গল্প কবিতার মধ্যে সাতাটিই হলো গদ্য রচনা (বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, স্বামীহারা, তুর্কমহিলার ঘোমটা খোলা, হেনা, মেহের নেগার, ব্যথার দান ও ঘুমের ঘোরে), আর তিনটি কবিতা (মুক্তি, কবিতাসমাধি, আশায়), তিনটি কবিতাই দুর্বল।

নজরুলের সমগ্র সাহিত্য জীবনের সূচনা-পর্বের ইতিহাস সামনে রেখে বলা যায়- গল্প লেখক নজরুল কবি নজরুলের অগ্রজ।

কথাশিল্পে নজরুল হৃদয়ের যে ছবি আমাদের চোখে পড়ে তা লেখকের প্রাগ্রসর চিন্তা ধারারই পরিচায়ক। ঔপন্যাসিকের বিষয় জ্ঞান প্রকৃত বিচারে তাঁর "সময় জ্ঞান, সমাজ জ্ঞান, ইতিহাস জ্ঞান এবং ব্যক্তি মানসের জ্ঞান," এই সমস্তের সারাৎসার।

সমকালীন যে সমাজ চিন্তা ও রাজনীতি চিন্তা নজরুলের বিভিন্ন প্রবন্ধে সোচ্চার হয়েছে, তাঁর উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যেও যেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

উপন্যাসে লেখকের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে থাকে। তিনটি গল্প ও তিনটি উপন্যাসের মধ্যে নজরুল-মানসের বিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করার মত। প্রথমে লেখক ছিলেন জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ, ব্যথা-বেদনা ও শোকোচ্ছাসময় বিয়োগান্ত কাহিনী লিখেছেন। মৃত্যুকে যখন তখন কামনা করেছেন। পরবর্তী জীবনে এ ধারণা কিছুটা পাল্টে গেছে। জীবনবিমুখতা ছিল 'ব্যথার দান' (১৯২২), 'রিক্তের বেদন' (১৯২৫) ও 'বাঁধন হারা'য় (১৯২৭)। 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০), 'শিউলিমালা' (১৯৩১) আর 'কুহেলিকা'য় (১৯৩১) জীবনাণুরাগ প্রগাঢ় হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের তিনটি উপন্যাস-'বাঁধনহারা (১৯২৭) মৃত্যুক্ষধা' (১৯৩০) ও 'কুহেলিকা' (১৯৩১)। 'বাঁধনহারা'য় ভাগ্যবিড়ম্বিত কৈশোরের প্রণয়স্বপ্ন ও সৈনিক জীবন আবেগময় ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

'মৃত্যুক্ষুধা'র বিষয়বস্তু বস্তীজীবন, দারিদ্র, ব্যর্থ-প্রেম ও লেখকের রাষ্ট্রবিপ্লবী আদর্শের বিক্ষেপ। আর 'কুহেলিকা'র বিষয়বস্তু সন্ত্রাসবাদী নায়কের প্রতি দারিদ্রপিড়ীত এক নারীর আত্মাভিমান। সবগুলো উপন্যাসের পরিণাম বিয়োগান্ত।

রাজিয়া সুলতানার কথায়, মুসলিম মানসে আঙ্গিক সমৃদ্ধ গল্পের অবয়ব যখন অস্পষ্ট, ঠিক তখনই গল্প-চর্চায় নজরুলের আবির্ভাব ঘটে। ১৯১৯-এর প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানে বিশ্বজোড়া সঙ্কটকালে নজরুলের গল্প প্রেরণার জন্ম দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় গোড়া পর্যন্ত তাঁর গদ্যচর্চার বিস্তৃতি ছিল। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যার পুরাতন সূত্রের পরিবর্তন, রাজনৈতিক সচেতনতা, মূল্যবোধের বিবর্তন, বিশ্বাসের ভাঙ্গন, ফ্রয়েডীয় বিশ্বাস, যন্ত্র-সভ্যতার বিস্তার-সমকালীন সাহিত্যে এসবই ছিল আধুনিক ভাবনা বা প্রগতিবাদ। সমরপ্রস্তুতি অথবা এসবই ছিল আধুনিক ভাবনা বা প্রগতিবাদ। সমরপ্রস্তুতি অথবা রণাঙ্গনের শঙ্কা নজরুলের গল্পকে অল্প বিস্তর অধিকার করেছিল তা বোঝা যায় গল্পের বিষয়- ব্যাপকতায়। এছাড়া, বেকার যুবকের মনোবেদনা (বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী), স্ত্রী কর্তৃক বিশ্বাসঘাতক স্বামী হত্যা (রাক্ষুসী), পল্লীবালার অবগুকিম ভালবাসার কাহিনী (স্বামীহারা), বাৎসল্যতপ্ত মাতৃহৃদয়ের হাহাকার (পদ্মগোখরো), গ্রাম্য দলাদলি (জিনের বাদশাহ), রোমান্টিক প্রেমের মাধুর্য (শিউলিমালা), দেশপ্রেমী এক অভিমান-ক্ষুব্ধ তরুনের অগ্ন্যোৎচ্ছ্বাস (রাজবন্দীর চিঠি) এসবই তাঁর আঠারটি গল্পের বৈচিত্র্যকে প্রসারিত করেছে।

উপন্যাস চিন্তায় লেখকের বক্তব্য হচ্ছে, নজরুলের পূর্বে অমুসলমান লেখকের রচনায় মুসলমান চরিত্র একেবারেই যে ছিলনা- এমন নয়। তবে ঐ সব কথাসাহিত্যে মুসলমান চরিত্র হয় বিকৃত, নয় অতিরঞ্জিত অর্থাৎ বাস্তব বিবর্জিত চিত্রে বিধৃত হয়েছে।

পরিশিষ্টে বলা চলে যে, নজরুল যুগকে গ্রহন করেছিলেন। মুসলমান বলে যুগের প্রশ্নে পাশ কাটিয়ে, অভিমানভরে দূরে পড়ে থাকেননি- অতীতের প্রতি পিছুটান মুক্ত বর্তমানের প্রতি পূর্ণ আসক্তি সমর্থিত নতুন সাহিত্য ধারার অনুবর্তনের সাধনাই অনুক্ষন করে গেছেন।

নজরুল সাহিত্যে সার্বিক মূল্যায়ণে রাজিয়া সুলতানা,

> কাব্যের মত গল্পের ক্ষেত্রেও নজরুল বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য পথিকৃত- একথা গল্পের ইতিহাসে অনুক্ত থাকার নয়। রবীন্দ্র- ঐতিহ্যপুষ্ট গল্প লেখদের মধ্যে তাঁর গল্পগুলি স্বীয়মূল্যে স্বীকৃত হয়েছিল। 'ব্যথার দান' বা 'রিক্তের বেদনে' রবীন্দ্রানুসরণ বেশী। তাই 'শিউলিমালা'র গল্পগুলি রোমান্টিক হয়েও নিঃসন্দেহে আঙ্গিক সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবহ।

Dhaka University Institutional Repository

বাঁধন সেনগুপ্তের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা

'নজরুল কাব্যগীতিঃ বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন' (১৯৭৬) গ্রন্থে লেখক আলোচনার সুবিধার্থে নজরুলের সমগ্র কবিকর্মকে প্রাথমিকভাবে চারটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। প্রকৃতিগত দিক থেকে নিঃসন্দেহে এই পর্বগুলো ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।

প্রথম পর্বঃ রচনা উন্মেষকাল (১৯১১-১৯২০)। এই পর্বে বাল্যকালের কাব্যরচনার অনুশীলন, পালানাটক রচনা এবং মার্চ ১৯২০ খ্রীঃ অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরে আসার আগে সৃষ্ট রচনাগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বঃ জাগরণের কবিতা বা উজ্জীবনী কবিতা রচনার কাল (এপ্রিল ১৯২০-৩০) 'বিদ্রোহী' এ পর্বের অন্তর্গত। বলতে গেলে নজরুলের কাব্যজীবনের পরিচিতি এবং প্রচার এই সময়ে ছিল সর্বাধিক।

তৃতীয় পর্বঃ গীতিধর্মী কবিতার কাল। এই পর্বের (১৯৩১-১৯৩৪) সৃষ্টি-প্রাচুর্যে, বৈচিত্র্যধর্মী কবিকৃতির সাফল্য নজরুলের করায়ত্ত হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে তাঁর প্রতিভার এইটিই শ্রেষ্ঠতম পর্যায়।

চতুর্থ পর্বঃ কাব্যিক প্রয়াসের শেষ অধ্যায় (১৯৩৫-১৯৪২ জুলাই) এই পর্বে কবির হতাশা, ব্যর্থতা ও বহুমুখী প্রচেষ্টা এবং স্ব-বিরোধিতায় পরিপূর্ণ। সাধনা ও তন্ত্রবাদ প্রভাবের পাশাপাশি লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিনী উদ্ধারের প্রচেষ্টা এই পর্বের অন্তর্গত। এই অধ্যায়ের শেষেই কবিজীবনের বেদনাময় পর্যায়ের সূচনা।

প্রথম পর্ব ঃ- বাঁধন সেনগুপ্তের মতে, নজরুলের জীবনের প্রথম পর্বের রচনায় গ্রাম্য কথকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। ধর্মভীরু কবির শিশুসুলভ ভক্তি রসাশ্রিত আবেগ প্রাধান্যই এই সমস্ত কবিতার উৎস। এই সময়ের রচনা 'রাজার গড়' (১৯১৭) প্রথম স্বীকৃত কবিতা। শিয়ারশোল রাজউচ্চ ইংরেজী স্কুলের দুজন শিক্ষকের বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে দুটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' এই পর্যায়ের শেষ দিকে প্রকাশিত (১৯১৯, জুলাই, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা)।

-এ পর্বের অধিকাংশ কবিতায় কাব্যিক উৎকর্ষ যথাযথ প্রতিফলিত হয়নি। বস্তুতঃ কবির রচনায় এই উন্মেশ পর্বটি সেদিক থেকে কাব্য অনুশীলনের সাধনাতেই বিশেষভাবে নিয়োজিত।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ- বাঁধন সেনগুপ্তের ভাষায়, এ পর্বটি বিভিন্ন কারণে নজরুলের কাব্যধারার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহুবিচিত্র রাজনৈতিক ঘটনা সমূহের প্রভাবে এই সময় কবির কাব্যভাবনার বিস্তৃতি ঘটে। এই পর্যায়ে যে সব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা হলো যথাক্রমে-

Dhaka University Institutional Repository

অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলনচাঁপা (১৯২৩), ভাঙ্গার গান (১৯২৪) বিষের বাঁশী (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৫), পূর্বের হাওয়া (১৯২৫) চিত্তনামা (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫) সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৬), সর্বহারা (১৯২৬), ফণিমনসা (১৯২৭), প্রলয়শিখা (১৯৩০), চন্দ্রবিন্দু (১৯৩০), নজরুল গীতিকা (১৯৩০), রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৯৩০)। একটি অনুবাদ গ্রন্থ-একটি ধর্মীয় কাব্য ও দুটি শিশু কাব্যগ্রন্থ সমেত মোট ২২টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে এই পর্বের রচনার ব্যাপ্তি এবং প্রবণতা সর্বশেষ লক্ষণীয়।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকার উপর নজরুলের এ পর্বের কবিতাগুলো প্রতিষ্ঠিত। একদিকে বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলন অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব, ইতিপূর্বে জালিয়ান ওয়ালাবাগের স্মৃতি, ইংরেজের কথার খেলাপ, প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিকদের সঙ্গে ইংরেজেদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কবিকে স্বভাবতঃই শাসকশ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ভাব পরিপোষণ করতেন। সে সময় দেশের জাতীয় আন্দোলনের (১৯২২) যুগসন্ধিক্ষণে 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।

'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের 'বিদ্রোহী' সহ মোট বারটি উদ্দীপনাময় কবিতা কবিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণের কাছাকাছি নিয়ে এলো। নজরুলের কবি প্রতিষ্ঠা ও 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পর থেকেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ১৯২২ খৃঃ ২৩শে নভেম্বর নজরুল 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির জন্য কারাবাস করেন। ফলে তাঁর কাব্যরচনার ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের আবেগ এই পর্বে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। যে আটটি উজ্জীবনী কাব্যগ্রন্থ এই অংশে নজরুলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল সেগুলোর মধ্যে 'সাম্যবাদী' (১৯২৫) ও 'সর্বহারা' (১৯২৬) কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেও কবির উক্ত প্রবণতার পরিচয় বিদ্যমান। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে আন্তর্জাতিকতার পাশাপাশি সুগভীর মানবতাবোধের অনুভূতিই প্রাধান্য পেয়েছে। 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪) এবং 'ভাঙ্গার গান' (১৯২৪) গ্রন্থের কবিতাগুলো সে সময় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জাতিভেদের সংকীর্ণতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং গান্ধীর কারাবাসের পূর্বে দুর্বলচিত্ত জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা 'বিষের বাঁশী' কাব্যেই প্রাধান্য লাভ করেছে।

কিন্তু এই পর্বেই নজরুলের রোম্যান্টিক চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে। একদিকে বিদ্রোহীর উদ্দাত্ত আহবান, অপরদিকে, 'দোলন-চাঁপা'র (১৯২৩) রোমান্টিক সত্তার প্রয়াস নিঃসন্দেহে কবির কাব্যধর্মের দিক থেকে অত্যন্ত উল্লেখ যোগ্য। বিশেষ করে 'সাম্যবাদী' যে সময়ে প্রকাশিত হয় ঐ একই সময়ে (১৯২৫) কবির অন্যতম প্রেমের কাব্যগ্রন্থ 'ছায়ানট' ও 'পূর্বের হাওয়া' এবং প্রশস্তি কাব্য 'চিত্তনামা' প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্রোহী সত্তার অন্তঃস্থিত রোমান্টিক চেতনার স্ফূরণ কবির এই পর্বকে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যের মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

"গীতি ধর্মী কবিতার কাল (১৯৩১-৩৪)"

এই পর্বে নজরুলের পরিণত শিল্পভাবনার পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ গীতিধর্মী কবিতাই এই সময়ে রচিত। এবং গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য পূর্ববর্তী পর্বের আবেগ প্রাধান্য থেকে প্রায় মুক্ত। এই পর্বে সঙ্গীতধর্মী প্রবণতা তাঁর কাব্যচিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। নিম্নলিখিত কাব্যগুলোতে কবির এ সাফল্যের পরিচয় বর্তমান।

(১) সুরসাকী (১৯৩১) (২) বনগীতি (১৯৩২) (৩) জুলফিকার (১৯৩২) (৪) গুলবাগিচা (১৯৩৩) (৫) গীতিশতদল (১৯৩৪) (৬) সুরলিপি (১৯৩৪) (৭) সুরমুকুর (১৯৩৪) (৮) গানের মালা (১৯৩৪)।

শব্দের সার্থক সংযোগ এবং ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে এই পর্বটি উত্তীর্ণ। তাছাড়া রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রাধান্য এই পর্বে প্রায় অনুপস্থিত।

কাব্যিক প্রয়াসের শেষ অধ্যায় (১৯৩৫-৪২)

বাঁধন সেনগুপ্তের ভাষায়, বিভিন্ন কারণে নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনের নিরিখে এ পর্বটি উল্লেখযোগ্য। এ অবস্থায় নজরুলের যে কটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো যথাক্রমে (১) নতুন চাঁদ (১৯৪৫), (২) বুলবুল (১৯৫২), (৩) সঞ্চয়ন (১৯৫৫), মরুভাস্কর (১৯৫৭), (৫) শেষ সওগাত (১৯৫৮), (৬) ঝড় (১৯৬০), (৭) রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১৯৬০) ও (৮) রাঙাজবা (১৯৬০)।

নজরুলের কাব্যের বহুমুখী আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র পর্যায়কে অর্থাৎ কবির কাব্যপর্যায়ের চারটি কালকে অবশেষে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেয়াই বাঞ্চনীয়। কবির বিচিত্র মানসিকতা বিভিন্ন পর্বের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাইশ-তেইশ বৎসরের কবিকীর্তি একটি অখন্ড ঐক্যবোধের প্রতীক হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। পর্বগুলো যথাক্রমে,- (১) নজরুল কাব্যগীতি ঃ প্রস্তাবনা, (২) উদ্দীপক ভাব- স্বদেশী বোধ ও দেশাত্মবোধক চেতনা- বিপ্লবী সত্তা, (৩) সূক্ষ্ম রোমান্টিক চেতনা, (৪) প্রকৃতি-প্রীতি নিসর্গ ও ভাবনা- চিত্রকল্প-প্রতীক (৫) সাম্যবোধ-আর্ন্তজাতিকতা- মানবপ্রেম- সমাজচিন্তা (৬) গীতিধর্মী কবিতা- শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামী গান, (৭) হাস্যরস- কৌতুক ও ছড়াগান (৮) গীতিকবিতার ভাষা সুর ও ভাববৈচিত্র্য- ছন্দবিষয়ক পরিক্রমা, (৯) কাব্যধর্মের সামগ্রিক মূল্যায়ণ- ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার।

নজরুলের সার্বিক মূল্যায়ণে বাঁধন সেনগুপ্ত,

> সময়োচিত আর্তিকে কবি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর উপলব্ধির ভেতর দিয়ে। হয়তো এ জন্যেই তাঁর উপলব্ধির মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা দেখা যায় না। পাঠকের কাছে নজরুল কাব্য তাই তাঁর কালের প্রতিনিধি হয়ে দেখা দেবে। যুগোত্তীর্ণতাই যে-কোনো মহৎ কবির একান্ত আকাঙ্খা বা ইপ্সার প্রতীক।

Dhaka University Institutional Repository

সেদিক থেকে নজরুলের কবিতা ইতিমধ্যেই দেশ-কালকে অতিক্রম করে অর্জন করেছে জিষ্ণুর গৌরবদীপ্ত সম্মান। সময় তাঁর কাছে সোপানমাত্র। বস্তুতঃ তাঁকে বিষয়বস্তুর বিচারে নিঃসন্দেহে সমকালের জাগ্রত প্রতিনিধি বলা যেতে পারে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নজরুল সাহিত্যের পর্যালোচনা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর 'নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন' (১৯৮৮) গ্রন্থের প্রথমেই নজরুল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। লেখকের মতে, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন যুগের কবি। সমসাময়িক যে কোন বড় কবির চেয়ে তাঁর বেলায় একথা বেশি করে সত্য। তিনি ছিলেন অসাধারণ জনপ্রিয়। তাঁর এই জনপ্রিয়তা কিংবা তাঁর সৃষ্ট প্রতিভা তাঁর সময়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষিতেই বিচার্য।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবাই গরিব-দুঃখীদের নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে রয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে একটি বিশেষ দূরত্ব। তবে নজরুল ইসলাম আমাদের প্রথম, এখন পর্যন্ত একমাত্র বড় কবি যিনি এসেছেন গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণী থেকে। তাঁর আগে কিংবা পরে যে তাঁর মত দরিদ্র লেখক আর কেউ আসেনি তা নয়। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাল্যে এবং যৌবনে খুবই গরীব ছিলেন। কিন্তু তিনিও অন্যান্য লেখকের মত, তাঁর বিপ্লবী নায়কের মত সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাদের তিনি নির্দেশ করতে পারেননি কোন পথ, যে পথে আসবে প্রার্থিত স্বাধীনতা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, নজরুল ইসলাম ছিলেন স্বতন্ত্র। তাঁর উদ্দীপনা, মুক্ত মানসিকতা, সাধারণ মানুষের সাথে পুরো একাত্মতা এসেছে তাঁর সামাজিক প্রেক্ষিত থেকেই এবং আমাদের অন্যান্য লেখকদের থেকে পৃথক করেছে তাঁকে। তাছাড়া তিনি জানতেন কোন পথে আসতে পারে মুক্তি। অন্যেরা জানতেন না, জানলেও বলতেন না। নজরুলের উপর অনেকেই প্রভাব ফেলেছিলেন তাদের মধ্যে হুইটম্যান একজন। হুইটম্যানের মত তিনিও ছিলেন মুক্ত পথের যাত্রী।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষায়, নজরুল রচনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে মুসলিম প্রেক্ষিত। তাঁর সমসাময়িক কারো রচনায় মুসলিম চরিত্র তেমন ফুঁটে উঠেনি। নজরুলের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মীর মোশাররফ হোসেনের চেয়েও তিনি উচ্চকণ্ঠ। প্রথম তিনি মুসলিম মানসকে বাংলা ভাষায় তুলে ধরেন। দ্বিতীয়ত, মুসলিম ঐতিহ্যকে স্বাধীনভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা ভাষার শক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতার বিকাশ ঘটান তিনি। শেষত, তিনি দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি সমঝোতা সৃষ্টি করেন, তাঁর আগে আর কেউ তা পারেননি। যদিও তাঁর সম্প্রদায়ই তাঁর আবির্ভাবকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছে তবু তিনি ছিলেন সমগ্র বাংলার কবি।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, নজরুল ছিলেন বিদ্রোহী কবি। দেশের জন্যে এ ধরনের একজন কবির প্রয়োজন ছিল জরুরী সেই মুহূর্তে। কিন্তু তারপরেও অবশ্য স্বীকার করতে হবে, নজরুলে স্ববিরোধ ছিল। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী কিন্তু তাঁর ভেতরে স্থায়ী প্রবণতা ছিল অধ্যাত্মবাদের দিকে। নজরুল সন্ত্রাসবাদীদের জন্য লিখেছেন আবার কমুনিষ্টদের জন্যও লিখেছেন। এটাও একটা দ্বন্দ্বই। আসলে তাঁর ব্যাপারটি ছিল এই যে, তিনি ছিলেন মুক্ত পথের কবি- তিনি তাঁর কল্পনা ও চেতনাকে তাঁর সময়ের সকল কিছুর দ্বারাই প্রভাবিত হতে দিয়েছিলেন। এদিক থেকে বলা যায়, এই দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে থাকতে পারার জন্য নয়, এই দ্বন্দ্বের কারণেই তিনি বড় কবি। এই দ্বন্দ্ব যে শুধু ছিল তাঁর ব্যক্তিগত তা নয়, এ দ্বন্দ্ব ছিল সে যুগেরও, যে যুগের কবি ছিলেন তিনি।

কিন্তু সব কিছুর উপরে তিনি একজন শিল্পী। তিনি জানতেন কিভাবে ক্রোধ এবং আবেগকে, সেই সমস্ত বিষয়কে যা সকল সময় শৈল্পিক বন্ধনের জন্যে উপযুক্ত থাকে না তাকে বাঁধতে হয় শিল্পের শৃঙ্খলায়। তিনি সফল হয়েছিলেন কবি হিসেবে কারণ গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তিনি বীর হিসেবে।

নজরুল ইসলামের ছোটগল্পের- বই 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'শিউলী মালা'। আর তিনটি উপন্যাস হচ্ছে 'বাঁধন-হারা', 'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যু ক্ষুধা।'

এই নামগুলোর মতো বইগুলো কাব্যিক। কাহিনী সৃষ্টির ক্ষেত্রে সময় দেয়ার মত তাঁর অবকাশও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। ফলে কাহিনী হচ্ছে তাঁর কাহিনীমূলক রচনার দুর্বলতম অংশ। তিনি সমস্ত জোর দিয়েছেন আবেগের উপর, তার, চরিত্রগুলো আবেগেরই প্রতিনিধি। পাঠককে নাড়া দিবে তাঁর ভাষা, যেখানে কল্পনার ঐশ্বর্য প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষায়, সাধারণতঃ তাঁর বিষয় হচ্ছে বিষাদাত্মক, অসফল ভালবাসার সাথে জড়িত। তাঁর কাহিনীমূলক রচনার অঙ্গন জুড়ে করুণ বিষন্নতার অদ্ভূত এক আবহ সৃষ্টি হয়েছে। মানব জীবনের কোন মহৎ সত্যকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেননি কিন্তু কোন বিশেষ চরিত্র কিভাবে জীবনকে দেখে, দুঃখ পায় দেখিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি নিরাসক্ত না হয়েই লিখেছেন, লিখেছেন আত্মজীবনীমূলক। এটা তাঁর বড় একটি দুর্বলতা। গদ্য লেখার অনেক সুন্দর গুন তাঁর ছিল, বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, পাকা ভাষা এবং যথোপযুক্ত কলপনাশক্তি। কিন্তু তিনি জানতেন না কিভাবে তাঁর জানা বিষয়কে, অনুভূতিকে, অভিজ্ঞতাকে অন্য একটি রূপ দিতে হবে, লিখতে হবে নিজে দূরে থেকে, হতে হবে লক্ষ্যমুখী।

লেখক তাঁর উপন্যাসগুলোর বিষদ আলোচনা করেছেন। কালানুক্রমিক আলোচনায় বাঁধনহারা ১৯২৭ সালে প্রকাশ হয়, মৃত্যুক্ষুধা ১৯৩০-এ। কিন্তু এ দুটো উপন্যাসের পার্থক্য কম

Dhaka University Institutional Repository

নয়। প্রথম উপন্যাসের অনিশ্চিত, অনভিজ্ঞ অবস্থা থেকে পরবর্তী উপন্যাসে পরিপক্কতা অর্জন করেছেন তিনি। নজরুলের কবিসত্তা বিকশিত হয়নি ঠিকই কিন্তু ঔপন্যাসিক নজরুল অবশ্য বিকশিত হয়েছিলেন।

নাটকঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষায়, নজরুলের নাটক তাঁর বিদ্রোহের কবিতা কিংবা গদ্য রচনার চেয়ে বরং তাঁর গান আর ভালবাসার কবিতাগুলোর কাছাকাছি। অবশ্য তাঁর নাটকে যে বিদ্রোহ নেই তা নয়, কোথাও কোথাও বিদ্রোহ আছে। কিন্তু রুঢ় উন্মোচিত বাস্তব তার নাটকে দেখা যায় না। গদ্য শিল্প হিসেবে নজরুল জীবনকে গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু নাট্যশিল্পী হিসেবে তিনি আদর্শায়িত করেছেন জীবনকে।

নজরুলের 'ঝিলিমিলি', 'আলেয়া', 'ভূতের ভয়', আরো অনেক একাঙ্কিকার মধ্যে 'ঝিলিমিলি' হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম।

প্রবন্ধঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, নজরুল প্রবন্ধ লিখেছেন প্রচুর বিষয়ের উপর। তার মধ্যে একটি চমৎকার প্রবন্ধ হল 'আজকের বিশ্বসাহিত্য'। এটি বিশ্বসাহিত্যের উপর একটি ব্যক্তিগত মূল্যায়ন।

তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হচ্ছে 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম।' এতে তিনি সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামত দিয়েছেন।

> এখন আমাদের বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদের লেখার জড়তা দূর করিয়া তাহাতে ঝর্ণার মত ঢেউ ভরা চপলতা ও সহজমুক্তি আনিতে হইবে। যে সাহিত্য জড়, যার প্রাণ নাই, যে নির্জীব- সাহিত্য দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকের লেখায় মুক্তির জন্য উদ্দাম আকাঙ্খা ফুটিতে দেখা যায়।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সার্বিক মূল্যায়ণ,

> নজরুল ইসলামের আগমনের ফলে পরিবর্তন এলো নাটকীয়। ------ প্রথমত তিনি মুসলিম মানসকে বাংলা ভাষায় তুলে ধরেন। ফলে বাংলা সাহিত্য নতুন অনুভূতিতে সম্পদশালী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, মুসলিম ঐতিহ্যকে স্বাধীনভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা ভাষার শক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতার বিকাশ ঘটান তিনি। তৃতীয়ত, মুসলমানদের তিনি নতুনভাবে আত্মবল দান করেন, যে সব অবস্থান থেকে তারা বহিস্কৃত, আশাবান করে তোলেন তাদের সেখানে ফিরে আসতে। বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত ছিল অদ্ভুত রকমের নৈতিক রক্ষণশীল। তিনি তাদের চেতনায় শিল্পের আনন্দের স্থান করে দেন। শেষত, তিনি দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটা সমঝোতা সৃষ্টি করেন, তাঁর আগে আর কেউ তেমন পারেননি। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক; বিয়ে করেছিলেন হিন্দু রমনীকে আর হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের মধ্যেই আপন হয়ে থাকতেন। যদিও তাঁর সম্প্রদায়ই তাঁর আবির্ভাবকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছে তবু তিনি ছিলেন সমগ্র বাংলার কবি।

Dhaka University Institutional Repository

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় 'নজরুল ইসলামঃ কবি মানস ও কবিতা' (১৯৯২) গ্রন্থটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। পূর্বভাগঃ নজরুল কবিমানস এবং উত্তরভাগঃ নজরুল কবিতার নিবিড় পাঠ। এ দুটি ভাগেই লেখক মূলতঃ নজরুল ইসলামকে কবিরূপে উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থের পূর্বভাগে রয়েছে, নজরুলের সমকালীন বাংলা কবিতা, আধুনিকতা আলোচনার দ্বারা নজরুলের আধুনিক কবি মানসের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা, নজরুল কাব্যে ঐতিহ্য সাধনা, স্বদেশ প্রেম, রাজনৈতিক মতাদর্শ, মানব প্রেম, অসাম্প্রদায়িকতা, রোমান্টিকতা, প্রেম, নারী, প্রকৃতি, আধ্যাত্মিকতা, শব্দ-ছন্দ-চিত্রকল্প ইত্যাদি। প্রয়োজনানুযায়ী পূর্বসূরীদের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধিতা ও করা হয়েছে।

'নজরুল ইসলাম ও সমকালীন বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে লেখকের মতামত হচ্ছে, নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তাঁর সাহিত্য চর্চা করেছেন তেইশ বছর- ১৯১৯-১৯২৪। নজরুল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দশ বছর প্রধানত কবিতা এবং শেষ তের বছর মুখ্যত সঙ্গীত রচনা করেছেন। নজরুলের সাহিত্যজীবন ধরা যেতে পারে প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু হওয়ার দুবছর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুটি মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়। সাহিত্য জীবনে নজরুল আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' (১৮৮২) থেকে শুরু করে 'বলাকা' পর্যন্ত (১৯১৬) কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুলের সাহিত্যিক জীবন শুরু হওয়ার পূর্বেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) জীবিত অবস্থায় বারোটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির তালিকা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলা কবিতা ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে পূর্ণতার গৌরব অর্জন করেছিল। অবশ্য এই পর্বে অর্থাৎ বর্তমান শতকের প্রথম দু'দশকে আবির্ভূত কবিচতুষ্টয়ের রবীন্দ্রবলয় বহির্ভূত স্বাতন্ত্রনির্ণয় দুঃসাধ্য; কেননা, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁরা ছিলেন রবীন্দ্র-অনুসারী। করুণানিধান বন্দোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৯৯-১৯৭৫), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০) কালিদাস রায় (১৮৯৯-১৯৭৫) প্রমুখ কবিচতুষ্টয় সচেতন বা অচেতনভাবে রবীন্দ্রবৃত্তে লালিত ও পরিবর্ধিত। রবীন্দ্র-প্রতিভার দুরন্ত আলোকোচ্ছাসের পর্বেও প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৬-১৯৪৬), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬০-১৯১৩), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) রবীন্দ্র কাব্যপরিধিতে আবির্ভূত হয়েও স্বতন্ত্র কবি ব্যক্তিত্বে বাংলা কবিতার বলয়কে প্রসারিত ও উজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে দুই শিবিরের কোন একটির অন্তর্ভূক্ত না করে উভয় শিবিরের সেতুরূপে উল্লেখ করা চলে। লেখক ওয়াল্ট হুইটম্যানের সঙ্গে ও নজরুলের তুলনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটির উত্তরভাগে নজরুলের কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতার প্রকরণ কৌশল আলোচনা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই আলোচনার কালে লেখক কবিতার উৎস নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নজরুলর মূল্যায়ণ,

> মাটির সঙ্গে সত্য আত্মীয়তা অর্জন করার জন্যই তাঁর কাব্য বিষয়ের দিক থেকেই নয়, কাব্যকলার আদর্শের দিক থেকেও নতুন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল জনমনে কাব্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত করা। ফলে তিনি হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পুরাণ ইতিহাস যেমন নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন; তেমনি তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, আরবী, ফার্সী শব্দ ব্যবহারেও তাঁর কোনো সংকীর্ণতা ছিল না। কাব্যকলা ও ঐতিহ্যবোধ মুক্ত সাহিত্যতত্ত্বই তাঁর অভিপ্রেত ছিল। সাহিত্যতত্ত্বে নজরুল ইসলাম কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত নন; তিনি মানববাদী- 'হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক। শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাড়াইয়া মানব! তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিমবাণী ফুটাও দেখি। বল দেখি, আমার মানবধর্ম'।

আতোয়ার রহমানের নজরুল সাহিত্যের পর্যালোচনা

আতোয়ার রহমান রচিত 'নজরুল বর্ণালী', গ্রন্থটি ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪- নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত। লেখক এ গ্রন্থটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। 'কথাশিল্পী নজরুল', 'শিশুসাহিত্যিক নজরুল', প্রবন্ধকার নজরুল', 'অনুবাদক নজরুল', সাংবাদিক নজরুল', 'নজরুল সঙ্গীতে ঋতুচেতনা', 'নজরুল সাহিত্যে বাংলাদেশ' 'নজরুল কাব্যে দেশবন্দনা', 'নজরুল কাব্যে হযরত মোহাম্মদ', 'নজরুল সাহিত্যে হাস্যরস', 'নজরুলের দৃষ্টিতে সাহিত্য', 'নজরুলের ধর্মবোধ', 'নজরুল সাহিত্য সংগ্রহ।'

''কথাশিল্পী নজরুল' অধ্যায়ে লেখক প্রথমেই বলেছেন যে; কবিতার বাইরে নজরুলের সৃষ্টির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী কথাসাহিত্যে। তারপর নজরুলের জীবনী ও সমসাময়িক ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন।

লেখকের মতে, কথা-সাহিত্যে নজরুলের প্রতিভার ফল বিধৃত হয়েছে ছয়খানি গ্রন্থে,- তিনখানি গল্প- সংকলনে আর তিনখানি উপন্যাসে।

গল্প সংকলনের মধ্যে 'রিক্তের বেদন', 'ব্যথার দান' ও 'শিউলিমালা' উপন্যাসের মধ্যে 'বাঁধন-হারা'; 'মৃত্যু-ক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা'। লেখক এগুলোর বিস্তৃতি বর্ণনা করেছেন।

'শিশু-সাহিত্যিক নজরুল' অধ্যায়ে লেখক বিস্তৃত আলোচনার পর স্বল্প কথায় বলেছেন, নজরুলের শিশুতোষ রচনা যদিও পরিমাণে অল্প তিনি আধুনিক বাংলা শিশু সাহিত্যের এক বিশিষ্ট স্রষ্টা।

Dhaka University Institutional Repository

'প্রবন্ধকার নজরুল' অধ্যায়ে আতোয়ার রহমানের মতে, প্রথমেই বলেছেন প্রবন্ধকার নজরুল এতো দিনেও সুবিচার পাননি।

লেখকের মতে, নজরুল যে সমস্ত রচনাকে প্রবন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন তা প্রথমে 'নবযুগ, ধূমকেতু' আর 'গণবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পরে অর্থাৎ ১৩২৬ থেকে ১৩৩৩ সালের মধ্যে সবই গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকার নজরুলের বিষয়াদি ছিল সাময়িক।

'অনুবাদক নজরুল' অধ্যায়ে লেখক উল্লেখ করেছেন নজরুলের অনুবাদগ্রন্থের সংখ্যা তিন এবং এগুলির সবই কাব্য, যদিও মূল রচনা সকল ক্ষেত্রে কাব্য নয়। আর নজরুলের অনুবাদ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে, এগুলো কোনো দিনই তাঁর মৌলিক রচনার মতো জনপ্রিয় হয়নি এবং এর মূলে রয়েছে মৌলিক রচনার তুলনায় অনুবাদ ভাবানুবাদের অপকৃষ্টতা। তারপরও লেখক বলেছেন নজরুল যে উৎসাহে আরবী- ফারসী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন এবং নিয়ে কোরান শরীফ আর ফারসী কাব্য পাঠে অগ্রসর হয়েছিলেন সে আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে পাঠ করলে তার অনুবাদগুলো সার্থক হয়ে উঠতো।

'নজরুল সাহিত্যে বাংলাদেশ' অধ্যায়ে আতোয়ার রহমানের ভাষায়, পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগের সংক্ষিপ্ততার কথা উল্লেখ করেছেন। এই যোগাযোগ তার রচনায় কি ভাবে ছায়াপাত করেছে তাকে চারটি বর্গে ভাগ করে দেখিয়েছেন। প্রথম বর্গে বাংলাদেশের ছায়াপাত ঘটেছে সংশ্লিষ্ট রচনাগুলির সামাজিক তথা স্থানগত পটভূমিরূপে। এই ছায়াপাত কার্য্যতঃ প্রত্যক্ষ এবং সর্বাংশেই গদ্য রচনায় সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় বর্গে আমরা বাংলাদেশী বিষয় দেখতে পাই মুখ্যতঃ কবিতায় আর গানে, সাধারণ পল্লীচিত্রের তথা প্রকৃতি বর্ণনার মাধ্যমে। তৃতীয় বর্গের বিষয়ের ধারক ও ছন্দিত রচনা। তবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছায়া ফেলেছে নিতান্তই পরোক্ষভাবে। চতুর্থ বর্গে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষভাবেই উদ্দিষ্ট।

'নজরুল-কাব্যে দেশবন্দনা' অধ্যায়ে লেখক নজরুলের দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান রচনার বিশদ আলোচনা করেছেন।

'নজরুল-কাব্যে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)' অধ্যায়ে লেখক হযরত মোহাম্মদ (সঃ)কে নিয়ে লেখা কবিতা, গানের রচনাকে তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে-হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর জন্ম বিষয়ক, মৃত্যু বিষয়ক এবং বিবিধ।

'নজরুল-সাহিত্যে হাস্যরস' অধ্যায়ে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে, নজরুলের গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা- সব শ্রেণীর রচনাতেই একটি নিঃসঙ্কোচ হাস্যরসিক মনের উচ্ছলতা প্রতিফলিত। সে-মন কোথাও মজলিসী কৌতুকে উচ্ছল, কোথাও বা কান্না ঢাকার উদ্বেগে উদ্বেল। আবার শ্লেষ আর ব্যঙ্গের প্রখরতাও তাঁর রচনায় কম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

'নজরুল ধর্মবোধ' অধ্যায়ে আলোচনায় স্পষ্ট এবং সংক্ষেপে বলেছেন, ধর্ম নজরুলের কাছে প্রচলিত অর্থের ধর্ম নয়, মানুষের কল্যাণকামী এক ঈশ্বর-আশ্রয়ী মতবাদ। নজরুল এর নাম দিয়েছেন মানবধর্ম। এবং 'মানুষ মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য কোনো হিংসার দুষমনীর ভাব আনে না।' উল্লেখ্য, নজরুল এসব কেবল মুখেই বলেননি, নিজের জীবনেও প্রয়োগ করেছেন।

ক্ষেত্রগুপ্তের নজরুল সাহিত্যের পর্যালোচনা

নজরুলের কবিতাঃ অসংযমের শিল্প (জানু-১৯৯৭)- গ্রন্থে ক্ষেত্রগুপ্ত প্রথম প্রস্তাব থেকে শুরু করে অষ্টম প্রস্তাব পর্যন্ত কবিতার বিভাজন করে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব বাদ দিয়ে প্রত্যেকটি প্রস্তাবে কতকগুলো করে কবিতা রয়েছে। লেখক প্রত্যেকটি কবিতার বিস্তৃতি আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবে 'অনামিকা' ও তৃতীয় প্রস্তাবে 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবিতাটি আলোচনা করেছেন। প্রথম প্রস্তাব 'শব্দ ও বাক্য-বন্ধের প্রেক্ষিত, ২য় প্রস্তাব 'শরীরের তৃষ্ণা অথবা শরীরী তৃষ্ণা', ৩য় প্রস্তাব 'অর্থ-ভাঙা ধ্বনির নৃত্য', চতুর্থ প্রস্তাব 'দুনিয়ার রঙিন নেশায়', পঞ্চম প্রস্তাব' অন্ধকারের উৎস সন্ধানে' ষষ্ঠ প্রস্তাব- 'সর্বহারা সাম্যবাদী কবিতা', সপ্তম প্রস্তাব 'ক্লান্ত আশ্রয় প্রকৃতিতে প্রেমে নারীতে' এবং অষ্টম প্রস্তাব 'তরঙ্গিত বন্ধু' এরূপ নাম দিয়ে আলোচনা করেছেন।

'পরিশিষ্ট আলোচনায় ক্ষেত্রগুপ্ত নজরুল ইসলামের প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল, উৎসর্গ, কবিতার সংখ্যা ইত্যাদি ধারাবাহিক ভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

মনোয়ারা হোসেনের নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্যের পর্যালোচনা

মনোয়ারা হোসেন এর 'নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্য' (২০০০) আলোচিত প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে 'নজরুল পূর্ববতী বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য', 'সমকালীন প্রবন্ধ সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান সমাজ', 'নজরুলের রাজনৈতিক প্রবন্ধ', 'নজরুলের আর্থ-সামাজিক প্রবন্ধ', 'নজরুলের সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ'।

'নজরুল পূর্ববতী বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য' অধ্যায়ে লেখক উনিশ শতক অর্থাৎ ১৮১৮ সালের প্রবন্ধ থেকে আলোচনা শুরু করেছেন। পযায়ক্রমে এসেছেন রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬), রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), রাজ নারায়ন বসু (১৮২৬-৯৯), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪) প্রমুখের নাম। তবে লেখকের মতে, প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এবং প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখক প্রথম যথার্থ শক্তিশালী প্রাবন্ধিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস,

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতি, শিক্ষা, দর্শন, জীবন ও জগতের বিচিত্র বিষয় নিয়ে গভীর জিজ্ঞাসা ও চিন্তার পরিচয় বিধৃত আছে তাঁর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে। রচনা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভার কারণে রবীন্দ্রনাথ তাকে সব্যবাচী রূপে অভিহিত করেছেন।

লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন।

১। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প

২। ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন

৩। শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, তাছাড়া লেখক বঙ্কিমানুসারী লেখকদের কথাও উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, দেশ, ধর্ম তথা বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধে তাঁর মনন, ব্যক্তিত্ব বিধৃত। প্রবন্ধগুলোর স্বয়ংসম্পূর্ণ মূল্য যেমন যাছে তেমন এসবের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অথবা সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত কবির চিন্তা, চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

লেখকের মতে, প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ রচনায় মঙ্গল সাধনের কথা বলেন নি, তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

নজরুল পূর্ব বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো, তারই ধারবাহিকতায় বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দ'শকে রচিত নজরুলের প্রবন্ধাবলী বিচার্য। উপর্যুক্ত আলোচনায় যা লক্ষণীয় তা হলো এই যে, বাংলা সাহিত্যের প্রধান তিনজন প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী তিনজনই সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। ধর্ম এবং ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ মননশীল এবং সাধু ভাষায় আলোচিত, রবীন্দ্রনাথ সাধু এবং চলতি উভয় ভাষাতেই মননশীল এবং সৃজনশীল প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্রের মাধ্যমে শুধু চলিত ভাষার প্রচলন নয় সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি ও স্টাইলের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন।

'সমকালীন প্রবন্ধ সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান সমাজ' অধ্যায়ে মনোয়ারা হোসেন বলেছেন, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে 'কল্লোল' যুগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষিত অগ্রসর মুসলমান গোষ্ঠী 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দশকেই বেশ কয়েকজন মুসলমান লেখক স্বদেশী আন্দোলনের উদার বীর্যবত্তু জাতীয়তাবাদের প্রেরণার উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য বেগম রোকেয়া, কাজী ইমদাদুল হক, লুৎফর রহমান, আবুল হুসেন। এ সময়ে বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী চেতনার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় তাকে ধারণ করেই বাংলা সাহিত্যে বেগম রোকেয়া (১৮৮৩-১৯৩২) আবির্ভূত হন। তিনি চিন্তা -চেতনায় যথেষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

প্রাগ্রসর ছিলেন, তাঁর অনেক বক্তব্যই আধুনিক যুগের চিন্তা-চেতনার সমান মূল্য পেতে পারে। বিভিন্ন প্রবন্ধে সমাজের অথবা নারী জাতির যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তার সাথে বর্তমানেরও অনেক সাদৃশ্য আছে। বেগম রোকেয়ার বিভিন্ন রচনার সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের রচনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন, নজরুলের 'নারী' কবিতা। কাজী আব্দুল ওদুদ সত্যিকার মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মশরারফ হোসেন, পন্ডিত রেয়াজউদ্দিন, কায়কোবাবদ, কাজী ইমদাদুল হক ও মিসেস আর এম হোসেনের নাম উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে বেগম রোকয়াকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন।

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) সমাজ সংস্কারক না হলেও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) ছিলেন সমাজ, সৌন্দর্য ও মঙ্গল সচেতন সাহিত্যিক। তাঁর রচনায় মানুষের অসীম সম্ভাবনার প্রতি যে বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে, পরবর্তীতে নজরুলের লেখায় তার বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে।

মনোয়ারা হোসেনের মতে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে সব মুসলমান বুদ্ধিজীবির মধ্যে প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী চিন্তার স্ফুরণ ঘটেছিল আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৪) ছিলেন তাঁদের মধ্যে বলিষ্ঠ চিন্তার অধিকারী। সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা-সাহিত্য তথা জীবন-চর্চার বহুমাত্রিক বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁর মুক্তবুদ্ধি আর আধুনিক মননের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। লেখকের মতে, আবুল হুসেনের চিন্তা-চেতনাও নজরুলকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়।

প্রাবন্ধিক হিসেবেই কাজী আব্দুল ওদুদের খ্যাতি ও পরিচিতি। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম দিশারী কাজী আবদুল ওদুদ মুসলমান সমাজকে মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন করে তুলতে চেয়েছেন। ইসলাম ধর্মের প্রগতিশীল দিকটি তুলে ধরে তিনি মুসলমান সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও আবুল হোসেন নজরুল সমসাময়িক হলেও সাহিত্যিক হিসেবে নজরুলের পূর্বসূরী আর কাজী আবদুল ওদুদকে নজরুলের সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও লেখকরূপে নজরুলের উত্তরসূরী বলা চলে। তবে ঐ চারজন সাহিত্যিক ছিলেন বিশ শতকের প্রথমার্ধে শুধু বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যেই নয় বরং সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক বেগম রোকেয়া, কাজী ইমদাদুল হক এবং মোহাম্মদ লুৎফর রহমান কিন্তু সমকালে স্বসমাজে যথেষ্ট স্বীকৃতি পাননি। এ

Dhaka University Institutional Repository

সময়কার বাঙালী মুসলমান সমাজের শিক্ষার দৈন্য, শিল্প সাহিত্যের সূক্ষ্মতা উপলব্ধিকে বিঘ্নিত করেছে। এ কারণেই নজরুলের উদার মানবিক চিন্তা-চেতনা বা মুক্ত বুদ্ধির পরিচর্যার মূল্য তারা দিতে পারে নি। তবু নজরুলকে পথিকৃত সাহিত্য শিল্পীর মর্যাদা দেয়া যায়। কারণ তিনিই বাঙালী মুসলমান সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দিতে পেরেছিলেন।

'নজরুলের রাজনৈতিক প্রবন্ধ' অধ্যায়ে লেখক বলেছেন, প্রথম মহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, নব্যতুর্কী অভ্যুত্থান, আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রাম, যুক্ত হয়েছিল পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম-নজরুলের আবির্ভাব এই সময়টাতেই। প্রথম মহাযুদ্ধের ভারতের অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লববাদের অশান্ত পরিবেশে সাম্যবাদী ভাবধারা প্রভাবিত নজরুল একের পর এক 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', 'লাঙ্গল', 'গণবাণী', পত্রিকায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির কথা লিখেছেন। প্রথম থেকেই নজরুল ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার।

মনোয়ারা হোসেনের মতে, বস্তুত নজরুলের রাজনৈতিক রচনাবলী কেবলমাত্র বিদেশী শাসন ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামেই এ দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেনি বরং দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নব্য উপনিবেশ পূর্ব বাংলার মানুষ তথা বাঙালীকে উদ্দীপিত করেছে স্বাধিকার তথা স্বাধীনতার সংগ্রামে, একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে নজরুল সৃষ্টির প্রভাব ছিল অপরিসীম। কারণ সৈনিক নজরুল তার সাহিত্যিক সাংবাদিক সঙ্গীতজ্ঞ জীবনের শুরু থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে গেছেন। পাকিস্তানের বাঙালীরা সেই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েই রক্তাক্ত সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে। তাই নজরুল বাঙালী তথা বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

মনোয়ারা হোসেনের কথায়, নজরুলের রাজনৈতিক প্রবন্ধ কিন্তু শুধু পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করার জন্যেই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার এবং আমলাতন্ত্র, সামন্তবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধেও বলিষ্ঠ উচ্চারণ। নজরুলের রাজনৈতিক ও স্বদেশী শোষণ, সামন্ত্রতান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা, বর্ণাশ্রম শাষিত সমাজ ব্যবস্থা এবং সাম্প্রদায়িকতা তথা মৌলবাদের বিরুদ্ধে বিশের দশকের শেষ অবধি বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ রচনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নজরুলই প্রথম রাজনৈতিক লেখক।

'নজরুলের আর্থ সামাজিক প্রবন্ধে' লেখকের বক্তব্য হচ্ছে, একজন সাহিত্যিক দেশ-কাল-সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়; স্বদেশ, স্বকাল, প্রেক্ষাপট কবিমানসকে প্রভাবিত করে এবং তার প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। সুতরাং সাহিত্যে একদিকে যেমন সমকাল প্রতিফলিত হয়, তেমনি সমকাল প্রভাবিত সাহিত্যিকের মানস বৈশিষ্ট্য ও তাঁর সাহিত্যে রূপ পায়। নজরুলের প্রবন্ধাবলীর মধ্যেও বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার, সমকালীন জনমানসের চিন্তা, চেতনা, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, প্রত্যাশা, অচরিতার্থতার বেদনা ও যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের মানস বৈশিষ্ট্য তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক মনোভাব, তাঁর ধর্ম চেতনা, সাহিত্য ও সঙ্গীত তথা সাংস্কৃতিক রুচি এ সব প্রবন্ধে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মনোয়ারা হোসেনের মতে, আর্থ সামাজিক প্রবন্ধে নজরুলের স্বসমাজ অর্থাৎ বাঙালী মুসলমান সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে; সর্বোপরি নজরুল তাঁর সমকালীন পারিপার্শ্বকে কোন দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন তা-ও এসব প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। এসব প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশিত 'জননীদের প্রতি', 'পশুর খুটিনাটি বিশেষত্ব' ও 'জীবন-বিজ্ঞান' 'মোসলেম ভারত' প্রতিকায় প্রকাশিত 'সাত-ইল-আরবের পরিচিতি'। তাছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত যার মধ্যে নজরুলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাচেতনা ও মূল্যবোধ বিধৃত। যুগবাণী গ্রন্থে ২১টি প্রবন্ধ সংকলিত।

নজরুল বাস্তব সচেতনতা নিয়ে দেশ-কাল-জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই এ সময়কার স্ববিরোধ, ক্ষোভ, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ তথা দেশের পরিবর্তনশীল মানসিকতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন যার চিহ্ন তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধাবলীতে বিধৃত।

'নজরুলের সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ' অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে নজরুলের শিক্ষা, সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুলের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-ভাব ও কাজ, সত্য শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যা 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং 'যুগবাণী' গ্রন্থে সংকলিত।

বাংলা সঙ্গীতের অন্যতম সার্থক রূপকার, মৌলিক সৃজনশীল সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম সঙ্গীত সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সুর ও শ্রুতি/ মিয়াকা সারং/ দু'টি রাগিনী/ হোসেনী কানাড়া/ নীলাম্বরী/ যাম যোজনের কড়ি মধ্যম প্রভৃতি লিখেছেন।

লেখক বলেছেন, নজরুলের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রবন্ধাবলীর পর্যালোচনায় একটা-সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে নজরুল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন আধুনিক মানুষ। বিশের দশকে সাময়িক পত্রে আর ত্রিশের দশকে গ্রামোফোন রেকর্ড, নজরুলের মেধা ও মনন, চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী প্রবন্ধ সাহিত্যে যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তার গুরুত্ব তাঁর সৃষ্ট কবিতা, উপন্যাস, গল্প নাটক ও সঙ্গীত অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

সৃজনশীল শিল্পকর্মে শিল্পী থাকেন সৃষ্টির আড়ালে যেখানে ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকের আবরণে তিনি থাকেন প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্যে নজরুল প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট অথচ সাবলীল। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য সঙ্গীত বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ঐ সব প্রবন্ধে নজরুলের জীবনদর্শন স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ভাষার মারপ্যাঁচ, ভঙ্গীর দুরুহতা, আঙ্গিকের

Dhaka University Institutional Repository

বেড়াজাল, পান্ডিত্যের কন্টকতা প্রাবন্ধিক নজরুল আর পাঠকের মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে না। শুধু সহজ কথা নয় কঠিন কথাও নজরুল সহজভাবে বলেন তাঁর প্রবন্ধে, জটিল শাস্ত্রের জট নজরুল প্রবন্ধে কত সহজেই না উন্মোচিত। নজরুলের আগে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ।

প্রাবন্ধিক নজরুলকে যদি আমরা প্রাবন্ধিক বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর সাথে তুলনা করি তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে উনিশ শতকের ভাবধারা এবং ধ্যান-ধারণা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তত্ত্বগত তেমন বস্তুগত; রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ উনিশ ও বিশ শতকের সেতুবন্ধন, বঙ্কিমের ধারা রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরীতে গিয়ে মিলেছে। প্রমথ চৌধুরী একান্তভাবেই বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধকালীন সময়ের আধুনিক মননশীল প্রাবন্ধিক। নজরুল প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ের প্রতিনিধি। সর্বোপরি শুধু মাসিক বা ত্রৈমাসিক নয়, সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রকাশক। প্রাবন্ধিক নজরুলের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যতিক্রমধর্মীতা এ কারণেই অনস্বীকার্য।

'নজরুলের সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ' অধ্যায়ে লেখক সাংস্কৃতিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে নজরুলের শিক্ষা, সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনার আলোকপাত করেছেন। নজরুলের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- 'ভাব' ও 'কাজ', 'সত্য শিক্ষা', 'জাতীয় শিক্ষা', 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', যা 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং 'যুগবাণী' গ্রন্থে সংকলিত।

লেখকের মতে, নজরুল মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন। সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি সাহিত্যের কল্যাণকর ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি যে শুধু বাংলা, হিন্দু-উর্দু, আরবী বা ফারসী সাহিত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তা নয়, বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কেও ছিল তাঁর স্বচ্ছ ধারণা যার উৎস ছিল তার আন্তর্জাতিকতাবোধ। আর নজরুলের মতে সাহিত্য, শিল্প অর্থাৎ সুকুমার বৃত্তি প্রকাশের যা মাধ্যম তার উদ্দেশ্য অভিন্ন; সে উদ্দেশ্য সত্য সুন্দর ও মঙ্গলময়।

'উপসংহারে' লেখক নজরুলকে অল্প কথার চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন। লেখকের মতে, নজরুলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রবন্ধাবলীর পর্যালোচনায় একটা সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে নজরুল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন আধুনিক মানুষ। সৃজনশীল শিল্পকর্মে শিল্পী থাকেন সৃষ্টির আড়ালে যেখানে ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকের আবরণে তিনি থাকেন প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্যে নজরুল প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট অথচ সাবলীল। সব ধরনের প্রবন্ধেই নজরুলের জীবনদর্শন স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ভাষার মারপ্যাঁচ, ভঙ্গীর দুরুহতা, আঙ্গিকের বেড়াজাল, পান্ডিত্যের কন্টকতা প্রাবন্ধিক নজরুল আর পাঠকের মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করে না। নজরুলের আগে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন বঙ্কিকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী প্রমুখ। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে সেই ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান অবধারিত। বিশের ও ত্রিশের দশকের একদিকে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী অপরদিকে আধুনিক কবিতার মুখপাত্র ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা গোষ্ঠীর সমান্তরাল 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের অন্যতম কাজী নজরুল ইসলাম অবশ্যই বিশের দশকের প্রধান রাজনৈতিক এবং ত্রিশের দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রবন্ধকার।

নজরুল প্রবন্ধের সার্বিক মূল্যায়ণে মনোয়ার হোসেন,

> অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা যে সাম্প্রদায়িকতা নজরুলের আগে বা পরে তা নজরুলের মতো স্পষ্ট, বলিষ্ঠভাবে আর কেউ উচ্চারণ করতে পারেননি। আর এ উচ্চারণ নজরুলের প্রবন্ধে সবচেয়ে বেশী প্রতিফলিত।

মধুসূদন বসুর 'নজরুল কাব্য পরিচয়' গ্রন্থটি আলোচনা গ্রন্থ। এই বইয়ে নতুন তথ্য, তত্ত্ব কিংবা তাৎপর্যপূর্ণ তেমন কোন আলোচনা নেই সত্য, তবে 'নজরুলের প্রভাব' নামের পরিচ্ছেদে উদ্ধৃতিযোগে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল ঘোষ, দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টচার্যের উপর নজরুলের প্রভাব দেখানো হয়েছে। এদিক দিয়ে পরিচ্ছেদটি মূল্যবান।

নজরুলের প্রভাব পড়েছে-বুদ্ধদেব বসুর মর্মবাণী কাব্যের শঙ্খ যাত্রী, ক্ষতিপূরণ কবিতায়।

জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা পালক' কাব্যের 'নবনবীনের গান 'যে-কামনা নিয়ে' কবিতায়,

প্রেমেন্দ মিত্রের প্রথমা কাব্যের 'কবি', 'নমস্কার', 'দেবতার জন্ম হল', 'দ্বারখোল', 'অপূর্ণ' ইত্যাদি কবিতায়,

বিমলচন্দ্র ঘোষের 'উদাত্ত ভারত' কাব্যের 'আমি তাহাদের কবি', 'বহ্নি', 'শীতের রাত্রিরে র‍্যাপার চোর', 'সোনার বাংলা' ইত্যাদি কবিতায়, দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনের 'কান্তে', 'গোলামখানা', 'গ্লানি', 'ডাস্টবিন', অহল্যা ইত্যাদি কবিতায়,

সুভাস মুখোপাধ্যায় 'সে-দিনের কবিতা', 'এখানে', 'চিরকুট' ইত্যাদি কবিতায়,

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'সিঁড়ি', 'সিগারেট', 'দেশলাই', 'কাঠি', ইত্যাদি কবিতায় মধুসূদন বসু নজরুল প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। আর ঢাকার মহীউদ্দীন, বেনজির, ফররুখ, তালিম হোসেন প্রভৃতি অনেক কবিই নজরুল শিষ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অনেক লেখকই রবীন্দ্রনাথেও নজরুল প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন।

রাজিয়া সুলতানার 'কথাশিল্পী নজরুল' গ্রন্থটি ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে উপন্যাস ও গল্পের যেমন ব্যাপক আলোচনা রয়েছে তেমনি আলোচনায় নতুনত্বও রয়েছে। যেমন,

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেকটি উপন্যাস ও গল্পের আলোচনার পরেই সেই উপন্যাস ও গল্পের মূল্যায়ণ রয়েছে। যা পাঠে পাঠক সমাজ খুব সহজেই উপন্যাস ও গল্প সম্পর্কে জানতে পারে এবং পাশাপাশি নিজের মূল্যায়নের সঙ্গে লেখকের মূল্যায়নের তুলনা করতে পারে।

বাঁধন সেনগুপ্তের 'নজরুল কাব্যগীতি বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন' গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই এর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। নজরুলের সমগ্র কাব্য রচনাকে লেখক প্রথমে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করে আলোচনা করেছেন। সামগ্রিক আলোচনায় এই চারটি স্তরকে আবার নয়টি পর্বে বিভক্ত করেছেন। গতানুগতিকতা থাকলেও পাঠক সমাজ খুব সহজেই নজরুলের কাব্যকে আয়ত্ত করতে পারে এ গ্রন্থ পাঠে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'নজরুল ইসলামের সাহিত্যজীবন' নামে ছোট কিন্তু মূল্যবান বই লিখেছেন। কেননা তাঁর প্রবন্ধগুলো সাধারণভাবে তথ্য ও যুক্তিনির্ভর।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় 'নজরুল ইসলাম কবি মানস ও কবিতা' গ্রন্থে নজরুলের ঐতিহ্য সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া শব্দ, ছন্দ ও চিত্রকল্প সম্পর্কিত আলোচনাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লেখকের 'নজরুল ইসলাম ও সমকালীন বাংলা কবিতা' প্রবন্ধটি।

আতোয়ার রহমান 'নজরুল বর্ণালী' গ্রন্থে নজরুল সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আলোচনার শুরুতেই লেখক বলেছেন নজরুল সাহিত্যের যে সব দিক আলোচিত হয়নি কিংবা স্বল্প আলোচিত হয়েছে তা এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু লেখকের আলোচিত বিষয়গুলো তাঁর পূর্বেই বহু লেখক আলোচনা করেছেন। তৎসত্ত্বে তাঁর আলোচনা পাঠক সমাজকে নজরুল সাহিত্য সম্পর্কে জানাতে সাহায্য করে।

ক্ষেত্রগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে নজরুলের কবিতাকে প্রথমেই অসংযমের শিল্প হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যার জন্য এর মধ্যে নজরুলের ভিন্ন প্রতিভার প্রকাশ ঘটেনি। আমরা জানি, লেখক তাঁর নামকরণটি লেখায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। যার প্রতিফলন ক্ষেত্রগুপ্তের রচনায়ও রয়েছে। তিনি নজরুলের কবিতার বিষয়বস্তু বা আবেগকে প্রথমেই অসংযম আখ্যা দিয়ে একটি পূর্বধারণা বা শর্ত আরোপ করেছেন এবং পরে তা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

মনোয়ারা হোসেনের 'নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্য' গ্রন্থটি একটি তত্ত্বহুল ও মৌলিক রচনা। গ্রন্থটিকে লেখক তুলনামূলক আলোচনায় আরো উজ্জীবিত করেছেন। এ গ্রন্থটিতে লেখক নজরুল পূর্ব বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের যে আলোচনা করেছেন তা বৈশষ্ট্যপূর্ণ। মোদ্দাকথা লেখক নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্যের যে ব্যাপক ও বিস্তৃতি এবং পূর্বাপর প্রবন্ধের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তা পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট না করে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

১৯২১ সাল থেকে শুরু করে ২০০০ সাল পর্যন্ত নজরুল সাহিত্যের পর্যালোচনা হচ্ছে। নজরুল জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষেও নজরুল সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে ব্যাপক।

কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের 'খেয়াপারের তরণী' এবং 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতা দুটি পাঠ করে ঐ পত্রিকা সম্পাদককে একটি পত্র দিয়েছিলেন, যা ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ পত্রটিকে নজরুল সাহিত্যের আদি সমালোচনা বলা যেতে পারে।

মোহিতলাল লিখেছিলেন,

> আপনার পত্রিকার দুই সংখ্যা সম্প্রতি পাঠ করিয়া -------- আনন্দ আশা ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়াছি -- ----- মুসলমান সমাজের নব জাগরণের অনেক লক্ষণ সর্বত্র দেখা যাইতেছে ----- কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপ্রেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আনপার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। ----- আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গালার সারস্বত মন্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি, এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যমোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক সাধারণের পক্ষ হইতে আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি।
>
> 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও মাত্রা বিন্যাস ও যতির বৈচিত্র প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে, ছন্দকে রক্ষা-করিয়া তাহার কাব্যে এই যে একটা অবলীলা, স্বাধীন স্ফুর্তি অবাধ আবেগ, করি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই, ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে, কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লংঘন করে নাই, এক প্রকৃত কবি শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিশ্বাস, ভয়, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভাষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ ঝংকারের মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব,
>
> আবু বকর উসমান উমর আলী হায়দর---
> দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর!
> কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
> দাড়ী মুখে সারিগান---লা শরীক আল্লাহ্!
>
> এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দ বিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়ডম্বরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে-বিশেষ এই শেষ ছত্রের বাক্য 'লা শরীক আল্লাহ' যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য যোজনা বাঙ্গলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে। 'বাদল প্রাতের শরাব' শীর্ষক কবিতায় ইরানের

Dhaka University Institutional Repository

> পুষ্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপুর হইয়া উঠিয়াছি। এই কবিতাটিতেও কবির 'মস্ত' হইবার ও 'মস্ত' করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।

মোহিতলাল মজুমদারের উপরোক্ত পর্যালোচনা নজরুল কবিতার যথার্থ মূল্যায়নের সূত্রপাত কিন্তু তারপর অনেকদিন এই সুস্থধারা অনুসৃত হয়নি। 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় ১৩২৯ সালের কার্তিক সংখ্যায় লেখা হয়,

> কিন্তু তাহার পর হইতে ধূমকেতুর ধর্মদ্রোহিতা এবং উহার সারথির স্বেচ্ছারিতা এত বাড়িয়া গিয়াছে- 'রক্তাম্বরধারিণী মা' ও 'ভৃগুবন্দনা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মাভৈঃ' 'ব্যোম কেদার ভোলানাথ' 'হলবল রাম স্কন্ধে' 'বোল হরিবোল' প্রভৃতি কাফরী কালাম তাহার মুখ দিয়া অনর্গল এত অধিক পরিমাণে নির্গত হইতেছে, যে আমরা বাধ্য হইয়া ভাবিয়াছিলাম যবন হরিদাসের এরূপ উৎকট অবতারকে সমালোচনা করিয়া সংযত করিবার চেষ্টা করা পন্ডশ্রম মাত্র।--- কিন্তু দুষ্ট ধূমকেতু ও উহার দুর্বিনীত সারার্থ এখন কেবল হিন্দু পুরাণের চর্বিত চর্বনে ক্ষান্ত না থাকিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী শরা-শরিয়তের উপর পর্যন্ত শয়তানী আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাই ধর্ম প্রাণ মুসলমান সমাজ চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে।
>
> উপরোক্ত ভূমিকা সহযোগে 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের 'লোকটা মুসলমান না শয়তান' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে নজরুলকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে লেখা হয়,------ হিন্দুয়ানী মাদ্দায় ইহার মস্তিক পরিপূর্ণ---- মুসলমানের ঔরসেও অনেক নাস্তিক শয়তান জন্মগ্রহন করিয়াছে, মুসলমান সমাজ তাহাদিগকে আস্তাকুড়ের আর্বজনার ন্যায় বর্জন করিয়াছে, সুতরাং এ যুবক কোন ছার।------- নরাধম ইসলাম ধর্মের জ্ঞানে কি! খোদাদ্রোহি নরাধম শয়তানের পূর্ণাবতার।------ একটা ধর্মজ্ঞান শূণ্য বুনো বর্বরের নিকট-অকট মুর্খ পাষন্ডের নিকট আর কি আশা করা যাইতে পারে। -----

-এই সব সমলোচনা যে শিল্প সাহিত্যের মাপকাঠিতে করা নয় তা বোঝা যায় আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান (সওগাত পৌষ ১৩৩) প্রবন্ধে,

> ----- এই বাঙালাদেশ ব্যতীত জগতের কোথাও বোধ হয় কাব্যকে ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ইত্যাদির মাপকাঠিতে যাচাই করিবার উদ্ভট প্রয়াস হয় নাই।----- কাজেই নজরুল ইসলামের কাব্য সৃষ্টি সম্বন্ধে যে অনৈসলামিকতার ধোঁয়া উঠিয়াছে, ইহাকে আমরা প্রবুদ্ধ কাব্য-উপভোগের ফল বলিয়া মনে করিনা বরং কাব্য সম্বন্ধে উন্নত ধারণার অভাবের নির্দশন বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য হই।
>
> নজরুল ইসলাম বাঙালার জাতীয় কবি। জাতির বেদনার কথাই তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দু এবং মুসলমান লইয়া বাঙালী জাতি। সুতরা এ জাতির বেদনার কথা প্রকাশ করিতে হইলে রচনায় ইসলামী এবং হিন্দুয়াণী উভয় জাতীয় প্রকাশভঙ্গীর ছাপই দিতে হইবে, নতুবা রচনা সহজ ও সুন্দর হইবে না।-

নজরুল সাহিত্য নিয়ে সুস্থ সমালোচনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজহার উদ্দীন খাঁন, সুশীলকুমার গুপ্ত, মোহাম্দ মাহফুজ উল্লাহ, আতাউর রহমান, শাহাবুদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ, রফিকুল ইসলাম, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ গ্রন্থাকারে নজরুল সাহিত্যের যে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন, আলোচ্য অভিসন্দর্ভে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা

করা হয়েছে। নজরুলের সাতিহ্য কর্ম বিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি, নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনাও বিংশ শতাব্দীর (১৯৯৯ সালে নজরুল জন্মগত বার্ষিকীর পূর্বেই নজরুল সমালোচনার বিভিন্ন ধারা যে পরিচয় দেওয়া হলে তা থেকে বোঝা যায় যে, নজরুল সাহিত্য মূল্যায়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, একুশ শতকে নজরুল সাহিত্য সমালোচনা আরও বহুমুখী হবে, নজরুল মূল্যায়ণ বস্তুনিষ্ঠ হবে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল সাহিত্য সমালোচনার উপাদান সম্বলিত গ্রন্থপঞ্জী

আবদুল কাদির	নজরুল প্রতিভার স্বরূপ	নজরুল ইন্সটিটিউট ধানমন্ডি, ঢাকা জানুয়ারী-১৯৮৯
কাজী আবদুল ওদুদ	নজরুল প্রতিভা	১৯৪৯
সৈয়দ আলী আহসান	নজরুল ইসলাম	১৩৬১
আজহার উদ্দীন খান	বাংলা সাহিত্যে নজরুল	সুপ্রীম পাবলিশার্স কলকাতা-১৩৩৪
সুশীলকুমার গুপ্ত	নজরুল-চরিতমানস	দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-১৩৬৭
মোঃ মাহফুজউল্লাহ	নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা	নওরোজ কিতাবিতান ঢাকা-১৩৭০
আতাউর রহমান	কবি নজরুল	শুভ্রা প্রকাশনী ঢাকা-১৯৬৮
শাহাবুদ্দীন আহমদ ঐ ঐ ঐ	শব্দ ধানুকী নজরুল ইসলাম নজরুল সাহিত্য বিচর ইসলাম ও নজরুল ইসলাম নজরুল সাহিত্য দর্শন	নজরুল একাডেমী ঢাকা-১৯৭০ মুক্তধারা ঢাকা-১৯৭৬ ১৯৭৬
রফিকুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা	মল্লিক ব্রাদার্স ঢাকা-১৯৮৪
ঐ	কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য	কে, পি বাগচী অ্যান্ড কোঃ কলকাতা-১৯৯১
ঐ	কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি	কে, পি বাগচী অ্যান্ড কোঃ কলকাতা-১৯৯৭
আবদুল মান্নান সৈয়দ	নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতা	নজরুল একাডেমী ঢাকা-১৯৭৭
মোবাশ্বের আলী	নজরুল প্রতিভ	মুক্তধারা ঢাকা-১৩৭৬
মধুসূদন বসু	নজরুল কাব্য পরিচয়	পুস্তক বিপনি কলকাতা-১৯৭৫
রাজিয়া সুলতানা	কথাশিল্পী নজরুল	মুখদুমী অ্যান্ড আহসানউল্লাহ লাইব্রেরী ঢাকা-১৯৭৫
বাঁধন সেনগুপ্ত	নজরুল কাব্যগীতিঃ বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন	নবজাতক কলকাতা-১৯৭৬
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন	মুক্তধারা ঢাকা-১৯৮৮
ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়	নজরুল ইসলামের কবি মানস ও কবিতা	রত্নাবলী কলকাতা-১৯৯২
আতোয়ার রহমান	নজরুল বর্ণালী	নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা-১৯৯৪
ক্ষেত্রগুপ্ত	নজরুলের কবিতাঃ অসংযমের শিল্প	১৯৯৭
মনোয়ারা হোসেন	নজরুল প্রবন্ধ	নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা-২০০০